Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.12.16 00:12:01 +06'00'

# যখন ঢল নামে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

জাদুচক থেকে বাংলো কম করে তিন মাইল। ছোট মোটর-ফিট করা সাইকেলে এই তিন মাইল পথ ভাঙতে আমার তিন-তিনে ন' মিনিটের বেশি লাগল না। বন আর পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পাকা বাঁধানো রাস্তাটা অবশ্য খুবই ভালো। আর তেমনি নিরিবিলি। টিম টিম আলো জ্বেলে আর ভেঁপু বাজিয়ে দুই-একটা সাইকেল-রিকশা যাচ্ছে আসছে। দূরে দূরে একটা-দুটো গোরুর গাড়িও। ওগুলোর পাশ ক্যাটানোর সময় অন্তত স্পিড কমানো উচিত। কিন্তু ভিতরের তাড়ায় এই উচিত বোধটুকু আমার ছিল না। বিকেলের আলোয় যদিও একেবারে টান ধরেনি, তবু দু'দিকে পাহাড় আর জঙ্গলের দরুন রাস্তা এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার। আমার সাইকেলের সামনে একটা জোরালো লাইট ফিট করা। জ্বাললে বিশ-পঁচিশ গজের অন্ধকার গিলে খায়। বোতাম টিপতে দ্বিগুণ বিরক্তি। কাল থেকে জানি ওটার ব্যাটারি ফুরিয়েছে। আজ লাঞ্চের পর বাংলো থেকে বেরুনোর সময়েও মনে ছিল ব্যাটারি কিনতে হবে। আমার অটো সার্ভিসিং স্টেশনের কাছেই দোকান। একফাঁকে বেরিয়ে কিনে নিলেই হবে। তারপর কাজের চাপে মনে ছিল না। কিন্তু আধঘণ্টা আগে অর্থাৎ ঠিক সোয়া ছটায় যখন দোকান ছেড়ে বেরুলাম তখন অন্তত সাইকেলটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ার কথা। কারণ, কাজের ব্যাপারে আমার ভুল-ভ্রান্তি কমই হয়।

...ইদানীং ভুল বাড়ছে। তখন যার কারণে এই ভুল তার ওপর রাগে ভিতরটা জ্বলতে থাকে। নিজের ওপরেও। বিশ্ব সংসারের সকলের ওপরেই। আমার কাঁধে হঠাৎ-হঠাৎ একটা ভূত চাপে। হঠাৎ-হঠাৎ ভাবতেই ভিতরে কেউ যেন কুট করে একটু কামড়ে দিল। বলল, খুব হঠাৎ-হঠাৎ কি ?

...না, খুব হঠাৎ-হঠাৎ নয়। আগে না হোক, এই মাস কয়েক যাবত অন্তত নিজের ওপর একটু লক্ষ্য রেখে চলেছি। দেখেছি, মাসের একটা বিশেষ সময়ের দিন কয়েক

পরে সাধারণত এই কাণ্ডটা হয়। অর্থাৎ ওই ভূত চাপে। এমনি বিষম তাড়া লাগায়। এমনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্যের মতো ছোটায়। মনে হয় একটু দেরি হয়ে গেলে সর্বনাশ। সময়ে না পৌঁছুতে পারলে সর্বনাশ। তখন কাজে ভুল। হিসেবে পর্যন্ত ভুল। যা আমার মতো চুল-চেরা হিসেবী মেয়ের সচরাচর হয় না।

যেমন আজ। লাঞ্চের পর যখন আসি মেজাজ বেশ ভালো। এসে কাজের চাপ দেখে আরো ভালো। সকাল আটটা থেকে বারোটার মধ্যে দুটো গাড়ির সার্ভিসিং হয়ে গেছে দেখে গেছি। ও-দিকের গ্যারাজে একটা পথ-চলতি বিকল গাড়ির মেরামত চলছিল। তার পিছনে আর একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। অর্থাৎ ওটারও খোঁড়া দশা। পেট্রোল ডিজেল মবিল ব্রেক-অয়েল গিয়ার-ওয়েল বিক্রীর লাভ ধরাবাঁধা। ইচ্ছে মতো কারো কাছ থেকে পাঁচটা পয়সা বেশি নেবার উপায় নেই। সরকার এগুলোর দাম বাড়িয়ে বাড়িয়ে খদ্দেরের গলা কেটেই চলেছে। কিন্তু আমাদের কমিশনের হার বাড়ানোর বেলায় যত গড়িমসি। সে-বেলায় হাতের পাঁচ আঙুল আর ফাঁক হয় না। এ নিয়ে ডিলাররা কতবার কত জায়গায় জোটবদ্ধ হয়ে গলাবাজি করল। একদিন দু'দিনের ধর্মঘট পর্যন্ত করল। কিন্তু এ-পর্যন্ত সরকারের টনক তাতে কতটুকুই বা নড়ল। যদিও এই গলাবাজি বা ধর্মঘট-টটের মধ্যে আমি নেই বা কখনো ছিলাম না। তার একটা কারণ, তিল-তিল কমিশন জুড়ে টাকার তাল না হোক, মাস গেলে আয় যা হয় তা আমাদের ছোট সংসারের পক্ষে অঢেলের থেকেও ঢের বেশি। দ্বিতীয় কারণ, বম্বে রোড ধরে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বর্ডার লাইন বাহারাগোরার পর থেকে ডাইনের এই টাটা রোড ধরলে জাদুচক পর্যন্ত লম্বা পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে এটাই প্রথম পাম্পিং আর সার্ভিসিং স্টেশন। তাই হরতাল ঘোষণার দিনেও দোকানের ঝাঁপি বন্ধ করলাম কিনা কে দেখতে গেছে? বোকা না হলে কেউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি বন্ধ করে? তবু সরকারের এই এক চোখোমির দরুন রাগ তো হয়ই। সেই রাগ পুষিয়ে যায় এই সাইড বিজনেস দুটো অর্থাৎ সার্ভিসিং আর গ্যারাজ থেকে।

এসব বৃত্তান্ত পরে। মেজাজের কথা বলছিলাম। কাজের চাপ মানেই টাকা। আর টাকা মানেই মেজাজের সেরা ভিটামিন। মা তার খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠিক সাড়ে বারোটায় এসে আমাকে রিলিভ করে। পরে বৃন্দাকে। বৃন্দা এখানকার ম্যানেজার, আমার নিজস্ব সেক্রেটারি, সমস্ত রাতের সেলসম্যান ইত্যাদি থেকে দরকারে ঝাড়ুদার পর্যন্ত। আমাদের ভাগ্য, তিন বছর হল এমন বিশ্বস্ত কাজের লোকটা জুটেছে। অথচ তার আগে পর্যন্ত ছেলেটাকে আমি রকবাজ চেংড়া ভাবতাম। পুরো নাম বৃন্দাবন। কিন্তু মায়ের দাঁতে ঠোঁটে জিভে অতটা আসে না। সোজা সরল 'বিন্ডা' করে নিয়েছে। আমার মুখে আটকায় না, অনায়াসে বৃন্দাবন বলতে পারি। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে শতেক বার ডাকতে হলে বিরক্তি। মায়ের রাস্তা ধরে আমি 'বৃন্দা' করে নিয়েছি। ও তাতে অখুশি নয় মনে হয়। স্নেহ ভাবে বোধহয়।

মা এসে ক্যাশ দেখে নিলে আর কাজ বুঝে নিলে আমার দু' ঘণ্টার মতো ছুটি। আমি



খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে সোয়া দুটো আড়াইটের মধ্যে ফিরি। বৃন্দার তারপর ঘণ্টা চার সাড়ে চারের লম্বা ছুটি। দোকানের ঝরঝরে সাইকেলটা নিয়ে বেরোয়। মায়ের ওখানে ওর খাবার রেডি থাকে। রিখু খেতে দেয়। খেয়ে দেয়ে সেখানে লম্বা (মায়ের হিসেবে) ঘুম লাগায়। বিকেল বা সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে ওই সাইকেলেই আবার ফেরে। ফেরার কথা অবশ্য ঠিক ছ'টায়। মা চারটেয় আবার বাড়ি চলে যায় বলে টের পায় না। আমিও কিছু বলি না। কারণ তারপর থেকে কাজ থাক বা না থাক রাতভর ওর ডিউটি। রাত নটা-দশটার পর হিসেব-টিসেব মিলিয়ে অফিস্-টেবিলের ওপরেই শোবার ফুরসত পায়। রাতের প্রহরী হাবিলদার মনবাহাদুর বলে ঘুমোয়ও বেশ। কিন্তু মানিজারবাবুর তারিফ না করে পারে না। গাড়ি লরি বা ট্রাক এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে। ডাকতে হয় না বা হর্ন বাজাতে হয় না। কলের মানুষের মতো উঠে খদ্দেরের চাহিদা মিটিয়ে আর টাকাকড়ি দেরাজে রেখে আবার দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল থেকে এই রুটিনের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। সাড়ে বারোটার একটু আগেই এসে মা আমার কাছ থেকে ক্যাশ আর কাজ বুঝে নিয়েছে। একশ টাকা পঞ্চাশ টাকা কুড়ি টাকা আর দশ টাকার আলাদা আলাদা নোটের বাণ্ডিলগুলো পুরুষ্টু দেখলে মায়ের দুচোখ একটু চিক্-চিক্ করে শুধু। গাম্ভীর্যে ফাটল ধরে না। আজকের সেল আর কাজ দেখে সেই রকমই পরিতুষ্ট অথচ গম্ভীর। আমি আমার মোটর-লাগানো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।

...তখন ঢিমে-তালে আসা। ইচ্ছে হলে খানিকটা পথ তখন মোটর থামিয়ে প্যাডেল চালাই। দুপুরে ঘরের কাছাকাছি এসে ভিতরটা রোজকার মতোই একটু তেতে উঠেছিল। দূর থেকেই বোঝা যায় বাংলোর সামনের কোণের ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ। অর্থাৎ ঘরের লোক ঘুমোচ্ছে। নয়তো পড়ছে কিছু। নয়তো করছে কিছু। যা পড়ে, আমি তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না। শুধু এটুকু হাড়ে হাড়ে বুঝি ওই পড়ায় দুনিয়ার কারো অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। আর যা করে তাতে নিজের ছেড়ে আরো বহুজনের জাহান্নমে তলিয়ে যাবার রসদ জোগানো ছাড়া আর কিছু হয় বলে আমি বিশ্বাসই করি না। এই পড়া-করার কথা পরে, আপনারা শুধু এটুকু জেনে রাখুন, ওই দরজা-জানলা বন্ধ ঘরের মানুষের ওপর দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় আমার এত রাগ এত ঘেন্না এত বিতৃষ্ণা যে মনে হয় দুনিয়া থেকে বরাবরকার মতো তার অস্তিত্ব মুছে গেলে আমার হাড়ে বাতাস লাগত। আবার এও অস্বীকার করার উপায় নেই, দুনিয়া থেকে না হোক নিজের জীবন থেকে অন্তত ইচ্ছে করলেই আমি মুছে দিতে পারি—কিন্তু তা-ও পারি না। পারি না বলেই আমার ওপর মায়ের সর্বদা রাগ। কারণ, মায়ের তার জামাইয়ের ওপর আমার থেকে দশ গুণ বেশি রাগ ঘেন্না আর বিতৃষ্ণা। বাক্যালাপ ছেড়ে মায়ের তার সঙ্গে মুখ দেখা-দেখিও বন্ধ। এই জন্যেই একই কম্পাউণ্ডের মধ্যে হলেও আমার বাংলো থেকে মায়ের বাংলোর মাঝে পঁচিশ-তিরিশ গজ ফারাক। তার আসা-যাওয়ার পথও ভিন্ন। গেল বছর দু'ঘরের ওই উল্টোমুখো বাংলোটা তুলে মা

তফাতে সরে গেছে।

দুপুরে খেতে এসে ওই দরজা-বন্ধ ঘরের দিকে ভালো করে তাকাই না। কোন্‌দিন ভিতর থেকে দরজা বন্ধ আর কোন্ দিন বাইরে তালা ঝুলছে তা-ও লক্ষ্য করতে চাই না। তবু চোখে পড়েই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ঘরের লোক বাইরে বড় একটা বেরোয় না। তার সফরে বেরুনোর সময় বিকেলে বা সন্ধ্যায়। বেশির ভাগ দিনই সন্ধ্যায়। সবদিন রাতে ফেরেও না। নেশায় একেবারে অচল দশা না হলে অবশ্য যত রাতই হোক ফেরে। কখনো আবার তিন-চার-পাঁচ দিনের জন্যেও বেপাত্তা হয়ে যায়। কোথায় যায় কি করে আমি জিগ্যেস করি না। খবরও নিই না। গোড়ায় গোড়ায় এটা বরদাস্ত করতে চাইনি। কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছি। আমাদের কাণ্ডজে বিয়ে ছিঁড়ে ফেলব বলে শাসিয়েছি। কিন্তু ওই লোকের কানে তুলো পিঠে কুলো। গাল-মন্দ করলেও মুখে রা কাটে না, ঝগড়ার বদলে ঝগড়া করে না। বড় বড় দু' চোখ আমার মুখের ওপর ফেলে রাখে। মিটিমিটি হাসে। ...তখন শত্রুও বলবে সুন্দর। কোন্ বিধাতার কারিকুরি কে জানে। ভিতর যার এত কুৎসিত বাইরেটা তার এত সুন্দর হয় কি করে! দিনে দিনে অনেক সয়। এ-ও সয়ে এসেছে। এখন আর ঝগড়ায় বচসায় দুশ্চিন্তায় নিজেকে ক্ষয় করি না। ব্যবসায় ডুবে থাকতে চেষ্টা করি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকি ব্যবসার চিন্তা আর টাকার হিসেব মাথায় ঘোরে। খুব দরকার পড়লে এখন ওই লোককে শুধু হুকুম করি। বন্দাকে বা মনবাহাদুরকে বা দোকানের কাজের লোক দুটোকে বা আমার খাস পরিচারিকা আনজেলাকে যে মুখ করে অথবা যে ভাষায় হুকুম করি—এ হুকুম সেই গোছের নয়। এই ঠাণ্ডা হুকুমে নির্দয় রকমের কিছু সুর বাজে। ...ছেলেবেলায় ঠাকুমা আমাকে খুব মারধর করত। কারণে অকারণে কাকা-কাকিমা জ্যাঠা-জেঠি, আর এক বিধবা পিসীও কম মার মারত না। কিন্তু আশ্চর্য, এদের কাউকে আমি একটুও ভয় করতাম না। পার পাবার জন্য মুখের ওপর মিথ্যে কথা বলতাম। ধরা পড়লে আরো বেশি শাস্তি পেতে হত। আসলে শাস্তি দিয়ে দিয়েই তারা আমার ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিল। অথচ যে লোককে আমি দারুণ ভয় করতাম, সে কোনদিন আমার গায়ে হাত তুলত না। যমের মতো ভয় করতাম দাদু অর্থাৎ ঠাকুর্দাকে। তার একটু লাল চোখ দেখলেই বা চাপা একটু হুংকার কানে এলেই আমার হয়ে যেত। এত বছর বাদে দাদুর সেই শাসনরীতি সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমার এই ছোট্ট জায়গায় এসে কাজে লাগতে পারে এ কে ভেবেছিল। এখন ঘরের এই লোকের প্রতি আমার শাসনে বা হুকুমে আগুন ঝলসায় না, বিপদের নির্দয়-গোছের একটু ঠাণ্ডা সংকেত শুধু প্রচ্ছন্ন থাকে। এতেই বেশি কাজ হয় লক্ষ্য করেছি। জবাবে তখনো অবশ্য এই লোকের সেই ডাগর চোখের সরল চাউনি আর সেই মিটিমিটি হাসি। কিন্তু যা বলি ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক তা করে। আর এর ফলেই নিজের জোরের দিকটা আগের থেকে অন্তত বেশি অনুভব করতে পারি।

গত রাতে মানুষটা ঘরে ফেরেই নি। আজও সকালে বেরুনোর সময়ে এই কোণের



ঘরের দরজায় তালা ঝুলতে দেখে গেছি। দুপুরে খেতে এসে দু'ঘণ্টার জন্য সাইকেলটা আর বারান্দায় তুলি না। সিঁড়ির গায়ে ওটা ঠেস দিয়ে রাখার সময় প্রথমেই কোণের ঘরটার দিকে চোখ গেছে। বাইরে তালা ঝুলছে না। অর্থাৎ ঘরের বাসিন্দা ঘরেই আছে। সমস্ত রাতের যজ্ঞি সেরে খেয়ে দেয়ে এখন তোফা ঘুমের সময় এটা। ভাবতে গেলে গা জ্বলে। দুপুরে আমার খেতে আসার সময় হলে অ্যানজেলা আগে থাকতে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাই ছিল। ওই লোক কখন ফিরেছে বা কি অবস্থায় ফিরেছে জিগ্যেস করলে তার কালো ভারি গাল ফুলিয়ে আর মিহি গলা খাটো করে গড়গড় করে পঞ্চাশ কথা বলবে। গলা খাটো করার অর্থ ওই ঘরের বাসিন্দাকে ও বিলক্ষণ ভয় করে। দুপুরে বা সন্ধ্যায় আমি ফিরলে নিশ্চিন্ত। এমনকি সামনের বাংলোয় মা থাকলেও কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। আমরা থাকি না আর রিখুও অনেক সময় কাজে বেরিয়ে যায়। অ্যানজেলা তখন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। ভয়ের কথা নিজেই বলত। অ্যানজেলা আমার থেকেও দু' ইঞ্চি লম্বা, কম করে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি হবে, তেমনি ধুমসো মোটা, গায়ের রং মিশকালো, চোখ দুটো ততো ছোট না হলেও শরীরের তুলনায় বেজায় ছোট দেখায়। ওর এই পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে কোনো পুরুষমানুষ তেমন আগ্রহ নিয়ে কখনো ওর দিকে তাকিয়েছে বলে মনে হয় না। হেলেদুলে হেঁটে চলে গেলে অনেকে সভয়ে তাকায় লক্ষ্য করেছি। মায়ের জব্বর একখানা জ্যান্ত কালেকশন। চৌদ্দ বছর বয়সে মায়ের কাছে এসেছিল। তারপর থেকে আর মায়ের কাছ-ছাড়া হয়নি। ছায়ার মতো সঙ্গে ঘুরেছে। শুধু পরিচারিকা নয়, ওই ছিল মায়ের একমাত্র বডিগার্ড। ওর মুখেই শুনেছি বয়েসকালে মা দারুণ সুন্দরী ছিল। লোকে আমাকেও সুন্দরীই বলে। কিন্তু আমার জেরায় পড়ে অ্যানজেলা ভয়ে ভয়ে কবুল করেছে মা আমার থেকেও দেখতে ভালো ছিল। সেটা আমি অবিশ্বাস করি না। এই সাতচল্লিশেও মায়ের সুঠাম ঝজু স্বাস্থ্য। উঠতে বসতে হার্টের ব্যামো আর ব্লাডপ্রেসার নিয়ে মাথা ঘামায়, সেটা মনের রোগ। অমন সুন্দর মুখখানা সর্বদা কড়া গাম্ভীর্যের পলস্তরায় ঢাকা। অ্যানজেলার গর্ব, বছরের পর বছর ও আমার সুন্দরী মা-কে দাপটের সঙ্গে আগলে রেখেছে। মা প্রশ্রয় দিতে চায়নি এমন অনেক বাজে লোক ওরই ভয়ে নাকি মায়ের ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহস করত না। মেয়েটা যে এমনিতে বেশ সাহসী সে তো আমিও দেখছি। কিন্তু বাংলোর এই এক মানুষকে ও কেন এত ভয় করে ভেবে পেতাম না। বিশেষ করে যে-লোক মায়ের দু'চক্ষের বিষ, আর আমিও প্রায় সর্বদাই যার ওপর এমন তিক্ত-বিরক্ত এই মেয়ের তো বাগে পেলে হাতে মাথা কাটার কথা! কিন্তু ঠিক উল্টো ব্যাপার। ওর এত ভয় দেখে আমার হাসিই পেত।

এত ভয়ের কারণ পরে বুঝেছি। ওর ধারণা, ডাকিনী যোগিনীরা আর অশরীরী আত্মারা সব এই একজনের হুকুমের দাস-দাসী, এই লোক বিগড়ে গেলে রক্ষে আছে! মন্ত্র পড়ে বা ক্রিয়া-কলাপ করে কখন ওর কি-দশা করে ছাড়ে ঠিক কি! ভূড়ু প্র্যাকটিসখানা কি ব্যাপার সে-কি আর জানতে বাকি আছে। মেমসাহেব (আমার মা।

আমি ছোট মেমসাহেব) নিজেই ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে! সাধারণ তুক-তাক ঝাড়ফুঁক তো ভুড়ুর অ আ ক খ জিনিস। রামদেও মাহাতোর মতো ডাকসাইটে গুণীনরা আরো কত সাংঘাতিক কাণ্ড করতে পারে! আসল ভুড়ুর গুণীন তো ওরাই। অনায়াসে ভালো আত্মা মন্দ আত্মা আনে, তাদের দিয়ে ভালো কাজ মন্দ কাজ, যা খুশি করায়, কারো নসিব ফেরে কারো বা সর্বনাশ হয়! জাদুচক ছাড়িয়ে দু' মাইল দূরের সাঁওতাল পল্লীর শেষ মাথায় সুবর্ণরেখার শ্মশান-চরের কাছাকাছি রামদেও মাহাতোর ডেরায় মায়ের সঙ্গে অ্যানজেলা কি কম বার গেছে? গায়ে কাঁটা দেওয়া কম কাণ্ড দেখেছে সেখানে? তারপরেই একটা কথা বলার সময় গলা সর্বদা ফিসফিস অ্যানজেলার। —রামদেও মাহাতো তোমার বাবার ভালো আত্মাকে এনে কাজ করিয়েছে বলেই যে তোমাদের আজ এত ভালো অবস্থা সে-তো তুমি জানো ছোট মেমসাহেব!

এই জানাটা অ্যানজেলার কল্যাণে। আজ পর্যন্ত কতবার বলেছে ঠিক নেই। রামদেও মাহাতোর ডেরায় মায়ের যাওয়া-আসা ছিল জানি। অ্যানজেলা অনেকবার বলেছে। জেরিও (আমার স্বামী) বলেছে। মায়ের এই প্রবণতার উৎস কোথায় আমি তা-ও আঁচ করতে পারি। চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত আমার কলকাতায় দাদুর বাড়িতে কেটেছে। সেখানে আমার ভীষণ নিষ্ঠাবতী ঠাকুমা তার মেজ ছেলের অর্থাৎ আমার বাবার দুরারোগ্য ব্যাধি সারানোর জন্য লৌলিক অলৌকিক কত প্রক্রিয়ার পিছনে ছুটেছে, আর দাদুর সেই বাড়িতেই কত কাণ্ড ঘটেছে, বড় হয়ে সে-সব বৃত্তান্ত আমাকে শুনতে হয়েছে। ঠেস দিয়ে দিয়ে সেই বিধবা পিসী বলেছে। জ্যাঠার মেয়ে আমার থেকে সাত বছরের বড় উমাদিও বলেছে।

...তখন আমার বাবা তো নেই-ই, মা-ও এই পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা জানতাম না। উমাদি আর পিসী অবশ্য বলত মা আছে। কোথাও না কোথাও অন্য কারো ঘর করছে। কিন্তু চার থেকে চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত এই মায়েরও অস্তিত্ব আমার জানা ছিল না। এ-সব কথা পরে। বড় হয়ে অ্যানজেলার মুখে ভুড়ু শুনে আর ভুড়ুর সর্দার রামদেও মাহাতোর কথা শুনে আমার খুব অবাক লাগত। মা-কে জিগ্যেস করতাম, ভুড়ু কি?

এ আলোচনা পছন্দ নয় বুঝতাম। মা খুব গম্ভীর হয়ে যেত। জবাব দিত, জানি না। অর্থ অবশ্য আমি জানি। ডিকশনারি ঘেঁটে দেখেছি। ডাকিনী যোগিনী বিদ্যা। সম্মোহন, বশীকরণ, বিমোহন ইত্যাদি বিদ্যা। অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে পরলোকের আত্মার ওপর প্রভাব বা অধিকার বিস্তারের বিদ্যা। এমনি নানা রকম। কিন্তু ঠিক বোধগম্য হত না। মা-কে জিগ্যেস করতাম, তুমি এ-সব বিশ্বাস করো?

মা বিরক্ত হত কি ভয় পেত বুঝতাম না। বলত, জানি না বলছি, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা কেন?

একদিন ফস করে বলে বসেছিলাম, না জানলে তুমি রামদেও মাহাতোর ডেরায় এত যেতে কেন?



...মনে আছে মা ভীষণ চমকে উঠেছিল। অ্যানজেলাও তখন ঘরে। তীক্ষ্ণ চোখে একবার তার দিকে চেয়ে মুখখানা কঠিন করে মা ফিরে জিগ্যেস করেছিল, এ-সব কথা তোকে কে বলেছে?

অ্যানজেলার থলথলে কালো মুখ ভয়ে আমসি। আমারও তখন ওকে বাঁচানোর তাগিদ। গলা একটু উঁচু পর্দায় তুলে জবাব দিয়েছি, কে বলতে পারে তুমি জানো না? এ-সব বলার মতো কাউকে তুমি আদর করে ঘরে এনে ঠাঁই দাওনি?

শুনে মায়ের মুখ গনগনে লাল। কিন্তু গুম একেবারে। মা বুঝেছে জেরি বলেছে। সে আরো বছর তিনেক আগের কথা। তারও বছরখানেক আগে জেরির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। সেই এক বছরের মধ্যেই জামাই সম্পর্কে মায়ের মোহভঙ্গ হয়েছে। আমার কি হয়েছে না হয়েছে সে-কথা আপাতত অবান্তর। আমার ওই জবাব শুনে মা জামাইয়ের কাছে কৈফিয়ত নিতে ছুটবে না। মা ঘর ছেড়ে চলে যেতে অ্যানজেলার কৃতজ্ঞতায় নরম কাদার-ডেলা মুখ। ওর একটা মস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে দিলাম যেন।

...জেরি সাহেবকে অ্যানজেলার এত ভয় কিছুটা মায়ের জন্যেও বটে। মেমসাহেবের মতো অমন ডাকসাইটে মহিলা জামাইকে ঢিট করতে পারল না। উল্টে নিজেই হাল ছেড়ে গত বছর ওই দু' ঘরের উল্টোমুখো বাংলো তুলে চলে গেল যার জন্য, সে ভয়াবহ মানুষ না তো কি? আবার একই কারণে ভিতরে ভিতরে রিখুর ওপর রাগ ওর। ফাঁক পেলেই ওর ওপর রাগে গজগজ করে, হম্বি-তম্বি করে। রিখু এই সিঙভূমেরই আদিবাসী। রাখার তামার খনিতে কাজ করত। মোসাবণী থেকে রাখা পর্যন্ত কপার মাইনের আর মৌভাণ্ডার কপার করপোরেশনের অনেক হোমরাচোমরা অফিসারের সঙ্গে মায়ের দীর্ঘদিনের জানাশোনা। কলকাতায় যাবার পথে এদের বেশির ভাগই আমাদের দোকান থেকে ট্যাঙ্ক বোঝাই তেল কেনে। এমনি খাতিরের এক অফিসারের কাছে মা একজন বিশ্বস্ত কর্মী আর খুব সাহসী লোক চেয়েছিল (সাহসী লোক চাওয়াটা জামাইয়ের ভয়ে কিনা বলতে পারি না)। তা সেই ভদ্রলোক এই মূর্তিটিকে পাঠিয়েছিল। দেখেই মায়ের বোধহয় পছন্দ হয়েছিল। কম করে ছ'ফুট লম্বা হবে। হাতে মোটা পাকানো লাঠি। মেদশূন্য পাথুরে স্বাস্থ্য। মিশকালো গায়ের রং। একমাথা ঝাঁকড়া চুলের দুই একটাতে পাক ধরেছে। তাই দেখেই হয়তো মা ওর বয়েস জিগ্যেস করেছিল। ও বলেছিল দুই কুড়িটো হবে। এই তিন বছর পরেও বয়েস জিগ্যেস করলে জবাব দেয় দুই কুড়িটা হবে। তখনো দু'কুড়ি অর্থাৎ চল্লিশ মনে হয়নি, এই তিন বছর বাদেও না। কিন্তু প্রথম দিনের পাঁচ মিনিটের মধ্যে মা ওকে বাতিল করেই বসেছিল। আর বাতিল করার ব্যাপারে আমারও সায় ছিল। কারণ ওর সাদাসাপটা কথা শুনে আমরা মা-মেয়ে দুজনেই আঁতকে উঠেছিলাম। প্রথম দর্শনে পছন্দ হলেও বয়েস শুনে আর মাথায় দু-চারটে পাকা চুল দেখে মায়ের মনে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। বলেছিল, আমার তো একজন জোয়ান কাজের লোক দরকার—

সঙ্গে সঙ্গে ও বুক চিতিয়ে জবাব দিয়েছে, মুই জোয়ান মরদ আছে।

এখানকার আদিবাসীদের একটা ব্যাপার অনেক দিন লক্ষ্য করেছি। নিজেদের মধ্যে ওরা জাতের ভাষায় হড়বড় করে কথা বলে। সে-কথার এক বর্ণও বোঝা যায় না। কিন্তু অন্যদের ভাষা এরা খিচুড়ি পাকিয়ে বেশ বলতে পারে।

মায়ের পরের প্রশ্ন, আগে ও কোথায় কাজ করত।

—রাখা তামরা খনিতে কামি ছেল।

—সে কাজের কি হল?

—ছো মাহিনা জেল খাটলম, তারপর উরা আর মুকে লিলে না।

মা তো বটেই, আমিও হকচকিয়ে গেছলাম। মা জিগ্যেস করল, তুমি ছ'মাস জেল খেটেছ—কেন?

এর পরেও লোকটার মুখ যেমন নির্বিকার, জবাবও তেমনি। গড়গড় করে যা বলে গেল, তার সাদা অর্থ, ওর বহু ওদের মাঝির (সর্দারের) যে বন্ধুর কুটুম্বের 'ছেলিয়ার সঙতে পালিল' গেল মাঝি উদের শাস্তি দিল না, বহুটা 'ছুটকী (ছাড়) হইন্ গেল, আর ওই কুটুম্বের ছেলিয়া তাকে 'খাতিরজমা' (প্রেমের বিয়ে) করল। যা হবার হয়ে গেল বলে মাঝির কথায় রিখু ওদের দুজনকে ক্ষমাই করে দিয়েছিল। কিন্তু একদিন খুব হাঁড়ি (পচাই) খেয়ে ওদের দুজনকে সামনে দেখে ওর দিল খারাপ হয়ে গেছল, তার ওপর বহুটা 'খিজলাইলো' (ঠাট্টা করল), ওর তখন মাথায় 'আগ্' চড়ি গেল—হাতের এই লাঠি দিয়ে দুজনের মাথা দু'ফাঁক করে দিল। ওরা মরে গেলে বোধহয় ফাঁসি হত, মরল না তাই 'ছো মাহিনা' জেল হল। জেল বড় 'গন্ধা' জায়গা, ওখানে ওর কালো চুল সাদা হয়ে গেল—এর থেকে ফাঁসি ভালো ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর খনিতে আর ওর কামি হল না, রংকিণী দেবীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দিল, জেবনে আর হাঁড়ি-দারু খাবে না শপথ করল তবু সাহেবদের 'দিল লরম' হল না—কামি ছুটে গেল।

দু-দুটো লোকের মাথা ফাটিয়ে জেল খেটে এসেছে শুনে মা তাড়াতাড়ি ওকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। পরে খবর দেবে বলে নিজেই ঘরে সেঁধিয়ে গেছে। আমিও ঘাবড়ে গেছলাম সত্যি কথা, কিন্তু সব শোনার পর লোকটাকে আমার খারাপ লাগেনি। মায়ের মন রিখুরও বুঝতে বাকি থাকেনি। করুণ চোখে একবার আমার দিকে চেয়ে পাকানো মোটা লাঠিটা কাঁধে তুলে আস্তে আস্তে চলে গেছে।

পরে যে ওকে পাঠিয়েছিল সেই ভদ্রলোক আসতে তাঁর সঙ্গে কথা বলে বল-ভরসা পেয়েছে। রিখুর প্রচুর সুখ্যাতি করে ভদ্রলোক বলেছে, নিয়মে না আটকালে ওর চাকরি যেত না, ওর বউটা যেমন পাজি, যার সঙ্গে পালিয়ে ঘর বেঁধেছে সেটাও তেমনি হাড়-হারামজাদা। তা-ও নেশার সময় টিটকিরি বরদাস্ত না করতে পেরে এই কাণ্ড করেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওরা যখন দেব-দেবীর নাম নিয়ে শপথ করে, প্রাণ থাকতে সেটা ভাঙে না—দেখবেন ও জীবনে আর মদ খাবে না। তাছাড়া লোকটা যেমন বিশ্বস্ত তেমনি সাহসী, যার নুন খাবে তার জন্য জান দিতেও পিছ-পা হবে না।

এই শেষের প্রশংসাই হয়তো মায়ের সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছিল। তবু রিখুকে আবার ডেকে পাঠিয়ে প্রথমেই সাবধান করেছে, কোনোদিন মদ খেয়েছে দেখলে বা কক্ষনো এতটুকু মেজাজ দেখালে চাকরি থাকবে না। মায়ের মুখের দিকে ড্যাব-ডেবে চোখ তুলে রিখু শুধু মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ মায়ের কথা সে বুঝে নিয়েছে। খনিতে কত মজুরি পেত জেনে নিয়ে মা তাকে ভালো মাইনেতেই বহাল করেছে। আর খুশি হয়ে বছর বছর মাইনে বাড়িয়েছেও। মায়ের এ গুণ স্বীকার করতে হবে। কাজের ব্যাপারে ভীষণ কড়া, আবার কাজ পেলে দেবার ব্যাপারেও দরাজ।

দিনান্তে রিখুর গলার আওয়াজ ক'বার শোনা যায় হাতে গোনা যায়। ডাকলেও সাড়া দেয় না, মুহূর্তের মধ্যে সামনে এসে দাঁড়ায়। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, পারতে ও আমার মুখের দিকে তাকায় না, এমন কি অ্যানজেলার দিকেও না। শুধু মায়ের দিকে তাকায়। এই থেকে আমার ধারণা, বউ ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার দরুন বয়েসকালের সব মেয়ের ওপরেই ও বীতশ্রদ্ধ। সে-বকম রেগে গেলে মাথায় খুন চাপে আর একজোড়া মেয়ে পুরুষের মাথা দু'ফাঁক করে জেল খেটে এসেছে শুনে অ্যানজেলার প্রথম কিছুদিন একটু ভয়ে ভয়ে কেটেছিল। কিন্তু ওটাও তো দজ্জাল কম নয়। দিনের পর দিন মুখ বুজে কলের মানুষের মতো কাজ করতে দেখে ওর সাহস বেড়েছে। ফাঁক পেলেই ওর ওপর হম্বিতম্বি করে।

...লোকটার সাহসের নজির এখন পর্যন্ত খুব একটা দেখিনি। কিন্তু আমার আর মায়ের ধারণা লোকটার বুকের পাটা আছে। ঘরের কাজ ছাড়া যখন যেখানে বেরোয় ওই মজবুত পাকা লাঠি সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমাদের এই এলাকার নাম টিকলি (এখানকার জায়গাগুলোর নামের মাথামুণ্ড বুঝি না)। ঘাটশীলা এখান থেকে চার পাঁচ মাইলের মধ্যে। বছরের বেড়ানোর মৌসুমে সেখানে লোক ধরে না। এই হাওয়া বদলের ঝোঁক বছরে বছরে বাড়ছেই। ফলে জায়গা না পেয়ে এ-দিকটায়ও লোকের ভিড় বাড়ে। আর এই সময়ে চোর-ডাকাতেরও উপদ্রব বাড়ে কিছু। শুনেছি বিহার আর সিংভূম থেকে ওই অবাঞ্ছিত লোকের আনাগোনা বাড়ে। আমাদেরও তখন একটু বেশি সাবধানে থাকার দরকার হয়। এ-সময়টা আমাদেরও বাড়তি রোজগারের মৌসুম। মোটর জিপ বা জোঙ্গাতেও কম লোক আসে না। স্টকের পার্টস্ তখন ডবল দামে বিক্রী হয়। পরদিন ব্যাঙ্ক না খোলা পর্যন্ত, বিশেষ করে শনি-রবিবার ঘরে অনেক কাঁচা টাকা মজুত থাকে। রিখু আসার পর হাওয়া বদলের প্রথম মৌসুমের শুরুতেই মা ওকে ডেকে বলেছিল, এই ক'টা মাস রাতে বাড়ি পাহারা দেবার জন্য তোমার চেনা-জানা আর একজন সাহসী লোক নিয়ে এসো, আর রাতে দুজনেই সজাগ থেকো।।

রিখুর চোখের বা চাউনির কোনো ভাষা নেই। সুখে দুঃখে ভালোয়-মন্দয় সমান নির্বিকার। মায়ের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে এই হুকুমের কারণ আঁচ করেছে। তারপর খুব সাদামাটা গলায় জবাব দিয়েছে এই মুলুকের সব চোট্টা আর ডাকু রিখুকে জানে আর তার 'ই-লাঠিটো' চেনে—মেমসাহেবের ডর লাগলে রিখু মরদের এ-কোঠি থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

এই জবাব শুনে মা শুধু খুশি নয়। চকচকে চোখে আমার দিকে এমন তাকিয়েছে যার অর্থ রিখুর কথাগুলো জামাইয়ের কানে গেলে ভালো হত।...রাতের ঘুমও কম লোকটার, মা আর আমি দু'জনেই লক্ষ্য করেছি। দুই বাংলোর বারান্দাতে সমস্ত রাত একটা করে চড়া আলোর হ্যাসাক জ্বলে। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙলে প্রায়ই লাঠি ঠোকার শব্দ কানে আসে। দু'চার দিন উঠে দেখেছি কি ব্যাপার। কালো ঢ্যাঙা লোকটা আবছা অন্ধকারে প্রেতের মতো কম্পাউণ্ডের চার দিকে টহল দেয় আর থেকে থেকে লাঠি ঠোকে। মা খুশি। ভাবে পাহারা দেয়। কিন্তু আমার কেমন মনে হয় বউ খোয়ানোর খেদ লোকটা এখনো ভুলতে পারেনি।

খুব স্বাভাবিক কারণেই রিখুর ওপর অ্যানজেলার চাপা রাগ। হিংসেও বলা যেতে পারে। দেড় যুগের ওপর ধরে নিজেকে অ্যানজেলা মায়ের খাস তাঁবের একজন ভেবে এসেছে। ভয়ে হোক বা জামাইয়ের সঙ্গে বনিবনা হল না বলে হোক, মেমসাহেব নিজের আলাদা বাংলো বানিয়ে তফাতে সরে গেল, কিন্তু ওকে ছেড়ে নিজের জন্য বেছে নিল কিনা রিখুকে! আর ওকে রেখে গেল আমার হেপাজতে! এমনিতে ও মায়ের থেকে আমাকে অনেক বেশি পছন্দ করে। কারণ, পান থেকে চুন খসলে মায়ের কড়া মেজাজ। সে-তুলনায় আমাকে ঢের বেশি নিরাপদ ভাবে। কিন্তু তফাতে সরলেও আসল কর্ত্রী তো মেমসাহেবই—এতকাল বাদে তার এ কেমন পক্ষপাতিত্ব। অবশ্য দরকার মতো আমার বা মায়ের দু'জনার কাজে ওদের দু'জনারই ডাক পড়ে, তবু খাস মনিব তো বদলে গেল। আর অত বুদ্ধি আর দাপটের মেমসাহেব যে জামাইয়ের সঙ্গে যুঝতে না পেরে মানে মানে তফাতে হটল, ওকে কিনা তারই পাল্লার মধ্যে রেখে গেল। মা ওই বাংলোয় গিয়ে আলাদা হেঁসেলের ব্যবস্থা করার পর অ্যানজেলাকে অনেক সময় রাগে গজগজ করতে শুনেছি, ওই 'কেলে-ঢ্যাঙাকে' রান্না শেখানোটাই আমার কাল হয়েছে...।

মেজাজ চড়লেই রিখুকে ও কেলে ঢ্যাঙা' বলে। রিখুর কালো চামড়ার চেকনাই শুধু ওর থেকে একটু বেশি, নইলে দু'জনেই উনিশ-বিশ। আর অ্যানজেলাও লম্বাতো বটেই, ধুমসি ওর ডবল। মায়ের অবিবেচনায় ওর এত খেদের আসল কারণ ভয়। ভয় জেরিকে। যত দিন যাচ্ছে ওর ভয় বাড়ছে। টিকলির সক্কলের ও ঘরের খবর রাখে। মৌভাণ্ডার মোসাবানী রাখা ঘাটশীলার মানুষদের খবরও সবার আগে ওর কানে পৌঁছয় কি করে ও-ই জানে। যা-ই শোনে সেটা ওর মুখে তিল থেকে তাল হয়। আর পাকে প্রকারে আমার কানে না তোলা পর্যন্ত ওর পেটের ভাত হজম হয় না। সকালে দুপুরে বিকেলে জেরি সাহেবের ওই কোণের ঘরে কত রকমের লোক আসে, দুপুরে আমি খেতে এলে বা সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরলে ও সেই ফিরিস্তি দিত। আমার দাবড়ানি খেয়ে সেটা বন্ধ হয়েছে। আমি জানি যারা আসে তাদের বেশির ভাগ জেরির জুয়ার আড্ডার নয়তো নেশার আড্ডার লোক। মৌভাণ্ডার কপার করপোরেশন, মোসাবাণী-রাখা কপার-মাইন, জাদুঘোড়ার অ্যাটমিক মিনারাল প্রজেক্ট আর ভাটিনের ইউরেনিয়াম



মাইন-এ কম বেশি লেখাপড়া জানা কর্মচারীর সংখ্যা কম নয়। রতনে রতন চেনে। এদের মধ্য থেকেই জেরির ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। হয়তো কিছু শত্রুর সংখ্যাও। মাঝে মাঝে ওই বদ্ধ ঘরের থেকে বচসাও কানে আসত। আমার ধাতানি খেয়ে আর পুলিশ ডাকার শাসানিতে সেটা বন্ধ হয়েছে। নিজের গরজেই স্থানীয় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে মায়ের খাতির। সেই সুবাদে আমার সঙ্গেও। বিশেষ বিশেষ উৎসবে মা-কে ভেট পাঠাতে দেখা যায়। তাতে দামী বিলিতি বোতলও থাকে। জেরি এ-সব জানে। একদিন তো ও-ই মায়ের ডান হাত ছিল।...পুলিশ ওদের জুয়ার আড্ডার নেশার আড্ডার হদিস কেন পায় না আমার মাথায় আসে না। যাক্। এর পরেও অ্যানজেলা বার কয়েক আমাকে চুপি চুপি জানিয়েছে ও নাকি কম্পাউণ্ডের বাইরে আজে-বাজে লোককে ঘুর-ঘুর করতে দেখে। ওদের চাল চলন চাউনি অ্যানজেলার খুব সরল মনে হয় না।

আগে হলে কান দিতাম না। কারণ আমার বিয়ের আগে অনেক ছেলে ছোকরাকে হরদমই কম্পাউণ্ডের আশপাশে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। কতগুলো মুখ তো চেনাই হয়ে গেছল। ভাব জমানোর চেষ্টায় মায়ের অনুপস্থিতিতে অনেকে দোকানেও যেত। চাকার দাম জিগ্যেস করত, পার্টসএর দাম জিগ্যেস করত। আমি হাসি মুখেই দাম বলতাম। বলতাম, আমার নাগালের মধ্যে আসার দাম ওগুলো থেকে ঢের ঢের বিপজ্জনক রকমের বেশি। বিয়ের পর অবশ্য এ-ধরনের উৎপাত অনেকটাই কমেছে। কিন্তু একেবারে নয়। এখনো দু'চারটে উটকো লোক দরকারের অজুহাতে সামনে এসে দাঁড়ায়। বাংলোর আশপাশেও দুই একজনকে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। চোখে দেখেই যেটুকু তৃপ্তি আর শান্তি। আমার একটুও রাগ হয় না। বরং নিজের কাছে নিজের কদর বাড়ে।

কিন্তু বাড়িতে বাইরের লোকের বচসা বন্ধ হবার পরে অ্যানজেলার এই কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো মনে হয়নি। ঘরের লোকের সঙ্গে বাইরের লোকের শত্রুতার দুটো কারণ আমার মনে এসেছে। এক, নেশার জোগানদারিতে জেরি এখন মার্কা-মারা মানুষ। হয়তো টাকা খেয়ে কারো কারো সঙ্গে কথার খেলাপের ফলে শত্রুতা। অথবা নেশার মান নিয়ে বচসা। আর দ্বিতীয় কারণ বা সম্ভাবনাটাই আমার কাছে অসহ্য। ভাবলেও মাথায় রক্ত ওঠে।...যে-ভাবেই হোক, মানুষ বশ করার ওর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে এ স্বীকার করতেই হবে। নইলে আমি বশ হলাম কেমন করে।...মায়ের মতো অমন তুখোড় বুদ্ধিমতী মেয়েও ওর হাতের মুঠোয় চলে গেছল কি করে। এই বিশেষ ক্ষমতার ফলেও ওর অনেক ভক্ত —এই ভক্তরাই নেশার দলে আর জুয়ার দলে ভেড়ে। বাঙালি অবাঙালি কত লোকের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে ঠিক নেই। এদের মধ্যে ঘরে কারো কারো সুন্দরী বউ থাকা স্বাভাবিক।...আমি জানি, জেরি রুবিন চাইলে গেরস্ত বউয়ের বদ্ধ ঘরের শক্তপোক্ত আগলও খুলে যেতে পারে। পারে কেন, খুলে যাবেই। জানতে পারলে কোন পুরুষ তা মুখ বুজে সহ্য করবে? জেরির শত্রু যদি

কেউ থেকে থাকে তো তারাই কিনা আমি জানি না। আমি ভাবতে চাই না। ভাবতে গেলে অশান্তি। কাজ পশু। তবু এই ভাবনা কোন ফাঁক দিয়ে কখন মগজে ঢোকে কে জানে।

...ঘরের সুন্দরী বউ নিয়ে পুরুষের অশান্তির কথা হাজারো শুনেছি। লোকে আমাকেও সুন্দরী বলে। কিন্তু আমার বেলায় উল্টো। আমাকে নিয়ে কোনদিন জেরির এতটুকু দুর্ভাবনা দেখিনি। তাকে নিয়ে যত চিন্তা আমার। সুন্দর স্বামী নিয়ে আমার সুখ শান্তি কত যে ব্যাহত হয়েছে, কত দুঃখে দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় কাজে ডুবে থাকতে চেষ্টা করি, অবসর সময়েও বাড়িতে হিসেব নিয়ে বসি, জানলে লোকে হাসবে। কিন্তু এর যন্ত্রণা শুধু আমিই জানি।

অ্যানজেলার কথা শুনে আমি ঘাবড়েছিলাম। চাল-চলন-চাউনি আদৌ সরল মনে হয় না এমন আজে-বাজে লোককে ও কম্পাউণ্ডের বাইরে ঘোরাঘুরি করতে দেখছে। অ্যানজেলা পাকা মাথার মেয়ে। এক জেরি ভিন্ন সতিকারের ভয় ও কাউকে করে না। সন্দেহের কারণ না থাকলে ও এ-কথা বলত না। শোনার পর সুন্দর মুখ সুন্দর দেহের একটা বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে। অথচ আশ্চর্য, কত দিন কত সময় জেরির সুন্দর দেহ সুন্দর মুখ আমারই পায়ের নীচে ফেলে থেঁতলে দিতে ইচ্ছে করে। মায়ের তো আরো বেশি ইচ্ছে করে। ইচ্ছেটা একই...তবু কত তফাত।

রিখুকে ডেকে শুধু বলেছি, আমাদের কম্পাউণ্ডের বাইরে বাজে লোক ঘোরাঘুরি করে শুনলাম, তুমি লক্ষ্য রেখো।

ও কি বুঝল মুখ দেখে অন্তত বোঝার উপায় নেই। কাউকে কোনভাবে এরপর ও সামলে দিয়েছে কি না তা-ও খবর রাখি না। কিন্তু তারপর অনেক দিন পর্যন্ত বাংলোর আশপাশে চেনা-মুখ রসিক ভক্ত কটিরও টিকির দেখা মেলেনি।

...এই দিনের অর্থাৎ এই সন্ধ্যার কথা বলতে গিয়ে বারবার পিছিয়ে পড়ছি। ব্যবসার হাল দেখে খোশমেজাজে খেতে এসেছিলাম। সাইকেল রেখে সিঁড়ি ক'টা টপকাবার আগেই লক্ষ্য করেছি কোণের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। লোকটা গত রাতে ফেরেইনি মনে হতে ভুরুর মাঝে হয়তো বিরক্তির ভাঁজও পড়েছে একটু। তার বেশি কিছু নয়। মুখ-হাত ধোয়া হতেই অ্যানজেলা খাবার টেবিলে লাঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছে। ও রাঁধে ভালো। আর সমস্ত সকালের ধকলের পর বেশ খিদেও পায়। মুটিয়ে যাবার ভয় আছে, আবার সামনে মনের মতো খাবার দেখলে বেশি খাওয়ার লোভও সামলাতে পারি না। আয়েস করে খাচ্ছিলাম, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে অ্যানজেলাকে লক্ষ্য করছিলাম। মনে হয়েছে কিছু বলার জন্য ওর পেট ফুলছে। খারাপ খবর কিছু থাকলে ওর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ছটফটানি দেখেও। সে রকম লাগছে না বলেই কিছু জিজ্ঞেস করছি না।

খাওয়া শেষ হয়ে আসতে ও বলেই ফেলল, জেরি সাহেব এগারোটা বেজে তিন



মিনিটে ফিরেছেন, চান খাওয়া সেরেই—

ওর ঘণ্টা মিনিট ধরে সময় জ্ঞানটা মায়ের শিক্ষা।

—তোমাকে কিছু জিগোস করা হয়েছে?

ও থতমতো খেল।—না...বলছিলাম আজকের ডাকে জেরি সাহেবের নামে একটা চিঠি এসেছে...খামের ওপর দেখলাম ইউ এস এর ছাপ—

আমার উৎক্ষ চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। কলকাতা বা বিহার থেকে জেরির নামে অনেক সময় চিঠি বা পার্সেল আসতে দেখে। সেটা কোনো খবর নয়। দুই একবার লণ্ডন থেকেও চিঠি বা পুরু খাম আসতে দেখেছে। এটাও খবর নয়। এবারে ইউ এস এ'র খাম। তাই এটা খবর। আর তাইতে অ্যানজেলার চোখে কিছু বাড়তি বিস্ময়। বাড়তি ভয়ও। ওর ধারণা, জেরি সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা, প্রেত আত্মার ওপর প্রভাবের খবর এই ধলভূম ছাড়িয়ে সিংভূম পেরিয়ে কলকাতা থেকে লণ্ডন আর এখন ইউ এস এ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এই তল্লাটের ভালো মন্দ সব খবর সবার আগে অ্যানজেলার কানে আসে আগেই বলেছি। ও জানে জেরি সাহেব কয়েকটা বছর আগেও সুবর্ণরেখার শ্মশান চরের কাছাকাছি ডেরায় প্রবল প্রতাপ গুণীন রামদেও মাহাতোর সব থেকে প্রিয় শিষ্য ছিল। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সাদা চামড়ার লেখা-পড়া জানা ভক্তকে ও-সব লোক একটু বেশি খাতির করবে জানা কথা। রামদেও মাহাতো মা-কেও খাতির করত শুনেছি। করবে না কেন। গণ্যমান্য জনের যত আনাগোনা, ওদের ততো পাবলিসিটি। এতে আর দশজন অজ্ঞ মূর্খকে তাক্ লাগানো সহজ হয়। আনজেলা এই বিশ্লেষণের ধার দিয়েও যায় না। ওর খবর, রামদেও মাহাতোর পিয়ারের চেলা জেরি সাহেব খোদ গুরুর ওপর এখন এমন টেক্কা দিয়ে চলেছে যে দুজনের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে। সেই চেলার দাপট এখন ভারত ডিঙিয়ে লণ্ডন পেরিয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে—অ্যানজেলা কণ্টকিত হবে না তো কি!

চোখ গরম করে অ্যানজেলাকে থামিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু আমেরিকার ডাকে কিছু এসেছে শুনে মনের তলায় একটু বিরক্তিকর অস্বস্তির ছায়া পড়েছে। বছরখানেক হল ঘাটশীলার কাছাকাছি একদল হিপি এসে আস্তানা গেড়েছে। চেহারাপত্র পোশাক-আসাকের এমন ছিরি যে ভালো করে লক্ষ্য না করলে বোঝা দায় কে মেয়ে কে পুরুষ। নোংরার হদ্দ সব। মাসে ক'দিন চান করে কে জানে, হাসলে হলদে দাঁত বেরিয়ে পরে, দেখলে মনে হয় সর্বদা নেশায় ঢুলু ঢুলু। আমার গা ঘিনঘিন করে। সেই দলের কিছু মেয়ে-পুরুষ আমাদের এখানে আস্তানা গেড়েছে। প্রায়ই চোখে পড়ে। অ্যানজেলার তো আরো বেশি চোখে পড়বেই। মা আর আমার দুই সংসারেরই কেনাকাটা হাটবাজারের দায়িত্ব এখনো ওরই। ফাঁক খুঁজে দিনের মধ্যে কত বার বাংলো ছেড়ে বেরোয় ঠিক নেই। এ-চত্বরের সমস্ত বাংলো আর বাড়ি মিলিয়ে যত পরিচারিকা আছে তাদের মধ্যে অ্যানজেলার সব থেকে উঁচু মাথা। দু'পুরে আমি আর মা দু'জনেই

যখন বাড়ি থাকি না, অর্থাৎ বেলা আড়াইটে থেকে চারটের মধ্যে অ্যানজেলার ঘরে জমাটি আসর বসে সেটা বৃন্দার মুখে শুনেছি। অ্যানজেলা নিজের চোখ, কান ছেড়ে এই আসরের মেয়েদের চোখ-কান দিয়েও অনেক দেখে, অনেক শোনে। চার পাঁচ মাস আগে ও আমাকে বলেছিল, ওই হিপি ছেলে-মেয়েগুলোর সঙ্গে জেরি সাহেবের খুব ভাব দেখছে। শুধু ও কেন, আরো অনেকেই নাকি সাহেবকে ওদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আর ফূর্তি করতে দেখে। এ-সব ছেলে-মেয়ে জেরির জুয়া আর নেশার আড্ডার ভক্ত হয়ে উঠবে সে আর বিচিত্র কি। রাস্তায় নিজের চোখে একদিন গল্প করতে দেখে পরে জেরিকে বলেছি, ওদের কোনদিন আমার বাংলোয় দেখামাত্র আমি অপমান করে বার করে দেব এটা খুব ভালো করে মনে রেখো।

আমার কোন হুমকি অবহেলা করার নয় জেরি ইদানীং সেটা ভালোই বোঝে। আর তখন একটু সমঝেই চলে। ওই হিপিদের কাউকে এ পর্যন্ত বাংলোয় ঢুকতে দেখিনি। ইউ এস এ থেকে ডাক আয়ার খবরে একটু খটকা লেগেছে কারণ, ওই হিপিদের জগৎ আমার কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। ওদের নিয়ে অনেক রকমের রটনা কানে আসে। কখনো শুনি ওদের মধ্যে অনেক স্পাই আছে, খবর চালান দেবার জন্যেই এ-দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ওদের সম্পর্কে ডাক্তার অরুণ ডাট্টা সেদিন কথায় কথায় বলছিল তার ধারণা, দেশের নৈতিক চরিত্র খারাপ করে দেবার জন্যেই দেদার টাকা খরচ করে আমেরিকা থেকে ওদের পাঠানো হয়। উচ্ছৃঙ্খল বেলাল্লাপনার সস্তা আকর্ষণ কোথায় নেই। সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিষ ঢোকাতে পারলে ওদের কি লাভ বুঝি না। কিন্তু ডাক্তার অরুণলালের মতামতের দাম আমার কাছে অন্তত কম নয়। আবার এও শুনি ভবঘুরে জীবন-যাত্রা আর রকমারি নেশার বৈচিত্র্যের খোঁজেই এরা দলে দলে এ-দেশে পাড়ি জমায়। আবার ভাবি, শুধু তাই যদি হবে তো সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে ওদের এ-দেশে আসার খরচ জোগায় কে—দেখলে তো মনে হয় সম্বলশূন্য ছন্নছাড়া সব।

বাংলোয় আজ আমেরিকার ডাক এসেছে শুনেই মনে হয়েছে ওই হিপিদের মারফতই ওই দেশের কারো সঙ্গে জেরির যোগাযোগ ঘটেছে। তারপরেই দুটো সন্দেহ মনে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গেছে। এক, কোনো গোপন চিঠি-পত্র হতে পারে যা আমার বাংলোর ঠিকানায় এলে কারো কোনরকম সন্দেহ হবে না। এই সন্দেহটা উদ্‌বেগজনক। আর হতে পারে নতুন কোনো নেশার ফরমুলা। আমার ধারণা, অলৌকিক বিদ্যা বা প্রেত-বিদ্যার অনুশীলনের থেকেও নেশার গবেষণার দিকেই জেরির ইদানীং ঝোঁক বেশি। এর ফলে ভদ্র-ঘরের ভক্ত বেশি জোটে আর পকেটেও কিছু বেশি আসে। এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাও বিরক্তির কারণ।

যাক, এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামানোর সুযোগ পাইনি। খাওয়া দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে বেলা দুটোর মধ্যেই আবার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আসার সময় কাজের চাপ দেখে এসেছিলাম। মোটর-ফিটকরা সাইকেলের আলোর



ব্যাটারি ফুরিয়েছে তখনো মনে ছিল। ভেবেছি এক ফাঁকে বেরিয়ে কিনে নিলেই হবে।

সার্ভিসিং স্টেশনে এসে মেজাজ আরো ভালো। এখনো একটা গাড়ির সার্ভিসিং চলেছে, তার পিছনে আরো একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে। ও-দিকে গ্যারাজে এক-সঙ্গে দুটো গাড়ির মেরামতি চলেছে, আর একটা মাল-বোঝাই লরি বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের মুখ দেখেই বোঝা গেছে মেরামতির সব ক'টা গাড়ির সঙ্গেই মোটা দাঁওএ রফা হয়েছে। কিন্তু তার গাম্ভীর্যে ফাটল ধরে না বড়। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কোন্ গাড়ির কি কাজ হচ্ছে বা হবে বুঝিয়ে দিল, কোনটার কি চার্জ ধরা হয়েছে বলল। তারপরেই গলার স্বরে বিরক্তি, মনবাহাদুরকে নিয়ে বিন্‌ডা সেই দেড়টায় ব্যাঙ্কে গেছে, এখন দুটো পঁচিশ, এখনো ফেরার নাম নেই। তোর আসকারা পেয়েই ওর দায়িত্বজ্ঞান কমছে আর কাজেও ফাঁকি দিচ্ছে।।

একমাত্র আমি ছাড়া মা এখানকার আর সকলেরই দায়িত্বজ্ঞানের অভাব দেখে আর সবাইকেই কাজে ফাঁকি দিতে দেখে। আর আমাকেও সর্বদাই ওদের প্রশ্রয় দিতে দেখে। কিন্তু হাসিমুখে এদের সঙ্গে মেলামেশা করে দরকার মতো নিজেও কাজে হাত লাগিয়ে আমি যে এদের কাছ থেকে ঢের বেশি কাজ পাই সেটা মা বুঝেও বোঝে না।

...বেলা দেড়টা নাগাদ মায়ের সাইকেল রিকশায় মনবাহাদুরকে নিয়ে ব্যাঙ্কে যাওয়াটা বৃন্দার নিত্যকার কাজ। সকাল থেকে ওই সময় পর্যন্ত, আর তারপর থেকে আগের দিনের বিক্রীর সব-টাকা বৃন্দা কাছের ব্যাঙ্কে জমা দিতে যায়। সাইকেল রিকশয় যেতে আসতে মিনিট পনের লাগে। আমি লাঞ্চ সেরে এসে বসলে আর ব্যাঙ্কের বই মায়ের হাতে জমা পড়লে তবে বৃন্দার খাবার ছুটি। মায়ের কড়া ব্যবস্থায় এখানকার সঙ্কলের সব কাজ ছকে বাঁধা। এমন কি আমারও। আর তার নিজেরও। ঠিক চারটেয় তার সাইকেল রিকশয় উঠে বাংলোয় ফিরবে। চা-টা খেয়ে আর ঘরের কাজের তদারক সেরে ওই সাইকেল রিকশ নিয়ে আবার ঠিক সাতটায় দোকানে আসবে, ন'টা পর্যন্ত থাকবে। সন্ধ্যার পরে আমার দোকানে থাকাটা মা একেবারেই বরদাস্ত করে না। তার ধারণা আমাকে খাবার জন্য শয়তানের দল চারদিকে ওত পেতে আছে। তাই কড়া হুকুম বৃন্দা ফিরে এলে ছ'টা সাড়ে ছ'টার মধ্যে দোকান ছেড়ে আমাকে বাংলোয় ফিরতে হবে। সেটা সব-দিন সম্ভব হয় না বলেই হয়তো বৃন্দা ছ'টার মধ্যে দোকানে ফেরে কিনা মা চুপিচুপি মনবাহাদুররের কাছে খোঁজ নেয়। কাজের বেশি চাপ পড়লেও এক-এদিন আমার ফিরতে দেরী হয়। কখন ফিরি না ফিরি উল্টোমুখো বাংলোয় বসেও মা ঠিক টের পায়। অ্যানজেলা বা রিখু তো মায়ের কাছে মিথ্যে বলবে না। মায়ের পাল্লায় পড়েই অ্যানজেলা ঘড়ির কাঁটার ঘণ্টা মিনিট ধরে সময় বলতে শিখেছে। আমি বাংলোয় দেরিতে এলে আর জামাই তখন ঘরে না থাকলে মা নিজেই এসে খোঁজ নেয় দেরি কেন হল। আর একটা গজগজানি মুখে লেগেই আছে, বিপদ রোজ রোজ হয় না। একবার বিপদে পড়লে তখন আর কে দেখতে আসছে!

মায়ের সব থেকে বেশি ত্রাস তার জামাই অর্থাৎ আমার জীবনের দোসরটিকে নিয়ে

এ আমি বেশ বুঝতে পারি। ত্রাস জেরিকে নিয়ে। পাঁচ রকমের শয়তানের সঙ্গে প্রাণের মিতালি তার। চক্রান্ত করে কখন কাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দেয় বিশ্বাস কি! সাহস করে নিজে কিছু করবে ভাবে না হয়তো। তাছাড়া বাংলোয় ফিরলে রিখু আছে। তার শক্তি সাহসের ওপর মায়ের অন্ধ বিশ্বাস এখন। কিন্তু আমি জানি, রাতে জেরির সঙ্গেও কোথাও বেরুলে না ফেরা পর্যন্ত মা ছটফট করে। এ-জন্যে মায়ের সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়াও হয়ে গেছে।...একসময় মায়ের সব থেকে অন্ধ আক্রোশ আর রাগ ছিল কলকাতায় তার বাঙালি শ্বশুর বাড়ির ওপর। মাথা উঁড় আমার বাঙালি বাবাকে বিয়ে করে মাথা রায় হয়েছিল।...আমার বাঙালি বাবার ওপর মায়ের এখনো হয়তো কিছু দুর্বলতা আর কিছু শ্রদ্ধা আছে। সে-বেচারা অকালে মারা গেছে বলে হোক, বা তাকে সত্যি ভালবেসেছিল বলে হোক, তার সম্পর্কে কখনো কোনো বিরূপ মন্তব্য শুনিনি। বাবার গল্প মা খুব একটা করতে চাইত না। কিন্তু বড় হয়ে ফের আবার কলকাতার দাদুর বাড়ি ছেড়ে মায়ের আশ্রয়ে এসে আমি শুনতে চাইতাম। মা যেটুকু বলত তাতে বাবার প্রশংসা ছাড়া নিন্দের কিছু থাকত না। কিন্তু ভীষণ রাগ আর আক্রোশ দেখতাম আমার ঠাকুমা জ্যাঠা-জেঠি আর পিসীর ওপরে। এত রাগ যে তাদের কারণে সমস্ত বাঙালির ওপরেই তার বিজাতীয় বিদ্বেষ দেখতাম। আমাদের অটো সার্ভিস স্টেশনে গ্যারাজে দোকানে অনেক লোক কাজ করে। কিন্তু একজনও বাঙালি নয়। আমার গোঁ-এর কাছে হার মেনে কেবল বৃন্দাবনকে রাখতে হয়েছে। তা-ও খুশি থাকলে (সেটা কদাচিৎ) বলে, বিনুড়া আর বাঙালি নেই, এখানে থেকে থেকে এ-দিশীই হয়ে গেছে। মৌভাণ্ডারের কপার-ফ্যাক্টরি বা রাখা-মোসাবাণী কপার মাইনে মায়ের খাতিরের অফিসারদের মধ্যে একজনও বাঙালি নেই। অসুখ-বিসুখে এখানে একজন পৌঢ় বাঙালি ডাক্তারের ভালো পসার ছিল। বছর কয়েক হল ডাক্তার অরুনলাল এসে জাঁকিয়ে বসার পর থেকে ওই বাঙালি ডাক্তারকে মা ছেঁটে দিয়েছে। অরুণলাল এই সিংভূমের লোক। আমি আসার মাস দুই পরে এই জাদুচকে চেম্বার খুলে বসেছে। নিজের গুণেই ভদ্রলোক স্থানীয় লোকের প্রিয়জন হয়ে উঠেছে—ডাক্তার ভালো, তার ওপর ভদ্র বিনয়ী, রোগীদের ওপরেও দরদ খুব। কিন্তু বাঙালি হলে মা তাকে এত খাতির বা স্নেহ করত না। এখন তো মায়ের তার ওপর অন্ধ বিশ্বাস।...এখান থেকে ছ' সাত মাইলের মধ্যে পাথরের খনি আছে একটা। সেই পাথরের বাসন আর আসবাবপত্রের ব্যবসা করে যে-ভদ্রলোক অনেক টাকা করেছে, বাড়ি-গাড়ি করেছে তার নাম প্রসাদ গুপ্তা। খুব একটা লেখা-পড়া জানা লোক মনে হয় না। টাকার জোরে গ্র্যাজুয়েট বউ ঘরে এনেছে। দু'জনার বয়েসের বেশ ফারাক—বউটা আমার থেকে বছর দুই-তিনের বড় হবে। দেখতেও ভালো। নাম মালা গুপ্তা। তার সঙ্গে মায়ের বেশ ভাবসাব হবার আগে প্রথমেই খোঁজ নিয়েছে বাঙালি কিনা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অবাঙালি শুনে নিশ্চিন্ত। এখন তো মিস্টার আর মিসেস প্রসাদ গুপ্তার সঙ্গেও মায়ের সমবয়সীর মতো ভাব।...বিয়ের আগে মা আমাকে কোনো বাঙালি ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিত না। এই এক ব্যাপারে আমাকে



কড়া শাসনে রাখতে চাইত। বলত, ওদের মধ্যে ভালো কেউ নেই বলছি না, কিন্তু ওরা আলাদা করে কেউ না, বাপ মা ভাই বোন সক্কলের ওদের ওপর জোর—আমার মতো কপাল হলে মরবি!

আমার বিয়ের এক বছর না যেতে সেই মায়ের সব জাত ছেড়ে যত রাগ আর বিদ্বেষ শুধু একজনের ওপর। তার জামাই জেরি রুবিনের ওপর।

দুপুর দেড়টার পর থেকে তহবিলে যা জমা পড়ে করাক্রান্তিতে তার হিসেব মিলিয়ে সব টাকা স্ট্রং রুমের সিন্দুকে রেখে মা রাত ন'টায় দোকান ছাড়ে। স্ট্রং রুম বলতে আমাদের অফিস-রুমের পিছনের একটা খুপরি ঘর। তার দরজার এ-ধারে কোলাপসিবল্ গেট লাগানো। ওই ঘরে সব থেকে দামী আর মজবুত গোদরেজের সিন্দুক এনে বসানো হয়েছে। টাকা রাখার পর ওতে চাবি পড়ে। তারপর কোলাপসিবল্ গেট আটকে তাতে তালা লাগানো হয়। এই দুটো চাবিই হাত ব্যাগে ফেলে মা রিকশয় ওঠে। রাতে ডাকাত পড়লেও মনবাহাদুরের বন্দুক এড়িয়ে ওই কোলাপসিবল গেটের তালা ভাঙা সহজ নয়। সেটা সম্ভব হলেও ওই সিন্দুক ভাঙা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। রাতে অফিস ঘরের সামনেই দরজা আগলে মনবাহাদুর খাটিয়া পেতে শোয়। পাশে কার্তুজ-পোরা বন্দুক থাকে। রাত ন'টার পর সার্ভিসিং বা গ্যারাজের কাজ থাকে না। তেল, ডিজেল বিক্রিও কমই হয়। যা হয় তার টাকা বৃন্দা তার দেরাজে তুলে রাখে। পরদিন সকাল আটটায় আমি এলে হিসেব দাখিল করে।

...আমার বিয়ের এক বছর না যেতে মায়ের বাংলো শুধু বদলায়নি, এখানকার অনেক ব্যবস্থাও বদলেছে। বদলেছে আমার ঘরের ওই একজনেরই কারণে। আগে ওই স্ট্রং রুম ছিল না, কোলাপসিবল্ গেট ছিল না, ওই মজবুত সিন্দুকও ছিল না, রাতের টাকা রাতে মায়ের সঙ্গেই তখন বাংলোয় যেত। মায়ের শোবার ঘরে মজবুত আর ভালো আলমারি এখনো আছে। তাতে লকারও আছে। রাতের টাকা সেখানে থাকত। অনেক টাকা জমে গেলে ব্যাঙ্কে পাঠানো হত।...আর সেটা নিরাপদ না ভাবার কারণ যথেষ্টই আছে। মা যা করেছে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছে। আমি আপত্তি করব কোন্ মুখে? তার জামাইয়ের নেশায় আর জুয়ায় আজ পর্যন্ত কত হাজার টাকা উবে গেছে তার হিসেব আমি না রাখলেও মা নিশ্চয়ই রাখে। আমি কষ্ট পাই বলেই টাকার অঙ্ক শুনিয়ে গঞ্জনা দেয় না। টাকার জন্যে জেরি সামনে এসে দাঁড়ালে মা টাকা বার করে দিত। মায়ের কাছ থেকে চেয়ে এনে আমিও দিতাম। দিতে বাধ্য হতাম। অবশ্য সে দিন এখন আর নেই। আমি ছেড়ে মায়েরও মনের বল এখন অনেকটাই বেড়েছে।

...তিন বছর আগে মায়ের এই রিকশ বা আমার এই মোটর ফিট্-করা সাইকেলও ছিল না। তখন আমাদের ভারী ভালো একখানা অস্টিন গাড়ি ছিল। জামসেদপুরে মায়ের চেনা-জানা একজন ইংরেজ ভদ্রলোক দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে তার অত যত্নের গাড়িটা খুব শস্তায় মাকে দিয়ে গেছল। ওই গাড়িটা আমার চোখের মণি ছিল। মা ওটা নিজে ড্রাইভ করত। আমি ড্রাইভিং শেখার পরে ও গাড়ি মায়ের হাতেও ছাড়তে

চাইতাম না। তিন বার করে আমিই পৌঁছে দিতাম নিয়ে আসতাম। ওটা নিয়ে ঘোরা আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খেয়ালখুশি মতো কোথায় কত দূরে দূরে না চলে গেছি।...জামাইয়ের জ্বালায় সেই অস্টিন গাড়িও মাকে বেচে দিতে হয়েছে। না দিয়ে করবে কি, খুব দরকারের সময়েও ওই গাড়ি কি আমরা পেতাম। জিজ্ঞাসাবাদ না করে যখন তখন ওই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। বারণ করলে হেসে বলত এক্ষুনি আসছি। কিন্তু এক ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা চলে যেত, তার টিকির দেখা মিলত না। শিগগিরই আসছে বলে দোকান থেকেও গাড়ি নিয়ে চলে যেত। আমি থাকলে ঝগড়া হয়ে যেত, কিন্তু মা বাধা দিতে সাহস পেত না। যখন খুশি এসে গাড়িতে যত খুশি তেল ভরে নিত। আমি বা মা নেই এমন সময় বুঝেই বেশি আসত। যে বেচারা তেল দিত সে ভয়ে কাঠ হয়ে জানাতো বড় মেমসাহেব আর ছোটমেমসাহেবের নিষেধ আছে। জেরি হেসে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে নিজেই পাইপ লাগিয়ে তেল ভরে নিত। বলত, তোমাদের ওপর দিতে নিষেধ, আমার ওপর তো নিতে নিষেধ নেই।...দু'ঘণ্টার মধ্যে আসছে বলে একবার গাড়ি নিয়ে ফিরল চার দিন বাদে। আমার রক্তচক্ষুর জবাবে হেসে জানান দিল হঠাৎ খুব দরকারে কলকাতা চলে যেতে হয়েছিল, দরকার সেরে সেখান থেকে ফিরছে। দিনের পর দিন তিক্ত বিরক্ত হয়ে আমিই মা-কে বলেছিলাম, আর দরকার নেই, গাড়ি বেচে দাও।

মা তাই করেছে। অত সাধের গাড়ি বেচে দিয়েছে। এখন আমাদের ব্যবসার যা অবস্থা তাতে একটা ছেড়ে আমার আর মায়ের দু'জনের আলাদা দুটো নতুন গাড়ি অনায়াসে হতে পারে। তার বদলে আমার এই মোটর ফিট করা সাইকেল আর মায়ের এই সাইকেল রিকশ। সুখের থেকে স্বস্তি ভালো ভাবি। আমার সাইকেলের মতো সাইকেল রিকশটাও মায়ের নিজস্ব। নিজের টাকায় কেনা। চালায় বুধিয়া। মাস মাইনের লোক। গাট্টা গোট্টা স্বাস্থ্য। এ-ও মায়ের নেকনজরের লোক এখন। এতদিনে পাকা হাত ওর। মা-কে নিয়ে তীরের মতো রিকশ ছোটায়। সকাল থেকে রাতের মধ্যে মা-কে নিয়ে অনেক বার তো জাদুচকের দোকান আর টিকলির বাংলো করেই, তার ওপর শেষ বারের মতো রাতে মা-কে বাংলোয় ছেড়ে বৃন্দার রাতের খাবার দোকানে পৌঁছে দিয়ে আসে। এই রিকশয় চেপেই অ্যানজেলা তার হাট বাজার সারে। বিকেলের দিকে মা-কে নিয়ে তার খাতিরের মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যায় নিয়ে আসে। খাতিরের লোক বলতে যাদের সঙ্গে ব্যবসার স্বার্থের যোগ তারা। মৌভাগ্যারে আর কপার মাইনের অবাঙালি অফিসারদের হেপাজতের বেশির ভাগ গাড়ির রিপেয়ার বা সার্ভিসিং মায়ের এই পাবলিক রিলেশনের ফলে আমাদের এখানেই হয়। কোম্পানির গাড়ির কাজ করে যত লাভ ততো আর কিছুতে নয়। এক কথায় বুধিয়া ছাড়া মা অচল। ওকেও বখশিস দেওয়া বা চার-ছ'মাস অন্তর কিছু কিছু মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারে মা কার্পণ্য করে না। রাতেও লোকটা মায়ের বাংলোর ঢাকা-বারান্দায় পড়ে থাকে।



মোটর বেচে দেওয়ার ফলে জেরির খুব আক্কেল হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। তার মতো মিষ্টি মুখ ধুরন্ধর পৃথিবীতেই আর কতজন আছে জানি না। গাড়ি নেই দেখে আর পরে সেটা বেচে দেওয়া হয়েছে বুঝে মুখে একটি কথাও বলেনি বা কিছু জিগ্যেসও করেনি। মিটিমিটি হেসেছে শুধু। মিষ্টি-মিষ্টি শিস্ দিয়েছে। একদিন ওর ওই শিস কি ভালোই না লাগত।...এখনো একেবারে লাগে না জোর দিয়ে বলতে পারি? কত রকমের আর কত রসের শিসই যে জানে। যাক গাড়ি বেচার পর ওই হাসি আর ওই শিসের অর্থ, মায়ে-ঝিয়ে মিলে আমরা যেন ভারী ছেলেমানুষি মজার কাণ্ড করেছি কিছু। এর মাসখানেকের মধ্যে এক কাণ্ড দেখে আমরা মা-মেয়ে হাঁ প্রথম।...বিকেল তখন তিনটে হবে। মা আর আমি দু'জনেই দোকানে। একটা জিপ এসে থামল। তেল নিতে এসেছে ভেবে আমরা ভালো করে লক্ষ্যও করিনি। দুটো লোক জিপ থেকে একটা ঝকঝকে নতুন মোটর সাইকেল নামাচ্ছে দেখে আমরা অবাক। জেরি কাছাকাছির মধ্যে কোথাও অপেক্ষা করেছিল নিশ্চয়। হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। মুখ ভরা হাসি। জিপের লোক দুটোর সঙ্গে কথা বলল। তারা মোটর সাইকেলটা ওকে ভালো করে দেখাতে শোনাতে লাগল। কিন্তু জেরির অত শোনার ধৈর্য নেই। এক কালে নিজে ভালো অটো-এনজিনিয়ার ছিল। নিজের হাতেই পাম্প থেকে নল টেনে নিয়ে ওই নতুন মোটর সাইকেলে তেল ভরে নিল। গর্জন তুলে স্টার্ট দিয়ে মোটর সাইকেলে চেপে বসতে লোক দুটোর একজন ওর দিকে কি কাগজ-পত্র বাড়িয়ে দিল। ঝুঁকে একবার সেগুলোর দিকে তাকিয়ে জেরি আঙুল তুলে সোজা মাকে দেখিয়ে দিল। তারপর ভটভট শব্দে ওটা চালিয়ে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

অফিস ঘরের কাচের ভিতর দিয়ে আমরা দু'জন হাঁ করে দৃশ্য দেখছিলাম। কাগজ পত্র হাতে লোকটা ভিতরে এল। নমস্কার করে সেগুলো মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমিও সেগুলোর দিকে ঝুঁকলাম। ব্যাপার বুঝে দু'জনের চার চোখ বিস্ফারিত আমাদের। জিপটা ওই নতুন মোটর সাইকেল নিয়ে আসছে জামসেদপুরের নাম করা এক অটো কোম্পানি থেকে। তার বিল সঙ্গে ফ্রেট চার্জ। এক হাজার টাকা জমা দিয়ে একমাস আগের তারিখে মায়ের নামে আর এই পামপিং স্টেশনের ঠিকানায় (সঙ্গে আমাদের বাংলোর ঠিকানাও আছে) নামজাদা ম্যানুফ্যাকচারারের নতুন মোটর সাইকেল বুক করা হয়েছে। আজ ডেলিভারি দেবার তারিখ। তাই দেওয়া হল। অ্যাডভান্সের এক হাজার টাকা বাদ দিয়ে ফ্রেট চার্জসহ আরো ন'হাজার একশ ষাট টাকার বিল। তার সঙ্গে আনুষাঙ্গিক অন্য কাগজ-পত্র।

ব্যাপার বুঝে আমি মায়ের দিকে চেয়ে আছি। মা আমার দিকে। তারপরেই রাগে আমার মাথায় আগুন জলেছে। ইচ্ছে করছিল ওই কাগজপত্র টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে লোকটাকেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিই। মায়ের ফর্সা মুখও রক্তবর্ণ। খানিক গুম হয়ে বসে থেকে হ্যাঁচকা টানে ড্রয়ার খুলল। চেক বইটা টেনে নিল। খসখস করে টাকার অঙ্ক লিখে নাম সই করল। তার ওপর পাম্পিং স্টেশনের সীল সশব্দে বসালো।

আমাদের দু'জনের আচরণ বা অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে লোকটা বেশ বিমূঢ়। চেক হাতে পেয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করল।

নতুন মোটর বাইকের শব্দ তুলে রাত দশটা নাগাদ জেরি বাংলোয় ফিরল। আমার মাথায় তখনো দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও একটা বড় রকমের বোঝাপড়া করার জন্য আমি অপেক্ষাই করছিলাম। মোটর সাইকেলটা চার সিঁড়ি টপকে বারান্দায় তোলা হল টের পেলাম। তারপর দিব্বি খোশ মেজাজে ঘরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলাম, ওই মোটর সাইকেল নিয়ে তুমি চুলোয় যাও—যেখানে খুশি যাও—আর এক মুহূর্ত এখানে নয়—যাও, যাও বলছি!

জবাবে পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এলো। তারপর আচমকা জাপটে ধরে আমাকে বুকে নিয়ে এলো। মুহূর্তের মধ্যে ওর একটা হাত আর আঙুলগুলো তৎপর হয়ে উঠল। আমার এই শরীরটার কোথায় কিভাবে স্পর্শ করলে স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জাগে, বাসনার আগুন ছোটে তা এই পৃথিবীতে ওর থেকে কে আর ভালো জানে। এই লোকের সংশ্রবে আসার আগে আমি নিজে পর্যন্ত জানতাম না। আর, একই মুমূর্তে আমার মুখের ওপর দুই ঠোঁটের ওপর সেই কারিকুরি যা অতি-চেনা কিন্তু সর্বদা নতুন। কিন্তু সেই রাতে আমি এ-সব কিছুই বরদাস্ত করতে রাজি নই। গায়ের জোর আমারও কম নয়। দুহাতে ওর গলা টিপে ধরলাম প্রথম। হাত একটু ঢিলে হতেই জোরে ধাক্কা মেরে চার হাত দূরে সরালাম। পড়তে পড়তে টাল সামলে নিল।

—স্কাউনড্রেল ব্লাডি সোয়াইন! লজ্জা করে না তোমার এই মুখ দেখাতে?

ও একটুও রাগ করছে না। করবে না জানি। ওর রীতিই আলাদা।—মুখ দেখাতে না পারার মতো কি করলাম!

—রাসকেল কোথাকারের— কি করলাম? বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে—কালই আমি ডিভোর্স সুট ফাইল করব!

...মুখের দিকে চেয়ে হাসছিল অল্প অল্প। হায় ভগবান, ভিতরে যে এত কুৎসিত বাইরে তার মুখে এত সুন্দর হাসি ফোটে কি করে। বলল, কালকের কথা কাল, আজ কি?

—আজ তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও!

—দূর হয়ে গেলে নিজেই তো পস্তাবে, কিন্তু কি ব্যাপার, ওই মোটর সাইকেল কেনার জন্য?

আমি রাগে কাঁপছিলাম। ভেঙচে উঠলাম, মোটর সাইকেল কেনার জ-ন্যে—কি-জন্যে তুমি বোঝো না? কোন সাহসে মায়ের নামে তুমি অত হাজার টাকার মোটর সাইকেল বুক করে আসো?

বেশ আয়েস করে খাটে হেলান দিয়ে বসল। গায়ে গণ্ডারের চামড়া। হাসছে!—তোমার মায়ের নামে বুক না করলে আমি অত টাকা পাব কোথায়! আমার বরাদ্দ তো মাসে মাত্র আড়াই হাজার টাকা, তার থেকেও অ্যাডভান্স



দিতে এক হাজার টাকা খসেছে— ও টাকাটাও ঠাকরোনের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। ...প্রথমে ভেবেছিলাম একটা স্কুটার কিনব, বুঝলে, তাতে দাম কিছু শস্তা হত, কিন্তু ভেবে দেখলাম এই পাথুরে জায়গায় ওই পলকা জিনিস সুবিধে হবে না, তাছাড়া কান-সরগরম করা মোটর সাইকেলে পুরুষ মানুষের ইজ্জত আলাদা— সমস্ত লোক ফিরে ফিরে দেখছিল। একটু আগে আসতে আসতে ভাবছিলাম, তুমি যখন এক হাতে আমার কোমর জড়িয়ে পিছনের কেরিয়ারে বসবে আর আমি ওটা সত্তর কিলোমিটার স্পিডে ছোটাব— তখন হিংসেয় কত লোকের বুক ফাটবে।

মাস দুই বাদে মা-কে বলেছিলাম এবারে একটা গাড়ি কিনলে হয়। মা সরোষে জবাব দিয়েছে, মোটর সাইকেলে ক'টা ইয়ার নিয়ে ঘোরা যায়, কিনলে ওটা আবারও ওর খপ্পরেই পড়বে। একটু ঠাণ্ডা হয়ে আবার বলেছে, লোকের চোখ কাড়ার দরকার কি, বেশ তো চলে যাচ্ছে।

বেশ চলে যাচ্ছে সত্যি কথাই। আর এ-ও সত্যি কথা, জেরির হাতে সাড়া-জাগানো মোটর সাইকেলটা যখন বাতাসে ছুটে চলে তখন চোখজুড়ানো পুরুষের মূর্তিই বটে ওর। পিছনের কেরিয়ারে আমি চাপি না এমন নয়। কিন্তু ওর তখন ছোটার উল্লাস বাড়ে, আর আমার ভয়ই করে। মায়ের সরোষ ভবিষ্যৎ বাণী, ওই মোটর সাইকেল থেকে ফেলেই জেরি একদিন আমাকে খুন করবে।

...সেদিনের কথা থেকে আবার দূরে সরেছি। মা ঠিক চারটেয় উঠে গেছে। যাবার আগে বলে গেছে, সন্ধ্যে না করে বিন্‌ডা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন দেরি না করে বাংলোয় ফিরি। রোজই মা এই এক কথা সমঝে দিয়ে যায়। এই দিনটা লাভের দিনই বটে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময়ও গাড়ির সার্ভিসিং চলছে। গ্যারাজের লোকেরা লরি মেরামতের কাজে হাত দিয়েছে। বেশ কয়েকটা পার্টস বিক্রী হয়েছে, একটা গাড়ি থামিয়ে খদ্দের দুটো নতুন চাকা কিনে ফিট করে নিয়ে গেছে। জামসেদপুর হাজারিবাগ রাঁচির দিকে গাড়িও আজ বেশি ছুটেছে, তার মানেই পেট্রল ডিজেল আর মবিল বিক্রী বেশি। মনের আনন্দে আমি কাজে ব্যস্ত। তেল-ডিজেল দেয় যে ছোকরা দুটো তাদের একজন আজ আসেনি। অন্যজন খবর দিয়েছে সে জ্বরে পড়েছে। ফলে অফিসের চেয়ার ছেড়ে মাঝে মাঝেই উঠে এসে জামার হাত গুটিয়ে পেট্রোল পাইপে হাত লাগাতে হচ্ছে। কারণ, অন্য লোকটা যখন ট্রাক লরি বা বাস-এ ডিজেল দিতে ব্যস্ত, তখন পেট্রল নেবার জন্য কোনো গাড়ি এসে দাঁড়ালে আমি নিজেই উঠে এসে পাইপ তুলে নিয়ে তাদের ট্যাঙ্কে তেল ভরে দিচ্ছি। জানি এতে সব বয়সের খদ্দেরই খুশি হয়। দশ লিটারের জায়গায় বিশ লিটার আর বিশ লিটারের জায়গায় হয়তো তিরিশ লিটার তেল নিয়ে নেয়। হাত গোটানো সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ের এই তৎপরতা সব বয়সের ভদ্রলোকেরই ভালো লাগে এ আমি হলপ করে বলতে পারি। আমি হাসি মুখে তেল

দিচ্ছি, বিল কাটছি টাকা নিচ্ছি।

এর মধ্যে আচমকা এই কাণ্ডটা হয়ে গেল। বিকেল তখন পৌনে ছ'টা। ...একটা চেনা অনুভূতি ... অনুভূতি কেন, তৃষ্ণাই বলতে পারি— আমার দু' পায়ের দিক থেকে হাঁটু বেয়ে, তলপেট কোমর বেয়ে বুকের দিকে মুখের দিকে উঠতে থাকে। আয়নায় না দেখলেও মনে হয় মুখ একটু একটু করে তপ্ততে লাল হচ্ছে। কোনো কোনো মাসের একটা বিশেষ সময়ে এ-রকম হয়। তিমির তৃষ্ণার এই অনুভূতিটা আমি পিষে ফেলতে চেষ্টা করি। কখনো পারি, কখনো পারি না। দোকান ছেড়ে ছুটে চলে যাওয়ার সুযোগ থাকলে পারি, নয়তো পারিই না। আর পারলেও তাতে বিষম ধকল।

ভিতরে কি হচ্ছে টের পাওয়া-মাত্র সেটা নাকচের চেষ্টা। শুরুতেই গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা। কাজে দ্বিগুণ ব্যস্ত হবার চেষ্টা। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতঘড়ির দিকে চোখ গেল। পৌনে ছ'টা মাত্র। বৃন্দার ফিরতে সাড়ে ছ'টা। মায়ের তাগিদে এক-একদিন অবশ্য ছটার মধ্যে এসে পড়ে। এক্ষুনি মনে মনে চাইছি আজ যেন ও সাতটার আগে না আসে। আমার যেন দোকান ছেড়ে যাবার উপায় না থাকে। কিন্তু একই সঙ্গে এই মনেরই আবার উল্টো তাগিদ। বৃন্দা এখুনি চলে আসুক। আসুক আসুক আসুক। ও এলেই আমি ছুটতে পারি।

একটা দুটো করে মিনিট যাচ্ছে। আমার ভিতরের অস্থিরতা বাড়ছেই বাড়ছেই। ...জেরি সাধারণত সাড়ে ছ'টা নাগাদ বিকেলের সফরে বেরিয়ে পড়ে। ফিরতে রাত বারোটা হতে পারে একটা হতে পারে দুটো হতে পারে। ডাইনিং রুমের টেবিলে তার খাবার ঢাকা থাকে। কোনো রাতে খায় কোনো রাতে খায় না। খাওয়া না খাওয়া তার নেশার মাপের ওপর নির্ভর করে। নেশা বেশি মাত্রায় চড়লে খায় না। আমার শোবার ঘরেও ঢোকে না। নিজের ওই কোণের ঘরেও তার একটা শয্যা পাতা। মাসের মধ্যে বেশির ভাগ দিন আর রাতই ও-ঘরের ওই শয্যাতেই তাকে আশ্রয় নিতে হয়। ঘড়ি ধরে ঠিক দশটায় আমি আমার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিই। তাছাড়া বেশি নেশা করে এলেও আমার শয্যায় তার জায়গা হয় না। আমি বরদাস্ত করি না। বেশি নেশা হরদমই করে। অথচ অত নেশার মধ্যেও মোটর সাইকেল চালিয়ে দিব্যি চলে আসে। ওটা কেনার পর থেকে এই কটা বছরের মধ্যে কখনো কোনো অ্যাকসিডেন্ট করেনি।

...ঘড়িতে ছ'টা বেজে সাত। আর আধঘণ্টা কেটে গেলে আমার স্নায়ুগুলো আবার শিথিল হতে থাকবে। তপ্ততে মুখে একসময় ঘাম দেখা দেবে। ...এই আধঘণ্টার মধ্যে বৃন্দা যেন না আসে। না আসে না আসে না আসে। তার ডবল তাগিদ বৃন্দা এক্ষুনি আসুক এক্ষুনি আসুক এক্ষুনি আসুক।

ঠিক ছ'টা দশে বৃন্দা এসে হাজির। দোকানের আঙিনায় তাকে দেখা-মাত্র সমস্ত চাওয়া না-চাওয়ার নিষ্পত্তি। ছুটতে হবে। আমাকে এক্ষুনি ছুটতে হবে। না ছুটে উপায় নেই। প্রতিটা মুহূর্ত এখন বিষম দামী। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওকে কাগজপত্র আর কাজ



বুঝিয়ে আমি ছুটলাম। ব্যাটারি কেনার কথা মনে থাকল না। দুদিকে পাহাড় আর জঙ্গল, রাস্তা এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার। বোতাম টিপতে আলো জ্বলল না। মোটরের গোঁ গোঁ শব্দ তুলে তা সত্ত্বেও তিন মাইল পথ ন' মিনিটে পাড়ি দিলাম। রাস্তায় অনেক সময় বড় পাথর পড়ে থাকে। কোনো একটাতে লাগলে এই তাড়া ভালো রকম ফুরাবে জানি। তখন লিলি রুবিন নামে সকলের পরিচিত সুঠাম স্বাস্থ্যের এক মিষ্টি মেয়ের ভাঙাচোরা থ্যাঁতলানো মূর্তি দেখবে—জানি। কিন্তু আমার ভিতরে তখন শুধু ছোটার তাড়া। সময়ে পৌঁছানোর তাড়া। আর কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

...গেট দুটো খোলা কেন? জেরি বেরিয়ে পড়েছে? সাইকেলের স্পিড কমিয়ে একবার ঘড়ি দেখলাম। ছ'টা পঁচিশ মিনিট হতে কয়েক সেকেণ্ড বাকি। বাংলোর বারান্দার হ্যাসাক এখনো জ্বালানো হয়নি তাই তেমন ঠাওর করা গেল না। গেট পেরোবার আগেই মোটর থামিয়ে দিয়েছি, প্যাডল-এ সাইকেল চালিয়ে ধীরে সুস্থে এগোচ্ছি। বারান্দার সোফায় বসে সিগারেট টানছে কেউ। ...জেরি ছাড়া আর কে হবে। আর একটু এগোতে সিঁড়ির এক পাশে ওর মোটর সাইকেলটা চোখে পড়ল। আমার গতি আরো মন্থর। স্নায়ুগুলো সব একসঙ্গে শিথিল এখন। নিজের ওপরেই এখন দারুণ রাগ। ওকে এতটুকু বুঝতে না দিয়ে খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা। একেবারে সিঁড়ি ছুঁয়ে সাইকেল থেকে নামলাম। ওটা ঠেস দিয়ে রেখে খুব ঢিমে তালে সিঁড়ি কটা টপকে বারান্দায় উঠেই ঝাঁঝালো গলায় হাঁক দিলাম, অ্যান্‌জেলা!

অ্যান্‌জেলা একেবারে জ্বলন্ত হ্যাসাক হাতে ঝুলিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। জেরির দিকে তাকাচ্ছিই না। এই মুহূর্তে আমার যত বিরক্তি যেন অ্যান্‌জেলার ওপরেই। —হ্যাসাকটা আরো আগে জ্বালতে খুব কষ্ট হয়?

ধমক খেয়ে অ্যান্‌জেলা ভেবাচাকা। তাড়াতাড়ি হ্যাসাক আঙটায় ঝুলিয়ে দিল। —ঘরের আলোগুলো পর্যন্ত এখনো জ্বালার সময় হয়নি?

ঝাঁঝ শেষ হবার আগেই আমি ঘরের মধ্যে। খট্ করে সুইচ টিপে আলো জ্বালালাম। তারপর দ্বিতীয় সুইচ টিপে আর একটা। এত লো ভোলটেজ এখানে যে একশ পাওয়ারের দুটো বাল্‌বেও ভালো আলো হয় না। আমার শোবার ঘরটাও অবশ্য মস্ত, এ-দিকটায় হাতে গোনা কয়েকটা বাড়িতে মাত্র ইলেকট্রিসিটি এসেছে। এসেছে মানে অনেক খরচ করে আনা হয়েছে। মা এ ব্যাপারে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু আলোর এই হাল। বারান্দায়ও দুটো পয়েন্ট আছে। অতবড় বারান্দায় ইলেকট্রিকের আলো জ্বাললে ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখায়। তাই জোরালো হ্যাসাক জ্বলে।

ঘরে ঢোকার আগেই যেটুকু লক্ষ্য করার করেছি। সন্ধ্যার বা রাতের সফরে বেরুনোর ফিটফাট পোশাক পরেই সোফায় বসে কফি খাচ্ছে আর সিগারেট টানছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে একবার দাঁড়ালাম। মুখ নিজের চোখে এখনো খুব স্বাভাবিক লাগছে না। তবু মোটামুটি আত্মস্থ। মিনিট খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এলাম। অ্যান্‌জেলা সরে গেছে। দায়ে না পড়লে পাঁচ সেকেণ্ডের জন্যও ও এই লোকের সামনে

পড়তে চায় না।

জেরি হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে তাকাল। বলল, ও বেচারার ওপর এত মেজাজ কেন ... অন্য দিনের তুলনায় তুমিই বরং আগে চলে এসেছ।

সামনা সামনি দাঁড়ালে মেজাজ সর্বদা ঠাণ্ডা অথচ কঠিন আমার। এখনো সে চেষ্টাই করছি। অপলক দু' চোখ ওর মুখের ওপর। বললাম, আমার আস্যা না আসা কি তোমার মর্জিমাফিক হবে ?

ও মুচকি হেসে বলল, না তা হবে না। তবে আমার আসাটা কখনো কখনো তোমার মর্জিমাফিক হয় ...।

ইংগীত একটুও অস্পষ্ট নয়। নিজের ওপর সত্যিকারের রাগই হচ্ছে। ঝাঁঝালো গলায় বললাম, কাল রাতে ফেরোনি, ডিনার ফেলা গেছে, আজ কি করবে ... অ্যানজেলাকে বারণ করে দেব ? তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, ওটা কি টানছ, সিগারেট না নেশার কিছু ?

জেরি এবারে দু' চোখ মুখের ওপর ফেলে আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করল। ঠোঁটে হাসি। ওর এই চাউনি দেখলে অস্বস্তি বোধ করি। দেখতে চাইলে আমার ভেতর সুদ্ধ দেখতে পায়। পায় বলেই ঠোঁটে ওই গোছের হাসি ঝিকমিক করে। জবাব দিল, সিগারেট, হিপিদের কড়া সিগারেট, দেখতে অন্যরকম গন্ধও অন্যরকম। সোফা ছেড়ে উঠে দুহাতের মধ্যে দাঁড়ালো, হ্যাসাকের জোরালো আলোয় কটা চোখ দুটো কৌতুকে চিকচিক করছে।— রাতে ফিরলেও সপ্তাহের মধ্যে কত দিনই আমার ডিনার ফেলা যায় ... আজ হঠাৎ এ-কথা ?

আমি ধরা পড়েছি বুঝতেই পারছি। তাই আরো জোর দিয়ে কড়া গলায় বললাম, প্রায়ই ফেলা যায় বলেই আজ বলছি, আমার পয়সা অত শস্তা হয়নি !

ওর ঠোঁটের হাসি সমস্ত মুখে ছড়াচ্ছে।— এই কথা বলার জন্যে দোকান ফেলে আজ তাড়াতাড়ি চলে এলে ! ... তাহলে কি হুকুম বলো—কখন ফিরতে হবে ?

এখানেই আমার হার আর ওর জিত। বাইশ বছর বয়সে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। তখন আমি লিলি রায়। বিয়ের আগেই স্বেচ্ছায় আমি ওর কাছে ধরা দিয়েছি। তারপর এই চার বছর ধরেই আমন্ত্রণটা বরাবর আমার দিক থেকেই এসেছে। এখন আমার বয়স ছাব্বিশ। এখানকার কত পুরুষ সুযোগ পেলে দুটো চোখ দিয়ে লিলি রুবিন নামে পরিপুষ্ট যৌবনের এই মেয়ের সর্বাঙ্গ চাটে বুঝতে বাকি থাকে না। আমার রাগ হয় না, বরং মজা পাই। পুরুষের চোখ দিয়ে মেয়েরা নিজের ওজন আর কদর যত নির্ভুল যাচাই করে নিতে পারে ততো আর কিছুতে নয়। রূপের বিচারে আমার থেকে ঢের সুন্দরী মেয়েকেও আমি কাছে থাকলে মিইয়ে যেতে দেখেছি। অথচ কোনো শত্রুও আমাকে বোধহয় ফ্লার্ট ভাবে না, সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের সহজ দিকটাই সকলের চোখে বড় আকর্ষণ। আর অন্যদিকে আর দশজন সাধারণ পুরুষের তুলনায় জেরি রুবিন ঢের বেশি লোলুপ লোভী লম্পট তা আমার থেকে বেশি আরো কত মেয়ে জানে বলতে পারব



না। সন্দেহ, অনেকেই জানে, এমন কি নিকষ কালো যৌবনের ডালি আদিবাসী মেয়েদেরও হয়তো কেউ কেউ জানে। এ-ব্যাপারে দুবারের অপ্রীতিকর ঘটনা আমারই কানে এসেছে। অথচ এই লোকের কাছেই কিনা শুরু থেকে—বলতে গেলে বিয়ের আগে থেকেই আমার হার। ... আমন্ত্রণ বরাবর আমার দিক থেকেই। রমণীর সমস্ত ছলা-কলা ওর যেন অধিগত। আমি সে রাস্তায় চলি না। কিন্তু আমার রাগ বিরাগের অভিনয়ও ধোপে টেকে না। মুখের দিকে এভাবে তাকালেই ভিতরের তাগিদ বুঝতে পারে।

... আজও ধরা পড়েছি। ইচ্ছে করছে ঠাস করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিই। বললাম, হুকুম করলে তুমি শুনবে ?

হাসছে। তুমি হলে আমার অন্নদাত্রী, তোমার হুকুম শুনব না !

বরাবর এমনিই বিনয়ী বটে ! এই হাসি মুখের বিনয়ে মা ভুলেছিল, আমি ভুলেছিলাম। আমার ঠাণ্ডা দুচোখ ওর মুখের ওপর।—কোথায় যাচ্ছ ? জুয়ার আড্ডায় না নেশার আড্ডায় ?

—কি যে বলো ...

—তাহলে আমার হুকুম শোনো, এখন তুমি কোথাও বেরুবে না !

—সর্বনাশ ! আজ আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ...। কিছু টাকা পাওয়ার আশা আছে। এগিয়ে এলো। হাত দুটো আমার দুই কাঁধে।— প্লিজ, লিলি, আগে জানলে আমি কক্ষনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতাম না —

আমার ডান কাঁধের হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলাম, আর রাগে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম প্রায়, আগে কি জানলে ?

ও মুচকি মুচকি হাসতে লাগল, যে হাসি দেখলে গা জ্বলে আবার চোখ জুড়োয়। এই লোকের সঙ্গে মরতে কেন ভনিতা করতে যাই।

—ওই ইয়ে আর কি ... তুমি থাকতে বলবে জানলে ইভিনিং শো-এর দুজনার টিকিটও কেটে রাখতাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ডিনারের আগে আমি ঠিক চলে আসব ... তাছাড়া এখন তো সবে সন্ধ্যা, ঠিক ন'টার মধ্যে ফিরব দেখো—

সবে সন্ধ্যা বলতে গিয়ে কটা চোখে হাসি উছলে পড়ছে। আমার চাউনি কঠিন। গলার স্বরও।— না ফিরলে ?

হাতের চার আঙুল এক করে নিজের গলা ঘষল। বলল, এটা কাটা যাবে, আমার কাঁধে কি দুটো মাথা ?

বলেই আমাকে কাছে টানতে গেল, ঝট করে চুমু খেয়ে নেবার মতবল। চোখ আর হাসি দেখলে আমিও কিছু বুঝতে পারি। জোরেই ধাক্কা মেরে সরালাম। হ্যাসাকের জোরালো আলোয় বাইরের অন্ধকারে চোখ চলে না, কিন্তু ওই গেটের কাছে দাঁড়ালেও যে-কেউ আমাদের দেখতে পাবে। ধাক্কা খেয়ে ও হাসতে হাসতে চলে গেল। আধ মিনিটের মধ্যে মোটর সাইকেলের আওয়াজ তুলে অন্ধকারে মিশে গেল। আমি

সোফাটায় বসে পড়লাম। নিজের ওপরেই একটা হাল-ছাড়া গোছের রাগ। এমনিতে মাসের মধ্যে তিরিশ দিনই ওর ওপর আমার রাগ আর বিরক্তি। সময় সময় এই রাগ আর ঘৃণা এমন পর্যায়ে উঠে যায় যে মনে হয় ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বরাবরকার মতো না ছিঁড়লেই নয়। কিন্তু এই মুহূর্তের রাগটা অন্য জাতের। মাসের মধ্যে কখনো দুদিন কখনো বা তিন চারদিনও নিজের ওপর কোনো দখল থাকে না, স্নায়ুর ওপর বশ থাকে না— ভিতরের এক অবাধ্য অবুঝ তাড়ায় দোকান ছেড়ে ছুটে আসি, ও বেরিয়ে পড়ার আগে সমঝে দিতে আসি সময়ে ফিরতে হবে। যতই হম্বি-তম্বি করি আর মেজাজ দেখাই, সমস্ত অস্তিত্ব ওর গ্রাসের মুখে ঠেলে দিতে না পারলে আমার যেন মৃত্যু। ভিতরে তখন ওর কেনা দাসীর দশা আমার। এ-মুহূর্তের এই রাগটা শুধু এই জন্যে।

... জানি আজ ডিনারের আগেই ফিরবে। ন'টার মধ্যেই ফিরবে। আজ নেশায় বিবশ হয়েও ফিরবে না। ভেতর চাঙা করার জন্য খুব বেশি হলে দুই এক পেগ হুইস্কি খাবে। এই গন্ধও আমি বরদাস্ত করতে পারি না জানে। এসেই জামা কাপড় বদলে বাথরুমে চলে যাবে। ভালো করে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ব্রাশ করবে, জিভ ঘষবে। বেশ করে সাবান মেখে চান করবে। মুখোমুখি খেতে বসে মাঝে মাঝে তাকাবে আর হাসবে অল্প অল্প। তখনো আমার রাগ হয়। জানোয়ার মনে হয় ওকে। খাবার মধ্যে শিকার পেলে জানোয়ারেরও বোধহয় এমনি পরিতুষ্ট আয়েসী ভাব দেখা যায়।

... কিন্তু জানোয়ার কি তার ভোগসঙ্গিনীর সমস্ত গোপন রহস্য জানে? সমস্ত স্নায়ু আর শিরাউপশিরায় তুমুল সাড়া জাগানোর কলাকৌশল জানে? কোনো রমনী নিজেই কি জানে তার ভোগের অন্তঃপুরে কত বৈচিত্র্যের উৎস লুকানো আছে? আমিও কি জানতাম?

জেরি রুবিন জানে।

ভোগলীলার ও এক নির্মম নিষ্ঠুর অথচ আশ্চর্য দক্ষ কারিগর।

ও আমাকে অনায়াসে ভোগের রসাতলে টেনে নিয়ে যায়। ভোগের স্বর্গে টেনে তোলে। ওকে আমার তখন মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে, আবার নিজের সমস্ত অস্তিত্ব উজাড় করে আগলে রাখতে ইচ্ছে করে। শুধু অ্যান্‌জেলা কেন, জেরির ভক্তদেরও বিশ্বাস ও অনেকরকম জাদুবিদ্যা জানে। কিন্তু এই এক ব্যাপারে ও সত্যিই মোহিনী জাদু কিছু জানে কিনা আমার নিজেরই অনেক সময় সন্দেহ হয়।

অনেক সময়েই নিজের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ হয়। প্রায় সকলেই আমাকে সপ্রতিভ বুদ্ধিমতী মিষ্টি ব্যক্তিত্বের মেয়ে ভাবে। কিন্তু আসলে কি আমি একটা স্থূল ভোগসর্বস্ব মেয়ে? তা না হলে এমন হয় কেন? ভাবতে গেলে শয্যায় ওই লোকের সমস্ত আচরণ প্রায় কুৎসিত, প্রায় অপমানকর, স্থূল তো বটেই। হাসির মধ্যে অধিকার বিস্তারের দম্ভ, মুখে নিচু পর্দায় অশ্লীল কথা, আপত্তি সত্ত্বেও হাতের দশ আঙুলের রকমারি কদাচার— তখন কত সময়ে ইচ্ছে করে দু' হাত আর দুই পায়ের আচমকা আঘাতে খাট থেকে ওকে মাটিতে ফেলে দিই। ... কিন্তু জানি, এ শুধু এক দুরন্ত দস্যুর প্রস্তুতির উল্লাস।



... এখানে চুল-দাড়ি বোঝাই একটা কুৎসিতদর্শন পাগল ছিল। কিছুদিন হল মারা গেছে। সকলে চিনত ওকে, কারণ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কখনো বা কোনো গাছতলায় বসে বেহালা বাজাতো। অনেকে পয়সা দিত। আর পকেটে থাকলে জেরি তো পাঁচ-দশ টাকা দিয়েই দিত। আর আমি ওকে দেখলে বাংলোয় ডেকে শুধু খাবার দিতাম। কারণ হাতে পয়সা পেলেই ও শস্তার মদ গিলত। বেশির ভাগ সময়ই মদে চুর হয়ে থাকত। তখন বাজাতে বললে এমন এলোপাথারি বাজনা শুরু করে দিত যে কান ঝালাপালা খানিকক্ষণ। কিন্তু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে এক সময় শোনার মতোই বাজনা শুরু হয়ে যেত। তখন সুরের মীড়ে মূর্ছনায় বুকের তলায় মোচড়ের পর মোচড় পড়তে থাকত। রাতের অতনু শয্যায় আমারও সেই গোছের প্রতীক্ষা। নগ্ন দুরন্ত পাগলামির পর ভোগের মীড়ে আর বিস্মৃতির মূর্ছনায় ভেসে যাওয়ার মুহূর্ত আসবেই।

... আজ এখনকার মতো ও চলে গেল ভালোই হল। আগে জানলে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রেখে সিনেমার টিকিট কেটে রাখত বলল বটে। কিন্তু সিনেমা হলে আড়াই তিন ঘণ্টা মুখ বুজে বসে থাকার ওর ধৈর্য নেই। এ-রকম এক-একটা দিনে আমাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে বেরুবে বলেও ও-মুখো হয়নি। বলেছে, সিনেমা দেখে কি হবে, তার থেকে বেড়াই চলো। মোটর সাইকেলের পিছনে বসে ওর সঙ্গে বেড়ানোটাও ধকলের ব্যাপার। আমি মেয়েটা ভীতু নই। কিন্তু আমাকে পিছনে পেলে ওকে ছোটার নেশায় ধরে। এমনিতেই এত জোরে চালায় যে দূরের লোকও সভয়ে সরে যায়। আমি থাকলে কথাই নেই। ওর কোমর আঁকড়ে কাঠ হয়েই বসে থাকতে হয়। ভয় সত্ত্বেও বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করি। তাই নিষেধ করি না। কবে না মায়ের কথাই সত্যি হয়। বলেছিল এই মোটর সাইকেল থেকে ফেলেই কবে না আমাকে খুন করে। কিন্তু ওকে ধরে থাকতে হয়, হলে দুজনেই খুন হব।

ওর জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথায় অ্যান্‌জেলার দুপুরের খবরটা মনে পড়ল। ইউ এস এ-র ডাক দেখে ও ঘাবড়েছিল। আমার ভিতরেও পুরনো অস্বস্তিটা উকিঝুঁকি দিল। কোণের ঘরে তালা ঝুলছে। বেরুতে হলে সব সময়েই তালা লাগিয়ে বেরোয়। জেরি কোনরকম গোপনতার পরোয়া করে না। গোছগাছ করতে গিয়ে পাছে কেউ কিছু ওলট-পালট করে তাই তালা লাগায়। আর ওর অনুপস্থিতিতে বাইরের কোনো লোক ওকে না পেয়ে ও-ঘরে ঢুকে পড়তে পারে ভাবে বোধহয়। দিনে কতক্ষণ আর আমি বাড়ি থাকি। ঘর খোলা থাকলে ওর খোঁজে এসে যে-কেউ ওই ঘরে ঢুকে পড়তে পারে।

—অ্যান্‌জেলা!

ডাক শুনে ছুটে এলো।

—ও-ঘরের ডুপলিকেট চাবিটা কোথায়?

আমার আঙুলের হদিস ধরে অ্যান্‌জেলা বন্ধ দরজায় তালা দেওয়া ঘরটার দিকে তাকালো। অবাক হবারই কথা, ও ঘরের দ্বিতীয় চাবির খোঁজ আগে কখনো করিনি।

—তোমার ড্রেসিং টেবিলের দেরাজেই আছে হয়তো ... দেখবো ?
—দ্যাখো। দেখে নিয়ে এসো।
মিনিট তিনেকের মধ্যে অ্যান্‌জেলা চাবি নিয়ে হাজির।
—ওই তালা খোলো।

মুহূর্তের মধ্যে থলথলে কালো মুখ এমন হয়ে গেল যেন নিজের হাতে ফাঁসির পরোয়ানা সই করতে বলা হয়েছে। দু'পা এগিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। ফিরল। ভয়ার্ত দুচোখ আমার মুখের ওপর। বিরক্ত হব কি, হাসিই পেয়ে গেল। সোফা ছেড়ে উঠে ওর হাত থেকে চাবিটা নিলাম। পারলে অ্যান্‌জেলা আমাকেও দু' হাতে আগলে রাখে।

এ-ঘরে আমি আগে কখনো ঢুকিনি এমন নয়। জেরি থাকতে ধাক্কা মেরে বন্ধ দরজা খুলিয়েই ঢুকেছি। গোড়ায় গোড়ায় কৌতূহল ছিল। এখন তার ছিটে ফোঁটাও নেই। তাছাড়া সাংসারিক ব্যাপারে জেরির সঙ্গে কোনো সংশ্রব নেই। ফলে অনেকদিনের মধ্যে এ-ঘরে ঢুকিনি এটা ঠিক।

দরজা খুলে ভেতরে এলাম। আলো জ্বালালাম। কোণে একটা বিছানা পাতা। বালিশের ঢাকনা বা চাদর কতকালের মধ্যে কাচা হয়নি ঠিক নেই। টেরিলের সামনের দেয়াল-তাকে অনেকগুলো চটি চটি বই। সব পড়তে না পারলেও ওগুলো কি বই জানা আছে। নতুন আরো কিছু যোগ হয়েছে বোধহয়। ইংরেজি ছাড়া বাংলা হিন্দী আর সাঁওতাল ভাষার বইও আছে। জেরি এই তিন ভাষাও ভাল পড়তে পারে। এ-সবই প্রেততত্ত্ব জাদুবিদ্যা, সম্মোহন বিমোহন ডাকিনী যোগিনী বিদ্যা তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে। দিশি বিদিশি ভাষায় নেশা সম্পর্কেও কিছু বই আর কাগজপত্র একদিকে ঠিকি করা আছে। বড় টেবিলের একদিকে একটা বাঁধানো খাতা আছে। ওতেও রকমারি নেশার উপকরণ আর নেশার জিনিস তৈরি করার ফরমূলা জেরির নিজের হাতে লেখা। ঘরের এ-কোণে ও-কোণে গাছগাছড়ার নানা রকম শেকড়-বাকড়, ওগুলো পেশার সরঞ্জাম, গুঁড়ো বা পাউডার বানানোর একটা হামানদিস্তা, কয়েকটা পোরসিলেনের বাটি, জানলার তাকে গোটাকতক শিশি বোতল, তাতে কয়েক রকমের আর রঙের তরল পদার্থ। এ-সবই আমার দেখা। জানা। কেবল জিনিসপত্র আগের থেকে বেশি মনে হল। নেশার জিনিসের কদর বেড়েছে বোধহয়।

অ্যামেরিকার ডাকের লম্বাটে খামটা টেবিলের এক পাশে পড়ে আছে। ওটা দেখতেই আসা। ভিতরের টাইপ করা কাগজটা পড়ার পর সত্যি কিছুটা হতভম্ব আমি। টাইপ করা নয়, সাইক্লোস্টাইল করা বোধহয়। সেই কাগজে একটা অদ্ভুত কনফারেন্সের সমাচার শুধু। মাথায় বড় হরপে (ইংরেজি) লেখা, 'উইজারড অ্যাণ্ড উইচ কংগ্রেস—১৯৮১। তার নিচে সমাবেশের বিচিত্র বিবরণ। ... সম্প্রতি নিউ মেক্সিকোর এক পাহাড়ের ওপর বহু দেশের দু'শ জাদু প্রেত আর বিভিন্ন মোহিনীবিদ্যা বিশারদদের এক গোপন অধিবেশন হয়ে গেল। ডাকিনী যোগিনী বিদ্যায় পারদর্শিনী কিছু মহিলাও এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল। তাদের সকলেরই অভিযোগ, সভ্য দুনিয়ার মানুষদের



কাছ থেকে নিজেদের ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠানে অবিরাম বাধা পাচ্ছে। সভ্য মানুষেরা সব আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এ বসছে, বিশ্ব-শান্তি বিশ্ব-মৈত্রীর কথা বলছে। কিন্তু এই সভ্য মানুষদেরই আর এক দল মারণাস্ত্র তৈরি আর ধ্বংসযজ্ঞের মোহড়া দিয়ে চলেছে। এই অতি সভ্য মানুষদের দুই দলই তাদের ক্রিয়াকলাপকে হেয় চোখে দেখে, ব্ল্যাক-আর্ট আর ভুডু আখ্যা দেয়। কিন্তু মানুষের অমঙ্গল দূর করার জন্যই তারা ব্ল্যাক-আর্ট আর ভুডুর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। মানুষের হিংসা হানাহানি তাদের নিজস্ব ক্রিয়া-কর্মের দ্বারা তারাই বন্ধ করতে পারে , মানুষকে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। কারণ, অলৌকিক জগতের সঙ্গে, অশরীরী আত্মার জগতের সঙ্গে শুধু তাদেরই প্রত্যক্ষ যোগ। এই অপার্থিব ক্ষমতার জোরেই এই যুধ্যমান বিশ্বকে তারা শান্তির পথে চালিত করার অধিকারী। তাই একই সঙ্গে তাদের দাবী আর আবেদন, নির্বিঘ্নে এবং বিনা বাধায় তারা যেন তাদের অনুষ্ঠান এবং দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে। সবশেষে সখেদ মন্তব্য, এই অলৌকিক বিদ্যায় ভারত অগ্রগণ্য দেশ— কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, এত বড় এক অধিবেশনে ভারতের কোনো গুণীই যোগদান করেনি।

আমি হতভম্ব খানিকক্ষণ। এই বিদ্যার মানুষদের এত বড় অস্তিত্ব কখনো কল্পনা করিনি। গুণী হিসেবে এরা জেরির হদিসই বা পেল কি করে ! তারপর মনে হল, জেরির হিপি ভক্তরা তাকে মস্ত গুণী ঠাউরেছে আর গুণীর হদিস তারাই দিয়েছে। এ-সবে আমার কোনদিন এতটুকু বিশ্বাস নেই। তাই আরো অবাক লাগছে।

## ॥ ২ ॥

জামশেদপুর উইমেনস কলেজে পড়তে একবার মেয়েদের একটা বিলিতি জার্নাল আমার হাতে এসেছিল। ঠিক মনে নেই, ইভস জার্নাল না কি একটা নাম। সহপাঠিনীরা আমাকে নিরীহ হাবাগোবা গোছের মেয়ে ভাবত। অনেকে ঠাট্টা করত, এত সুন্দর চেহারা তোর, যেখান দিয়ে যাস ছেলেগুলোর মুণ্ডু ঘোরে, হাড় মাংস চিবিয়ে খেতে চায়, অথচ ভিতরে একেবারে ভাব তুই। বি, এ পড়তে আমার হস্টেলের রুম-মেটই আমাকে বোকা আর নিরীহ ভেবে কি কাণ্ড শুরু করেছিল। ছেলেদের মতো সর্বদাই ট্রাউজারস্ আর শার্ট পরত। আমারও দুই একটা ওই রকম ব্যাটাছেলের পোশাক ছিল। পাহাড়ের দিকে বা কোনো এক্সকারশনে বেরুলে পরতাম। বেশির ভাগই স্কার্ট ব্লাউস পরতাম, নয়তো শাড়ি। রুম মেটের নাম ছিল রিণা বাগ। ওর হামলায় বিদ্ধস্ত হয়ে আমি বলতাম তুই রিনা বাঘ। ও এটা প্রশংসা ভাবত। আমাকে বলত ওকে পুরুষ বন্ধু ভাবতে, আর আমি হলাম গিয়ে ওর মেয়ে বন্ধু, যখন তখন বিছানায় এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, চুমু খেত, বুকের মাংস খুবলে নিতে চাইত। রাগে বিরক্তিতে ওকে ধাক্কা মেরে সরাতাম। একদিন ঘুমিয়ে আছি ভেবে ও আমাকে এসে জাপটে ধরতে ধাক্কা মেরে বিছানা থেকেই ফেলে দিয়েছিলাম। এমন চোট পেয়েছিল যে তাইতেই পুরুষ সাজার

সখ মিটে গেছল। অন্তত আমার মতো গবেট মেয়ের পুরুষ বন্ধু আর হতে চায়নি। বলেছিল, তুই একটা মাকাল ফল, বিচ্ছিরি কোলড্ মেয়ে—বিয়ে করলে হাসব্যাণ্ডের হাতে মারধর খেয়ে মরবি।

সেই বোকা নিরীহ গবেট বা কোলড্ মেয়ের ভিতরে কত রকমের কৌতূহল তা যদি ওরা জানত। স্টলে কোনো লোভনীয় উত্তেজনার বই বা জার্নাল দেখলে চুপি চুপি কিনে ফেলতাম। ফাঁকমতো লুকিয়ে পড়তাম।...সেই ইভস জার্নাল না কি নাম ম্যাগাজিনটার—সেটাও মলাটের লোভনীয় রঙিন ছবি দেখেই কিনে ফেলেছিলাম। পর্নো নয়, মেয়েদের সম্পর্কেই নানা রকমের আর বিষয়ের রচনা। তাতে মেয়েদের যৌনানুভূতি আর কাম-চেতনা সম্পর্কে একটা লেখা ছিল। লেখিকা তাতে বিলেতের 'ব্যুরো অফ সোশ্যাল হাইজিন'-এর ১৯৩৮ সালের এক গবেষণার কথা লিখেছে। মেয়েদের নিয়ে এই গবেষণার ব্যাপারে দশ হাজার কলেজ ছেঁকে বারো শ স্কুল গ্র্যাজুয়েট মেয়েকে ডাকা হয়েছিল। এদের মধ্যে তিনশ তিনটি মেয়েকে আবার বাছাই করে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাদের যৌন-চেতনা আর যৌনানুভূতির উৎস কি বা সব থেকে যৌন উত্তেজক বা সেক্স-স্টিমুলেটিং কি ?

...সেই তিনশ তিনটির মধ্যে পঁচানব্বইটি মেয়ে জবাব দিয়েছিল, বই, ফিল্ম ইত্যাদি। বাকি দু'শ আটটি মেয়ে উত্তর দিয়েছিল, পুরুষ মানুষ।

আমার জীবনে এই চেতনার উৎস যে পুরুষ তাতে কিছুমাত্র সংশয় নেই। জীবন বলতে একেবারে বাল্যজীবনের কথা বলছি। বাধ্য হয়েই দশ বছর বয়েস থেকে পুরুষ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়েছে। পুরুষের কত রকমের আঁচড় আমার সেই ছোট্ট শরীরে বিঁধেছে ঠিক নেই। কেন এমন হয়, ওরা কি চায়, অনেক ভেবেছি। বয়েস আর একটু পাকতে বুঝেছি। সমবয়সী বয়সী বা আমার থেকে বড় আর পাঁচটা মেয়ের থেকে আমাকে তফাৎ করে দেখার কারণের সঙ্গে আমার জন্মসূত্রের যোগ। যারা জানে আর যারা জানে না তাদের বেশির ভাগই আমাকে না বাঙালীভাবে, না ইংরেজ ভাবে। আমি আমার মা মার্থার গায়ের রং পেয়েছি, চুলের রঙও কিছুটা পেয়েছি। বাচ্চা বয়সে শুনেছি একেবারে দুধবরণ রং ছিল আমার। চুলের রঙ ঠিক বাদামী না হলেও কিছুটা লালচে আভা। কেবল চোখ দুটোর তফাৎ। আমার চোখ গভীর কালো। কলকাতার দাদুর বাড়িতে অনেক দিনের পুরনো এক মাঝবয়সী ঝি ছিল। সকলে তাকে চাঁপার মা বলে ডাকত। চাঁপাকে আমরা কখনো দেখিনি। দেখব কি করে, শুনেছি তিন বছর বয়সে চাঁপা মরে গেছে। চাঁপার মা দেখতে মোটামুটি, কিন্তু মেয়েটা নাকি ভারি সুন্দর আর ফুটফুটে হয়েছিল। একটু বড় হতে আমার থেকে সাত বছরের বড় উমাদি একটা রহস্য ফাঁস করেছিল। সে নাকি চাঁপার মায়ের বরকে দেখেছে। লোকটা বেশ কালো। ফলে এই ফর্সা মেয়ে চাঁপাকে নিয়ে সন্দেহ। ওর ধারণা, যে-বাবুর বাড়িতে চাঁপার মা তখন কাজ করত চাঁপা নাকি তাদের কারো মেয়ে। বউটাকে সন্দেহ করত, মারধর করত। চাঁপা মরে যেতে কোন্ দৈবজ্ঞও নাকি তার বাপকে বলেছিল বউয়ের স্বভাব চরিত্র ভালো



নয় বলেই ভগবানের এই মার। বউকে এরপর আর সেই লোকটা ঘরে নেয়নি, আবার বিয়ে থা করে সংসার পেতেছে। সেই থেকে ওই মেয়েমানুষ দাদুর বাড়ির আশ্রিত।

যে-কারণেই হোক, কলকাতার দাদুর বাড়িতে আমাকে সব থেকে ভালবাসতো ওই চাঁপার মা। ভালোবাসার আরো কারণ অবশ্য অনেক পরে জানা গেছে। মায়ের সঙ্গে একমাত্র চাঁপার মায়েরই গোপন যোগাযোগ ছিল। মায়ের কাছ থেকে ও নিয়মিত কিছু কিছু টাকা পেত। যাক, আমার সেই ছেলে-বেলার যা-কিছু জ্ঞানগম্যি সব ওই চাঁপার মা আর জ্যাঠতুতো বোন উমাদির কল্যাণে। চাঁপার মা বলত, বাবার মুখখানা নাকি আমার মুখে বসানো, আর চোখ দুটো হুবহু এক।

আমাকে সম্পূর্ণ জানতে হলে জন্মসূত্রে যে টানাপোড়েনের মধ্যে আমি বড় হয়েছি আগে সেটুকু স্পষ্ট করে তোলা দরকার। বাবার সম্পর্কে মায়ের মুখে যেটুকু শুনেছি তা অনেক পরে। তার আগে বাবাকে যতটুকু জেনেছি তা চাঁপার মা আর উমাদির কথা থেকে। আর কিছুটা ধারণা হয়েছে ঠাকুমা জেঠি-খুড়ি বা পিসীর আচরণ দেখে বা তাদের আক্ষেপ শুনে।

...আমার বাবা শুভ রায় মোটামুটি সচ্ছল বাঙালী ঘরের ছেলে। দাদু ছিল এক বে-সরকারি কলেজের রাশভারী নাম-করা প্রিন্সিপাল। তার লেখা ইংরেজি গ্রামার বই পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত স্কুলেই পাঠ্য ছিল। এ-ছাড়া উঁচু ক্লাশের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা বেশ চালু একটা ইংরেজি এসে-বইও ছিল। মাইনে ছাড়াও এ দুটো বই থেকে দাদুর ভালো রোজগার হত। তার তিন ছেলে এক মেয়ে। জ্যাঠা সরকারি কলেজের প্রোফেসার, কাকার লেখা-পড়া খুব একটা এগোয়নি। দাদু তাকে একটা স্কুলপাঠ্য বইয়ের দোকান করে দিয়েছিল। পড়াশুনায় খুব ভালো ছিল আমার বাবা। শিবপুর থেকে মেকানিক্যাল এনজিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে আসার এক বছরের মধ্যে জামসেদপুরে বড় চাকরি পেয়ে গেছল। চাকরি জীবনে শুধু বাবাই মাত্র কয়েকটা বছরের জন্য দাদুর কাছ ছাড়া হয়েছিল। আর ঠাকুমার ধারণা, সেই কারণেই বাবার কাঁধে মায়ের মতো অমন জ্যান্ত অলক্ষ্মী ভর করতে পেরেছে।

...ঠাকুমা ছিল খুব গোঁড়া ঘরের মেয়ে। দিনের মধ্যে কম করে ছ'সাত ঘণ্টা ঠাকুমার পুজোর ঘরে কাটত আমিও দেখেছি। বারো মাসের তেরো পার্বণ লেগেই ছিল। দাড়ি-অলা কুলপুরোহিত ছিল, সে এসে নিয়মিত ঠাকুরপুজো করে যেত। ঠাকুমার থেকে বয়সে ছোট, সে রোজ তাঁকে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করত। প্রত্যেক মাসের এক শনিবারে বাড়িতে শনিপুজো হত। পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে বানানোর হিড়িক পড়ে যেত। আমার কিন্তু শনিপুজোর সিন্নি আর নারকেল বা ক্ষীরের পাটিসাপটা খেতে ভারী ভালো লাগত। এদিকে বছরে দুই-একবার বাড়িতে ঠাকুমার গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়লে দস্তুরমতো সাড়াই পড়ে যেত। শুনেছি ঠাকুমার জোরজুলুমে দাদুকেও ওই গুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হয়েছিল। কিন্তু দাদুর খুব একটা ভক্তিশ্রদ্ধার বাড়াবাড়ি ছিল মনে হয়নি। বড়জোর একটা প্রণাম সেরে আর কুশল খবর নিয়ে নিজের পড়ার ঘরে

সরে পড়ত। কিন্তু ঠাকুমার কাণ্ড দেখে আমার দু'চোখ কপালে উঠত। নিজে যত্ন করে গুরুদেবের পা ধুইয়ে দিত, মাথার চুল দিয়ে সেই পা মুছিয়ে দিত, জলখাবার বা দুপুরের খাবার সময় মাথার ওপরে বনবন করে পাখা ঘুরলেও ঠাকুমা হাত-পাখা নিয়ে বসত। আদর আপ্যায়নের সেকি ঘটা। কিন্তু ওই গুরুদেবটিকে কেন আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না তার কারণ পরে বলছি।

জ্যাঠা আমার বাবার থেকে ছ'বছরের বড়। কাকু বাবার থেকে তিন বছরের ছোট, আর সকলের ছোট পিসী বাবার থেকে প্রায় সাত বছরের ছোট। শুনেছি জ্যাঠা আর কাকু দাদু ঠাকুমার খুব বাধ্য ছেলে ছিল। চব্বিশের আগেই ঠাকুমা ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে আমার সুলক্ষণা জেঠিকে ঘরে এনেছিল। উমাদি তার একমাত্র মেয়ে।

...আমার বাবাকে বাড়ির মধ্যে হীরের টুকরো ছেলে ভাবত সকলে। কিন্তু ছাব্বিশ গড়িয়ে সাতাশ হল বয়েস, এত ভালো চাকরি করে তবু বিয়ের নামে কান পাতে না দেখে দাদুকে নাকি সকলে উঠতে বসতে উত্যক্ত করত। জানা গেল বাবার কাঁধে জ্যান্ত অলক্ষ্মী ভর করেছে, তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। দাদুর বিয়ের তাগিদের চিঠির জবাবে বাবা লিখে জানিয়েছে, সে এখানকার একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে ভালবেসেছে, তাকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। বাবা-মা যেন তাদের অযোগ্য ছেলেকে ক্ষমা করে।

চিঠি পেয়ে এ-বাড়ির সকলের মাথায় বজ্রাঘাত। দাদু গুম। ঠামার কান্নাকাটি, ঠাকুর ঘরে মাথা কোটাকুটি। তার মুখ চেয়েই বাবার কাছে দাদুর টেলিগ্রাম গেল, ওমুক দিন ওমুক গাড়িতে ঠাকুমাকে নিয়ে জামসেদপুরে যাচ্ছে।...শুধু তারা দু'জনে নয়, ভাইকে বোঝানোর জন্য জ্যাঠাও সঙ্গে গেছল। বাবা সেদিন ছুটি নিয়ে স্টেশনে গেছল। সকলকে নিজের কোয়ারটার্স-এ এনে তুলেছে। গম্ভীর থমথমে মুখ সকলের। বাংলোয় পা দিয়েই ঠাকুমা নিজের নামে দিব্যি কেটে মাথা থেকে এ-বিয়ের চিন্তা তাড়াতে হুকুম করেছে। দাদু শুধু চুপ। জ্যাঠাও ভাইকে অনেক বুঝিয়েছে।

...বাবা তখন বলতে বাধ্য হয়েছে চিঠিতে সব কথা লেখা হয়নি। দেড় মাস আগেই সেই মেয়ের সঙ্গে তার রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে। আজ তারা এখানে আসছে জেনেই স্ত্রীকে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে।

অন্ধ রাগে ঠাকুমা মাথা কুটেছে, অভিসম্পাত পর্যন্ত দিয়েছে।চোখ লাল করে জ্যাঠা বলেছে তাদের সঙ্গে ভাইয়ের আর কোনো সম্পর্ক থাকল না। এ-কথা বলার অধিকারী যে—সেই দাদু শুধু চুপ। বাবার বাড়িতে কেউ জলস্পর্শ না করে তিনজনেই চলে এসেছে।

এর ছ'মাসের মধ্যে পিসীর বিয়ে। ঠাকুমার গুরুদেব কুলমেল কুষ্ঠি মিলিয়ে বিয়েতে মত দিয়েছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দাদু ঘটা করেই দিয়েছে। বিয়ের কিছুদিন আগে দাদু নিজের হাতে বাবাকে চিঠি লিখেছে। ওমুক দিন তোমার বোনের বিয়ে, যদি সম্ভব হয় তুমি এসো। তোমরা এসো লেখেনি, শুধু লিখেছে তুমি এসো। পরে শুনেছি, ঠাকুমা আর জ্যাঠার এতেও বিশেষ আপত্তি ছিল। দাদু কিন্তু কখনো কারো মতামতের ধার



ধারে না।...বাবা একলাই এসেছিল। দাদু শুধু জিগ্যেস করেছিল, কেমন আছে। আর বাবা সেধে কাকু আর ছোট বোনের সঙ্গে কথা বলেছে। আর কেউ তার সঙ্গে কথাও বলেনি। বিয়ের রাতেও বাবা এ বাড়িতে থাকেনি। বিয়ের পর এক বন্ধুর বাড়ি চলে গেছল। মায়ের মুখে শুনেছি, বাবার কাছে এরপর ঠাকুমার একটা চিঠি এসেছিল। তাতে লিখেছিল, তার বা তার দাদার বাবাকে ক্ষমা করতে আপত্তি নেই যদি সে বে-জাতের সঙ্গে এই কাগজের বিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, অর্থাৎ মা-কে যদি ডিভোর্স করে। বাবা সে-চিঠির জবাবও দেয়নি।

...একদিক থেকে বিবেচনা করলে আমার মা মার্থা উড ইংরেজের মেয়েই। মায়ের ঠাকুরদা-ঠাকুমা খাঁটি ইংরেজদের মেয়ে ছিল। ফলে মায়ের বাবাও তাই। কিন্তু মায়ের বাবা বিয়ে করেছিল এক পাশী মেয়েকে। যার ফলে মা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। কিন্তু মায়ের চেহারা-পত্র খাঁটি মেমসাহেবের মতোই। মা বাবার দণ্ডরেরই স্টেনোগ্রাফার ছিল।...একটু জ্ঞান বুদ্ধি হবার পর মায়ের সম্পর্কে জেঠি-খুড়ির অনেক রকমের টিসারা আমার কানে আসত। তার মধ্যে একটা অপ্রিয় উক্তি প্রায়ই শুনতে হত।...বিয়ের আগে মা কতজনের মন ভিজিয়ে চলেছে ঠিক নেই, শেষে বাবার কাঁধে চেপেছে—তাদের মেয়ের অর্থাৎ আমার স্বভাবচরিত্র কি দাঁড়াবে এ নিয়ে তাদের বিশেষ দুশ্চিন্তা। কারণ গোড়া থেকেই তারা আমার চাল-চলন লক্ষণ ভালো দেখেনি।...চার থেকে চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত মা আমার জীবনে অনুপস্থিত ছিল। এই দশটা বছর আমার কলকাতার দাদুর বড়িতে কেটেছে। কিন্তু মা-কে আমি কলকাতায় প্রথম দেখি আরও দু'বছর আগে। অর্থাৎ বারো বছর বয়সে। তখনই জেঠি-খুড়ির টিসারা মনে পড়েছে। তখনো মায়ের যা চেহারা, অনেক পুরুষেরই আসক্ত হওয়া সম্ভব মনে হয়েছে।

...রায় পরিবারে প্রথম অঘটনের কারণ আমার বাবা মা। আর সকলের, বিশেষ করে ঠাকুমা-জেঠিমা-কাকিমার মতে সেই অঘটনের দরুনই দ্বিতীয় বজ্রাঘাত। পুণ্যবান পুণ্যবতীর সংসারে বিধর্মীর ছায়া পড়লে কত রকমের অমঙ্গলই তো হতে পারে। বিয়ের এক বছরের মধ্যে পিসী সিঁথির সিঁদুর মুছে বাপের বাড়ি ফিরে এলো। তার স্বামী ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে। বিয়ের এক বছরের মধ্যে পিসীর বনেদী শ্বশুরবাড়ির লোকের বিবেচনায় পিসী মহা অলুক্ষুণে মেয়ে। বিধবা হবার দু'মাসের মধ্যে তার ওপর শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা শুরু হয়েছিল। এদিকে মায়ের মুখে শুনেছি, দাদুর চিঠিতে এই মর্মান্তিক খবর পেয়ে বাবা নাকি কেঁদেছিল। আমার তখন মাস দুই আড়াই মাত্র বয়েস। ঠাকুমার সমস্ত কোপ গিয়ে পড়েছিল আমাদের এই জামসেদপুরের সংসারের ওপর। বাবা-মায়ের অনাচারের ফলেই নাকি তার ঠাকুরের এত বড় অভিশাপ। আশ্চর্য, পিসীতো বোধহয় তার মায়ের মুখে এ-কথা শুনে শুনে এটা বিশ্বাস করেছিল। নইলে পরের ভবিষ্যতে আমার ওপর তার আচরণ এত কঠোর আর নিষ্ঠুর হবে কি করে!

বলতে গেলে দু'বছর বয়েস থেকে আমি এমন কি আমার মা-ও ভাগ্য বিড়ম্বনায় এ-বাড়ির আশ্রিত। আর ঠাকুমার বদ্ধ বিশ্বাস এ-ও তার ঠাকুরের কোপে। আমার

মা-বাবার অনাচারের ফল। আর ঠাকুমা যা বলে জেঠি খুড়ি আর পিসীর তাতে অবধারিত সায়। আমার দু'বছর বয়সে বাবাকে যে রোগে ধরল তা মৃত্যুর অমোঘ পরোয়ানাই বলা যেতে পারে। ব্লাড ক্যানসার। মায়ের মুখে শুনেছি, কাজের গুণে চাকরির গোড়া থেকেই ওপরঅলাদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল। বড় চাকরি আর মুরুব্বির জোরে বাবার চিকিৎসার অভাব হয়নি। কোম্পানির খরচে বাবাকে কলকাতায় হাসপাতালে এনে ভরতি করা হল। মা এলো, আমিও। আমাকে নিয়ে মা প্রথমে একটা শস্তার হোটেলে উঠেছিল। দাদু খবর পেয়ে বাবাকে দেখতে এলো। জ্যাঠা কাকা ঠাকুমাও এলো। হাজার হোক ছেলে। কিন্তু অসুখের মধ্যে বাবার আমাদের দু'জনার জন্য উদ্‌বেগ। প্রথমবার রক্ত বদলানোর মাসখানেক পরে বাবাকে হাসপাতালে থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে চেকিং আর প্রয়োজনে রক্ত বদলানোর সুবিধের জন্য বাবাকে কলকাতাতেই থাকতে হবে। কোম্পানি থেকে লম্বা ছুটি স্যাংশন হয়েছে, চিকিৎসার খরচও তারাই জোগাচ্ছে, কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। ফুল পে'র ছুটি ফুরোলে হাফ-পে'র ছুটি শুরু হবে, তার পর উইদাউট পে'র। তার ওপর আমাকে নিয়ে মায়ের হোটেল খরচ। চিকিৎসা ছাড়াও বাবার জন্য আনুষঙ্গিক খরচ আছে। তাই শুরু থেকেই হিসেবের রাস্তায় চলা দরকার এটা সকলেই বোঝে। মা তখন নিরুপায়। হাসপাতাল থেকে বাবা জামসেদপুরে চলে যেতে চেয়েছিল, সপ্তাহে সপ্তাহে বা দরকার মতো কলকাতায় আসবে। কিন্তু ডাক্তারদের তাতে আপত্তি।

এই সময়ে দাদুর আসল ব্যক্তিত্ব আর মেজাজ বোঝা গেছে। এ-কথাও আমি মায়ের মুখে শুনেছি, কিন্তু খুঁটিনাটি সব শুনেছি বড় হয়ে চাঁপার মায়ের মুখে। মা ঠাকুমা জ্যাঠার সামনেই দাদু বাবাকে বলেছে, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি থাকতে তোর এত ভাবনা-চিন্তার দরকার কি—তোর বউ আর মেয়ের জায়গাও ও-বাড়িতেই হবে।

কিন্তু এই নিয়ে বাড়িতে তুমুল হয়ে গেছে শুনেছি। অসুস্থ ছেলেকে ঘরে আনতে ঠাকুমার একটুও আপত্তি নেই—মায়ের আর আমার আসাটা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। জ্যাঠা জেঠি কাকা কাকিমা আর পিসী ঠাকুমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। বাবাকে আনা দরকার আনা হবে—কিন্তু ওই ম্লেচ্ছ মেমসবহবে আর তার মেয়ের এ-বাড়িতে ঠাঁই হতে পারে না।

দাদু নাকি ঠাকুমার ওপর সেই একবারই সিংহের মতো গর্জন করে উঠেছিল। বলেছিল, সাবধান! আমি আর এ নিয়ে একটা কথা বা কোনো আলোচনা শুনতে চাই না! ছেলে মরতে বসেছে দেখেও অন্ধ সংস্কার নিয়ে বসে আছ? একটা অসহায় মেয়ে আর দুধের শিশুকে জায়গা না দিলে তোমার ছেলে এখানে আসবে? এসে নিশ্চিন্তে চিকিৎসা করবে? এত পুজো-আর্চা করে এই বুদ্ধি আর এই বিবেক তোমার? নির্বোধ আহাম্মক কোথাকারের—খবরদার এ-কথা আর যেন দ্বিতীয়বার না শুনি।

ঠাকুমা যে দাদুকে এত ভয় করে এ নাকি এর আগে এতটা কেউ জানত না। দাদু আর যাদের আপত্তি তাদের সকলকে ডেকে বলেছে, বাড়িটা এখন পর্যন্ত আমার,



সংসারের সমস্ত খরচও এখন পর্যন্ত আমিই চালাচ্ছি, তাই আমার বিবেচনা নিয়ে কারো মাথা খাটানোর দরকার নেই। তারপর জ্যাঠাকে বাচ্চা ছেলের মতো ধমকে উঠেছে, একটা কলেজে মাস্টারি করিস, এ-সময় মায়ের কথায় সায় দিতে লজ্জা করে না তোর?

ব্যস সেই এক হুমকিতে তখনকার মতো অন্তত সকলের জিভ নাড়া বন্ধ।

...বাবার সঙ্গে আমার আর মায়েরও এই বাড়িতেই ঠাঁই হয়েছে। নিচে একেবারে কোণের একটা আলাদা ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। শুনেছি, বাবার সুবিধের কথা ভেবে এক তলায় থাকার কথা দাদু বলেছে। কিন্তু যতটা সম্ভব ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলার জন্য একেবারে কোণের ঘরের ব্যবস্থা ঠাকুমার।

তারপর একদিকে বাবার যেমন চিকিৎসা চলেছে, ঠাকুমার নির্দেশে অন্যদিকে তেমনি চলেছে মা-কে হিন্দু বানানোর ঘটা। জামসেদপুরে থাকতে মায়ের দুই একটা শাড়ি ছিল। বাঙালীর বউ তাই সখ করে মাঝে সাজে শাড়ি ব্লাউস পেটিকোট পরত। এখানে আসার পর ওই শাড়ি ব্লাউস পেটিকোটই একমাত্র পরিধেয়। গাউন পরা ঘুচে গেল। লাল চুলের সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর উঠল, কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। মা-কে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে পুজো দিয়ে হাতে লোহা-বাঁধানো আর শাঁখা পরানো হল। ঠাকুমার হুকুমে এ-সবই করল জেঠি আর কাকিমা। মা-কে বোঝালো এতে তার স্বামীর মঙ্গল হবে। মা সবেতে এক কথায় রাজি। শুনেছি, শাঁখা সিঁদুর লোহা বাঁধানো দেখে আমার বাবা নাকি হেসে বলেছিল, তোমাকে তো খুব সুন্দরী দেখাচ্ছে—

মা-ও নাকি হেসেই জবাব দিয়েছিল, তোমার ভালো লাগবে আর ভালো হবে জানলে ঢের আগেই এ-সব পরতাম, আগে বলোনি কেন?

কিন্তু এ-সবের পরেও ঠাকুমা সকাল বা বিকেলের চানের পরে এ-ঘর মাড়াতো না। ছেলেকে দেখে স্নান সেরে তবে নিজের এলাকায় পা দিত। এদিকে এলে খুড়ি জেঠিকেও স্নান করে নিজেদের ঘরে ঢুকতে হত। শুধু দাদুর জন্যেই ঠাকুমাকে তার শোবার ঘর বদলাতে হয়েছে। দাদু যখন তখন নিচে বাবার ঘরে এসে বসে। কোনো বাদবিচার নেই বলে ঠাকুমা নিজের মনে গজ গজ করে। মায়ের কাছে দোতলা নিষিদ্ধ এলাকা। কিন্তু আমাকে কোলে নিয়ে মাঝে সাজে দাদু দোতলায় উঠে যেত মনে আছে। ওদিকে উমাদির তখন বছর ন'য়েক বয়েস, সে যখন যেখানে খুশি দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়। ফলে ঠাকুমাকেই যতটা সম্ভব ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলতে হয়। চাঁপার মা-কে দাদু বিশেষ করে বাবা মা আর আমার কাজে লাগিয়েছিল। ফলে ওরও দোতলায় উঠা এক-রকম বন্ধ। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা নিচে আলাদা। রান্না অবশ্য আলাদা হত না, ওপর থেকেই আসত। তবু একেবারে বাচ্চা বয়েস থেকেই বুঝতে শিখেছিলাম আমরা আর বাড়ির অন্য সকলে এক নয়।

বড় হয়ে চাঁপার মায়ের কাছে শুনেছি মহাপূজ্য গুরুদেবকে নিয়েও ঠাকুমা দারুণ ফ্যাসাদে পড়েছিল। কারণ, ওই বাড়িতে আমাদের অবস্থান। গুরুদেব এটা জানত না। এসে শুনেছে। শুনবে না কেন, ছেলের ব্যাধি দূর করার জন্য ঠাকুমা তাঁকে শান্তি স্বস্ত্যয়ন

করতে বলেছিল। গুরুদেব সেটা করতে রাজি হয়েছে (চাঁপার মায়ের মতে তাতে ভালো প্রাপ্তিযোগের আশা), কিন্তু তা বলে খেষ্টান ম্লেচ্ছর সঙ্গে এক-বাড়িতে থেকে জলস্পর্শ করতে রাজি হয়নি। ঠাকুমা কেঁদে-কেটে অস্থির। জ্যাঠা তাই দাদুর কানেও সমস্যার কথাটা তুলেছিল। দাদু তখন গুরুদেবকে গিয়ে বলেছিল, কলকাতার অনেক বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়িতেও আপনার শিষ্য আছে শুনেছি—নানা ফ্ল্যাটে নানান জাতের লোক থাকে—সেখানকার কোনো ফ্ল্যাটে মুরগী গোরুর মাংসও চলে কিনা আপনি খবর নিয়ে দেখেছেন? আপনার অসুবিধে হলে শান্তি স্বস্তয়ন করারও দরকার নেই। গুরুর অভিশাপের ভয়ে ঠাকুমা ভয়ে কাঁটা। কিন্তু গুরুদেব এরপর বলেছে, ওরা নিচে একেবারেই যখন আলাদা থাকে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা। ঘটা করে শান্তি স্বস্তয়ন হয়েছে। গুরুদেব এ বাড়িতে আহার্যও গ্রহণ করেছে।

...দু'বছর বাদে অর্থাৎ আমার প্রায় চার বছর বয়সে বাবা মারা গেল। বহু চিকিৎসা আর বহুকাণ্ড করেও বাবাকে বাঁচানো গেল না। আমার সেটা সব-কিছু বোঝার বয়েস নয়। বাড়িসুদ্ধ লোকের কান্নাকাটি দেখে আমিও কাঁদলাম মনে আছে। বাবাকে কাঁধে নিয়ে সকলে চলে গেল তা-ও মনে আছে। আর এটুকু বুঝলাম বাবা আর কোনদিন ফিরবে না।...সকলেই খুব কাঁদতে দেখেছিলাম মনে পড়ে, ঠাকুমা আঁছড়ে আঁছড়ে কাঁদছিল, জ্যাঠা জেঠি কাকা কাকিমাও কম কাঁদছিল না—কেবল দাদুর চোখে জল দেখেছিলাম, আর মায়ের চোখে রুমাল-চাপা দেখেছিলাম। অনেক পরে চাঁপার মা বলেছে, বাবা মারা যাবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মায়ের সমালোচনা হয়েছে। জেঠি খুড়ি নাকি বলেছে, তার আর অত শোক কেন হতে যাবে, বছর ঘোরার আগেই দিব্বি আবার হাসতে হাসতে আর একজনের ঘরে চলে যাবে।

যাক, মাসখানেকের মধ্যে মা এ-বাড়ি ছেড়ে যাবার সংকল্প করেছে। এ-যেন জানাই ছিল। আর বাড়ির লোকও মনে মনে তাই চেয়েছিল। বাড়ির ছেলেই যখন চলে গেল তখন আর এই অ-জাতকে ধরে রাখা কেন। ঠাকুমা আর সেই সঙ্গে পিসীরও দৃঢ় বিশ্বাস মায়ের কারণেই পরিবারের এত-সব অকল্যাণ।

দাদু শুধু মাকে ডেকে জিগ্যেস করেছে, কোথায় যাবে?

মা জবাব দিয়েছে, আপাতত জামসেদপুর।

দাদু ধরে নিয়েছে মা তার পুরনো চাকরিটা আবার ধরার জন্যই সেখানে যেতে চায়। জিগ্যেস করেছে, তোমার মেয়ের কি হবে?

মা জানিয়েছে, তাকেও নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে।

দাদুও মানুষ। বাড়ির অনেক রকমের কথাবার্তা আর আলোচনা তার কানে গেছে। তাই দাদু খুব স্পষ্ট করেই জানতে চেয়েছে, এরপর চাকরি করে শুধু মেয়েকে মানুষ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য হবে কিনা—নাকি বাধা নেই বলে আবারও মা ঘর-সংসার করতে পারে।

মায়েরও মৃদু অথচ স্পষ্ট জবাব, সেটা এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।



দাদু বলেছে, তুমি যেতে পারো, মেয়ে এখানে থাকবে। আমি তাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিলাম। আমি বেঁচে না থাকলেও সে-ব্যবস্থা করে যাব।

মা চলে গেছে। মায়ের জন্যও আমি খুব যে একটা কান্নাকাটি করেছি এমন নয়। সেইজন্যও নাকি বাড়ির লোক খুব একটা অবাক হয়নি। অর্থাৎ অমন মায়ের মেয়ের ওপর টান হবে কোত্থেকে।

মায়ের চলে যাওয়ার আগে শুনেছি জ্যাঠা দাদুকে কিছু বৈষয়িক ব্যাপার সমঝে দিতে চেষ্টা করেছিল। ক'টা বছরই বা বাবা চাকরি করতে পেরেছে। অসুখে ধার করার ফলে সেই টাকারও নিজের অংশ ঝাঁঝরা। কোম্পানির দেয় কয়েক হাজার টাকা মাত্র প্রাপ্য। আর তিরিশ হাজার টাকার একটা লাইফ ইনসিওরেন্স ছিল। জ্যাঠা দাদুকে পরামর্শ দিয়েছিল, মা-কে আরো কিছুদিন ধরে রেখে এ-সব টাকা আমার জন্য আদায় করে রাখা উচিত—ঠাকুমারও নাকি তাই মত।

কঠিন গলায় দাদু বলেছে, আমি তোদের কারো মতামত চেয়েছি?

না, মা-কে দাদু টাকা-পয়সার কথা কিছুই বলেনি।

...মা চলে যাবার পর চাঁপার মা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। মায়ের সঙ্গে যে চাঁপার মায়ের কিছু যোগাযোগ ছিল সেটা অনেক বছর পরে জেনেছি। পরের টানা আটটা বছরের মধ্যে মায়ের সঙ্গে আমার একটি দিনের জন্যও দেখা হয়নি।চাঁপার মা আমাকে খুব আদর যত্ন করত। মা যে প্রতি মাসে একবার করে কলকাতায় এসে আমার সমস্ত খবর নিত আর ওর হাতে টাকা গুঁজে দিত, এ বাড়ির কাকপক্ষীও টের পেত না। সকলে ভাবত দাদুর হুকুমেই চাঁপার মা আমার সব করত, রাতেও আমি ওর কাছেই ঘুমোতাম।

...এই বাড়ির হাওয়ায় আমি একটু একটু করে বড় হয়েছি। আমার সঙ্গে উমাদির বা কাকারছেলে মেয়ের তফাৎ বুঝতে শিখেছি। এ-সব কারণেই বাচ্চা বয়েস থেকেই আমি একটু বেশি দূরন্ত হয়ে উঠেছিলাম। ইচ্ছেমতো দোতলায় উঠে যেতাম, ঠাকুমার পুজোর ঘরে ঢোকার সাহস ছিল না, কিন্তু ঠাকুমার খিচুনি শোনার জন্যেই দরজার কাছে এসে উঁকিঝুঁকি দিতাম। অসময়ে ঠাকুমাকে ছুঁয়ে দিয়ে শীতের দিনেও তাকে চান করিয়ে ছেড়েছি। জ্যাঠা-জেঠি দাদুর আড়ালে অনেক সময় মার-ধর করত। কাকা কাকিমাও। উমাদি অনেক বড়, তার সঙ্গে পেরে উঠতাম না। কিন্তু কাকার ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করতাম। সব-সময়েই দোষ হত আমার। শাস্তি, মার। দাদু অবশ্য দেখে ফেললে বকত, বলত মারিস কেন, মুখে বললেই তো হয়। কেবল দাদু কখনো বকলে আমার খুব ভয় হত, আর মন খারাপ হত।

জানি, বাড়িতে অন্তত দুষ্টুমি একটু বেশিই করতাম। কেন যেন শুধু দাদু আর চাঁপার মা ছাড়া থেকে থেকে সকলের ওপর রাগ হত আমার। চাঁপার মা সর্বদাই আমার সব দোষ ঢাকতে চেষ্টা করত। উমাদি আর কাকার ছেলেমেয়ের চমৎকার স্কুল ড্রেস, সকলেই তারা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। স্কুল বাসে যাতায়াত করে। আমি মেমের

মেয়ে বলে আমাকেই শুধু সকলের খাঁটি বানানানোর তাগিদ। আমাকে পড়তে হয় বাড়ির কাছাকাছি ছ'ক্লাসের একটা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে। তাতেও স্কুল ড্রেস দরকার। ওদের তুলনায় সেই ড্রেস বিচ্ছিরি। চাঁপার মা আমাকে দিয়ে আসত নিয়ে আসত।

আমার খুব রাগ হত। এক একদিন দাদুকে বলতাম, আমি কেন উমাদি আর ভাইবোনের মতো ওদের স্কুলে পড়ব না—বাসে যাওয়া-আসা করব না?

ঠাণ্ডা ধমকের সুরে দাদু বলে, সাজ-পোশাক আর স্কুল দিয়ে কি হবে—ভালো করে পড়।

উমাদি ঠাট্টা করত, আমার বাজে স্কুল বলেই এত সহজে আমি ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হই। আমি সেটা খুব অবিশ্বাস করতাম না। ছ'ক্লাসের পরেও আমার কপালে দূরের একটা বাঙালী স্কুলই জুটল। এই স্কুলেরও বাস আছে। কিন্তু আমার যাতায়াত পাবলিক বাস-এ। প্রথম একটা বছর চাঁপার মা আমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসত আর ফেরার সময় বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকত। ক্লাস এইটে উঠতে তাও বন্ধ হয়ে গেল। একলাই যাতায়াত করতে হত। বাড়ির লোকের মন্তব্য, মাইনে-করা একটা লোক সারাক্ষণ কেবল একজনের জন্য আটকে থাকলে চলে কি করে?

দাদু কেন এই পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করে ভেবে পেতাম না। পরে তার মন বুঝেছি। কথায় কথায় একদিন বলেছিল, আমি চাই নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো গোড়া থেকেই তুই শক্ত পোক্ত হয়ে ওঠ—তাই তোর কষ্ট হয় বুঝেও কিছু বলি না।

...আট বছর বাদে অর্থাৎ আমার বারো বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে এই কলকাতাতেই প্রথম দেখা। আগে প্রায় রোজই বিকেলে চাঁপার মায়ের সঙ্গে পার্কে বা লেকে বেড়াতে যেতাম। খুড়তুতো ভাই বোনেরাও সঙ্গে থাকত। উমাদি তখন বড়র দলে ভাবে নিজেকে। কাকা কাকিমা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি বা অন্য কোথাও গেলে চাঁপার মায়ের সঙ্গে একলা বেড়ানোর সুযোগ পাই। ওদের সঙ্গ আমার ভালো লাগত না। কথায় কথায় ওদের বাবা-মায়ের কাছে আমার নামে নালিশ করত। পার্কে বা থেকে কোনো ছেলে আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলতে এলে আমি কিছুই মনে করতাম না। সেই নালিশও গার্জেনদের কানে যেত। কাকা-কাকিমা বা জ্যাঠা-জেঠির বিবেচনায় এটা গর্হিত কাজ। বিনা দোষে শাস্তিও পেতে হত, আর চাঁপার মা-ও বকুনি খেত।

একদিন চাঁপার মা আমাকে চুপি চুপি জানিয়ে রাখল এই রবিবার বিকেলে আমাকে একলা নিয়ে বেরুবে। বিশেষ দরকার আছে। সেই দিন খুড়তুতো ভাই বোনদের চোখে ধুলো দিয়ে বিকেল চারটের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। চাঁপার মা বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি আসতে সে আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি লেকের দিকে পা চালিয়ে দিল। লেকের ওপারে নিরিবিলি একটা দিকে গিয়ে দেখি একজন গাউন-পরা মেমসাহেব দাঁড়িয়ে। তার কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে চাঁপার মা বলল, এই তোমার মা—চিনতে পারছ?



এই আট বছরে আমার মন থেকে অনেক কিছুই মুছে গেছে। ধু-ধু যেটুকু মনে পড়ে তা মায়ের শাড়ি পরা মুখ, কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। চাঁপার মায়ের কথা শুনে আমি হাঁ করে মা দেখতে লাগলাম। মা আমাকে আদর করে কাছে টেনে নিল, ভাঙা বাংলায় বলল, হামাকে টুমি ভুলে গেছ, চিনটে পারছ না?

কলকাতার বাড়িতে দু'বছর থেকে মায়ের কিছুটা বাংলা রপ্ত হয়েছিল, আর হিন্দী বেশ ভালোই বলে। মা কিছু খাবার এনেছিল, আমাকে লেকের ধারে বসিয়ে খাওয়ালে। আর জানালো, প্রত্যেক মাসে একবার করে এসে চাঁপার মায়ের কাছ থেকে আমার খবর নিয়ে যাওয়ার কথা।ওকে টাকা দেবার কথাটা আরো অনেক পরে জামসেদপুরে থাকতে শুনেছি। মা-কে সেদিন আমার অদ্ভুত লোভী লেগেছিল। বলেছিলাম, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, এখানে আমার একটুও ভালো লাগে না।

একটু চুপ করে থেকে মা বলেছিল, 'হামি সব জানি', আরো কিছুদিন আমাকে এখানেই থাকতে হবে, তারপর নিয়ে যাবে। যাবার আগে মা আমাকে খুব ভালো করে পড়াশুনা করতে বলে গেল, আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এ বাড়িতে জানাতে নিষেধ করল। জানলে চাঁপার মা খুব বকুনি খাবে, আর তাহলে আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়াও মুশকিল হবে।

বাড়িতে কিছুই বলিনি। সেই বারো বছর বয়সে ভিতরে ভিতরে আমি অনেক পেকেছি। আমার সঙ্গে অন্য সকলের তফাৎটা খুব ভাল বুঝি। কিন্তু সেই রাতটা আমার এক ধরনের উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। রাতে শুয়ে চাঁপার মায়ের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। ওকে জিজ্ঞেস করেছি, মা আবার বিয়ে করেছে কিনা।

চাঁপার মা জানে না। মায়ের সম্পর্কে কেন যেন তখন আমার এই কৌতূহলই সব থেকে বড়। এরপর চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত প্রায় প্রতি মাসেই মায়ের সঙ্গে একবার করে দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু এত বছরে মনেপ্রাণে আমি বাঙালী মেয়ে হয়ে গেছি। বিয়ে করেছে কিনা এ-কথা কিছুতে মুখ ফুটে মা-কে জিগ্যেস করতে পারিনি। রাতে শুয়ে চাঁপার মা'র সঙ্গে মা-কে নিয়ে যত কথা।

বাবার রোগ আর সারবার নয় ডাক্তাররা এ-কথা জানাবার পর ঠাকুমা যে এখানে বসে কত কাণ্ড করেছে আর মায়ের ওপর দিয়ে এ-জন্য কত ধকল গেছে এ কি আমি জানি! কারণ আমি তো তখন কত ছোট! বাবাকে ভালো করার জন্য সম্ভব-অসম্ভব কত রকমের চেষ্টাই না পাগলের মতো ঠাকুমা করিয়েছে। বাবা ভালো হতে পারে এ আশায় যা বলা হয়েছে মুখ বুজে মা করে গেছে।

এইসব শুনে, আর পরে আরো অনেক বড় হয়ে মায়ের সঙ্গে থাকতে তখন বুঝেছি ভুডু, ব্ল্যাক আর্ট দৈব আর অপার্থিব ক্রিয়াকলাপে মায়ের কেন এত ভয়, আর কেনই বা আধা ভয়-মেশানো এক ধরনের বিশ্বাস। বাবার ব্যাপারে কিছু হয়নি, কিন্তু কারোই কিছু

হয় না, এ-সবের সবটাই ভাঁওতাবাজী এ কি জোর দিয়ে বলা যায় ? মা তখন থেকেই জেনেছে, এ-দেশের অনেক মানুষ অনেক রকমের অলৌকিক ক্ষমতা রাখে। আগে শোনা ছিল, বাবার কারণে স্বচক্ষে দেখেছে। বাবা যে বাঁচল না এটা মা তারই দুর্ভাগ্য ভাবে। কিন্তু মায়ের আর্থিক ভাগ্য ফেরার ব্যাপারে অন্তত রামদেও মাহাতোর দৈব ক্ষমতা একেবারে অস্বীকার করে কি করে ? অ্যানজেলার মুখে শুনেছি মায়ের দিন ফিরবে এ নাকি সে বলেই দিয়েছিল। আরো বলেছে সে-রকম গুণীনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে বাবার রোগও নিশ্চয় সারত—আর কিছু না হোক, সে রোগ আর কোনো মানুষ বা প্রাণীর ওপর চালান করা যেত।

...বাবার কথাই বলি। তার রোগ সারানোর তাড়নায় ঠাকুমা নানা রকমের দৈব অনুগ্রহের পিছনে ছুটেছিল। মা-কে তান্ত্রিকের তাবিচ কবচ ধারণ করানো হয়েছিল। তার বিধানে মা-কে পাঁচ সপ্তাহ দিনে সেদ্ধ ভাত আর রাতে দুধ খই খেয়ে থাকতে হয়েছিল। চাঁপার মায়ের কথায় আমার মনে পড়ছে হঠাৎ হঠাৎ এক রাত, কখনো বা তিন চার রাত মা-কে দেখতাম না, চাঁপার মা-কেও না—আমি তখন রাতে জেঠি বা কাকিমার কাছে থাকতাম। শুনলাম, তার কারণ, একবার এক তান্ত্রিক তারাপীঠের শ্মশানে যজ্ঞ করেছিল—মা-কেও যেতে হয়েছিল। সঙ্গে কাকা আর চাঁপার মা গেছল। তিন দিন তিন রাত মা-কে জলাহার ফলাহারে থাকতে হয়েছে, আর মাঝরাতে দু'তিন ঘণ্টার জন্য সেই বীভৎস শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতে হয়েছে। আর একবার এক অজ পাড়াগাঁয়ে এক রাতের জন্য মা-কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে এক বুড়ী সপ্তাহে একদিন মায়ের ভরে দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ বাতলে দেয়। ভরের সময় বুড়ীর সেই ভয়ংকর মূর্তি আর কাঁপুনি-ঝাঁপুনি দেখেই মা আর চাঁপার মায়ের মূর্ছা যাবার উপক্রম। এসব ব্যাপারে কাকাই সর্বদা সঙ্গে থাকত। তার এসবে দারুণ বিশ্বাস। তার মারফতই ঠাকুমা অলৌকিক ক্ষমতার মানুষ খুঁজত। ওই বুড়ীর ওষুধেও ফল হয়নি কারণ ঠাকুমা আর কাকুর মতে আমার খেটাল মায়ের নিষ্ঠা আর বিশ্বাসের অভাব। অথচ চাঁপার মা বলে যা আদেশ করা হত, বুঝে হোক বা না বুঝে হোক মা খুব যত্ন করেই তা করতে চেষ্টা করত। একবার কাকা অন্ত্রের কোন্ এক মুখিয়া না কি বলে—তাকে বাড়িতে ধরে এনেছিল। ভীষণ ক্ষমতাবান পুরুষ নাকি সেই লোকটা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর কার কার সঙ্গে তার ফোটো নাকি বাড়ির লোক দেখেছে, মা দেখেছে, এমন কি চাঁপার মা-ও দেখেছে। তামাম ভারত ঘুরে সে নাকি অনেক অসাধ্যসাধন করেও লোকের মঙ্গল করে বেড়াচ্ছে।

...একটা বড় কাগজের ওপর মুখিয়া অনেকটা হলুদের গুঁড়ো রেখে তারপর অনেক রকমের দুর্লভ ধাতুতে গড়া আধ আঙুল প্রমাণ একটা অদ্ভুত মূর্তি সেই গুঁড়োর ওপর রেখেছিল। সেই মূর্তির সর্ষের থেকে একটু বড় লাল-টকটকে চোখ দুটো নাকি রাগে ঠিকরে পড়ার মতো। লোকের ব্যামো তাড়ানোই তার কাজ। মুখিয়া মন্ত্র পড়তে থাকলে আর হাত নেড়ে ডাকলে যদি সেই মূর্তি হলুদগুঁড়ো থেকে কাগজের ওপর



হলুদের দাগ ফেলে মায়ের দিকে এগিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে বাবার রোগ অব্যর্থ সারবে। তখন হাজার এক নারিয়েল (নারকোল) দিয়ে ত্রিবাদ্রমে কোন্ জঙ্গলের এক পাহাড়ে গিয়ে হনুমানজির পুজো দিতে হবে।

তাই হয়েছিল। বুড়ো চোখ বুজে হাত নেড়ে নেড়ে বিড় বিড় করে অদ্ভুত মন্ত্র বলতে সেই ধাতুর মূর্তিকে মায়ের দিকে যেতে বলছিল, বাবার রোগ সারিয়ে দিতে বলছিল। ঘরের সকলে দম বন্ধ করে বসেছিল (কেবল দাদু ছাড়া। এ-সব কাজ বেশিরভাগ দাদুকে না জানিয়েই করা হত। আর জানলেও কোনো চেষ্টাতেই দাদু নাকি বাধা দিত না। কিন্তু নিজে এ-সবের মধ্যে থাকত না।) মূর্তি হলুদের গুঁড়ো থেকে নড়ে না দেখে মুখিয়া বুড়োর মূর্তি নাকি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল, আর আরো জোরে মন্ত্র পড়ছিল—হাত নাড়ছিল। সকলকে স্তব্ধ অভিভূত করে একসময় সেই ধাতুর মূর্তি নড়েছে।...হ্যাঁ, একটু একটু করে কাগজের ওপর হলুদের দাগ ফেলে মায়ের দিকেই এগিয়েছে। সকলের গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠেছে। মুখিয়ার কপালে স্বস্তির ঘাম দেখা দিয়েছে। ঠাকুমা আনন্দে কেঁদে ফেলেছে।...জঙ্গলের পাহাড়ে হনুমানজির পুজো দেবার জন্য আট আনা করে দাম ধরে হাজার একটা নারকোলের দাম হয় পাঁচশ টাকা আট আনা। ঠাকুমা মুখিয়াকে পাঁচশ এক টাকাই ধরে দিয়েছিল। তাতে মুখিয়া সে-টাকা রাগ করে ঠাকুমার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। আর বলেছিল, দেওতা কি ঘুষ নেবার আদমী—বেশি দেওয়া হচ্ছে কেন ?

ঠাকুমা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একটা টাকা ফেরত নিয়ে একটা আধুলি বার করে দিয়েছিল। কিন্তু এর পরেও বাবা ভালো হল না বলে দোষ মায়ের ঘাড়ে পড়েছিল।

...সেই তেরো বছর বয়সে আমার সব থেকে অবাক লেগেছিল অজপাড়াগাঁয়ে (কলকাতা থেকে মাত্র দশ বারো মাইল দূরে) এক কালী সাধিকার অলৌকিক কাণ্ড আর কথাবার্তা শুনে। তার কাছেও কাকা মা আর চাঁপার মা-কে নিয়ে গেছল বাবার রোগ ভালো করার জন্যে। আর তারপর এই বাড়িতে যা হয়েছিল শুনে আমারও গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। সেই সাধিকা মা-টি নাকি এমনি সময়ে একেবারে গৃহস্থ বউয়ের মতো। পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি ; কপালে সিঁথিতে সিঁদুর লেপা। আদুড় গায়ে শাড়িটা বেশ করে জড়ানো।...সেই মা কালীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর গান করছিল আর ভাবে বিভোর হয়ে যাচ্ছিল। বাইরের দাওয়ায় অনেকে বসে। বাইরে আবছা অন্ধকার। এক দিকে মা-কে আর চাঁপার মা-কে নিয়ে অনুগ্রহ প্রার্থী কাকাও বসে।

ভাবে বিভোর হয়ে গাইতে গাইতে সেই মা হঠাৎ চুপ করে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ দুলতে লাগল। তারপর সকলকে ভীষণ চমকে দিয়ে দাঁড়ানো থেকে ঠাস করে মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। তারপর তার সর্বাঙ্গে সে-কি তড়কা আর কাঁপুনি। একটু বাদেই অতি বুড়ো গলায় এমন হাসতে লাগল যে সকলের গায়ের রক্ত জল। তারপর সেই খনখনে গলায় মায়ের নাম ধরে স্পষ্ট ইংরেজিতে একরাশ গালাগাল করল। সকলে স্তব্ধ, তাজ্জব। গেরস্ত ঘরের অশিক্ষিত বউ, ইংরেজির 'ই' জানে না, সে

গড়গড় করে ইংরেজিতে মা-কে এমন গালাগাল করে যাচ্ছে কি করে। গালাগাল আর সেই সঙ্গে হাসি। তারপর উৎকট উল্লাসে সেই ইংরেজিতেই তার বক্তব্য,আমার মা মার্থা উডের সে এক অতিবৃদ্ধ পূর্বপুরুষ। সন্তানসন্ততিরে অত্যাচার অবহেলায় না খেয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। সেই থেকে সে মানুষের রক্ত খেয়ে বেড়াচ্ছে। সব থেকে তার বেশি আক্রোশ ছিল মার্থা উডের গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডফাদারের ওপর। রক্ত খেয়ে সে তাদের অনেকের সর্বনাশ করেছে। এখন মার্থার বাঙালি স্বামীর রক্ত খেতে তার খুব ভালো লাগছে। সে যতক্ষণ না ছাড়ছে পৃথিবীর কোনো ডাক্তার-বদ্যি তার স্বামীকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে এ-জীবন ওই বুড়ো আত্মারও ভালো লাগছে না। মার্থার স্বামীকে সে ছেড়ে দিতে পারে একমাত্র শর্তে। তার জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন করতে হবে। মার্থা ইংরেজের বংশ ধর আর তার স্বামী বাঙালি, এই কারণে বাঙালির আর ইংরেজের দু'রকম খানারই বন্দোবস্ত করতে হবে। মাসের সব থেকে অন্ধকার রাত বেছে নিয়ে নিশুতি রাতে খুব শুদ্ধ মনে সেই খাবার বাড়ির ছাদের ওপর সাজিয়ে রেখে আসতে হবে। তার মনের মতো সব ব্যবস্থা হলে সে এসে সেই খাদ্য গ্রহণ করবে। পরদিন খুব সকালে ছাদে এসে সেই সব উচ্ছিষ্ট খাবার তুলে নিয়ে মার্থাকে নিজের হাতে নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে।

সামনে অন্ধকার দাওয়ায় সকলে বাকশক্তিরহিতের মতো দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে কাকাই সম্মোহনের ভরে জিগ্যেস করল, কি-কি ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে?

আবার সেই উৎকট হাসি। তারপর জবাব, অনেক আয়োজন করতে হবে—ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলী আইটেমের গ্র্যাণ্ড ফিস্ট চাই—চিকেন অ্যাসপারাগাস সুপ, ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার, ফিস ফ্রাই, চিকেন রোস্ট, ফ্রুট কাস্টারড্, অ্যাণ্ড এ বটল অফ গুড হুইস্কি। আর বাঙালি খানা হল, ফুটস, পলুয়া, ফিস কারি, বহু ফিসের মুড়ো, মাটন কোর্মা, চাটনি অ্যাণ্ড গুড সুইটস—দ্যাট্স অল্।

...সেই দিনের ভরে সাধিকা মা আর কাউকে কিছু বলল না। হঠাৎ আবার বেহুঁশ হয়ে গেল। বাড়ির লোক আর কোনো কোনো ভক্ত তার গায়ে গঙ্গা জলের ছিটে দিয়ে হরিবোল-হরিবোল করে উঠল। সাধিকা মা একটু বাদে আস্তে আস্তে উঠে বসল। অবসন্ন কিন্তু আগের মতো শান্ত মুখ। কাকুকে ডেকে জিগ্যেস করল, অসুখ ভালো হবার হদিস কিছু পাওয়া গেছে কিনা। কাকার মুখে সব শুনে সাধিকা মা বলল, বিশ্বাস রেখে শুদ্ধ মনে সব করো। হুইস্কির বোতলের মুখটা খুলে রেখো, রান্না যে-ই করুক, মেমসাহেব নিজের হাতে ডিশে আর কলাপাতায় যেন সব সাজিয়ে দেয়। অমাবস্যার দিনে রাত একটায় ছাদে খাবার সাজিয়ে দিতে হবে, আর সকাল ছ'টায় সে-সব উচ্ছিষ্ট তুলে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে হবে। আত্মা গ্রহণ করেছে কিনা সেটা সেই উচ্ছিষ্ট দেখলেই বোঝা যাবে।

বাড়িতে একটা উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেল। সাহেব আত্মার রান্না চাঁপার মা রাঁধলে কোনো ক্ষতি নেই। ও ভালো রাঁধে, খুড়ি-জেঠি-ঠাকুমা তাকে সাহায্য করল। চান করে



শাড়ি পরে,আদুড় গায়ের ওপর সেই শাড়ি জড়িয়ে, সিঁথিতে মাথায় সিঁদুর দিয়ে সেই সব আহার্য খুড়ি-জেঠির পরামর্শ মতো মা তিন-তলার ছাদে সাজিয়ে রেখে এলো। হুইস্কির বোতলও খুলে বিলিতি খানার পাশে রাখা হল।

রাতে ভালো করে কারো ঘুম হল না। কাকার মাথায় দুশ্চিন্তা সকাল ছ'টার আগে মা ছাদের দরজা খুলতে নিষেধ করে দিয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে কাকেরা তো সেই উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে ফেলবে। তাহলে উপায়? ঠাকুমার সিদ্ধান্ত, সাধিকা মা যা বলেছে তাই করতে হবে।

...ভোর ছ'টায় মাকে নিয়ে ছাদের দরজা খোলা হল। তারপরেই একটা দৃশ্য দেখে স্তব্ধ সকলে। ছাতের এ-মাথা ও-মাথা কাপড় শুকানোর জন্য একটা মোটা দড়ি বাঁধা ছিল। ওটার ওপর সারি সারি কম করে শতখানেক কাক বসে আছে। পাশের কার্নিশেও অনেক কাক। কিন্তু কেউ এতটুকু শব্দ করছে না। যেন কাকেদের নির্বাক একটা মৌন সভা বসেছে। দূর থেকে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়েই বোঝা গেল তারা ওগুলোর কোনোটাই স্পর্শ করেনি।

একটা আশ্চর্য অনুভূতি নিয়ে সকলে এগিয়ে আসতে দড়ির কাকগুলো উড়ে গেল। খাবারগুলো সকলে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ফলগুলোতে মনে হল একটু নড়াচড়া পড়েছে, কয়েকটা আঙুর পাতা থেকে মাটিতে পড়ে আছে। রান্না মাছের মুড়োটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, কেউ যেন সমস্ত রস শুষে খেয়েছে। অন্য খাবারগুলোও শুকনো। সুন্দর করে বাড়া পোলাওয়ের ডিশটা ভাঙা। আর সব থেকে তাজ্জব ব্যাপার, হুইস্কির বোতলের মদ অন্তত দু'ইঞ্চি কম।

দাদুর গাড়িতে সমস্ত উচ্ছিষ্ট গঙ্গায় ফেলে আসার পর মা-কে আর চাঁপার মা-কে নিয়ে কাকা আবার সেই সাধিকা মায়ের কাছে ছুটল। সব শুনে আর কাকেও কিছু স্পর্শ করেনি শুনে সাধিকা মা শুধু হাসল একটু। বলল, মনে তো হয় কাজ হয়েছে, তবু এরপরে সকলের ইচ্ছেশক্তি দরকার। তাই রোগীসুদ্ধু বাড়ির সবাই আর সব থেকে বেশি ওই মেমসাহেব যেন সর্বদা ভাবে রোগ সেরে যাচ্ছে।

আগের ভরের রাতে সাধিকা মা কোনো প্রণামী গ্রহণ করেনি। বলেছে, আগে শুচিমতো অনুষ্ঠান হয়ে যাক। এই দিনেও সাধিকা মা বলল, এ-সব করে টাকা রোজগার তার উদ্দেশ্য নয়, যদি মনে হয় রোগীর উপকার হচ্ছে তাহলে যেন তার মায়ের পুজোর জন্যে যা খুশি দিয়ে যায়।

...আশ্চর্যই বটে; দু'সপ্তাহের মধ্যে সকলেরই মনে হয়েছে বাবার চোখ মুখের চেহারা আগের থেকে একটু ভালো হয়েছে, এর মধ্যে আর রক্ত বদল করাও দরকার হয়নি। কাকু সেই সাধিকা মায়ের কাছে পুজোর জন্য জোর করে পঞ্চাশটা টাকা রেখে এসেছে। সাধিকা মা সেদিনও বলেছিল, যে রোগ, আরো কিছুদিন দেখে নাও না!

...তিন সপ্তাহের মাথায় আবার রক্ত বদলানো হয়েছে। কাকু সাধিকা মায়ের কাছে ছুটেছে। সে বলেছে, এত বড় রোগ, ম্যাজিকের মতো ভালো না-ও হতে পারে,

দেখো মায়ের কি ইচ্ছে—

মায়ের ইচ্ছে পরের ক'টা মাসের মধ্যেই বোঝা গেছে। সাধিকা মা তার মায়ের মন্ত্রপূত ওষুধপত্র (গাছ-গাছড়ার), তাবিজ-কবচও দিয়ে থাকে থাকে। সবই নিষ্ফল। বাবা চোখ বুজল। কিন্তু কাকা কাকিমা জেঠি আর সব থেকে বেশি ঠাকুমার বিশ্বাস মায়ের পূর্বপুরুষের দোষেই বাবার ওপর সাহেবের প্রেত ভর করেছিল, আর অনুষ্ঠানে মায়ের বিশ্বাস আর নিষ্ঠার অভাব ছিল বলেই কোনো ফল হয়নি।

পরে বড় হয়ে এই প্রসঙ্গ নিয়ে মায়ের সঙ্গে বার কয়েক আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। মা বিরক্ত হয়ে এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু তার অস্বস্তিও আমার চোখে পড়েছে। মা কিছু না বললেও ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। না, আমার তিল-মাত্র বিশ্বাস হয়নি। যুক্তি খুঁজেছি। অশিক্ষিত গেরস্ত বউয়ের ইংরেজি বলার ক্ষমতা কোত্থেকে এলো ঠিক ভেবে পাইনি। কিন্তু মায়ের মুখে শুনেছি, আর যাই হোক, সেই ইংরেজি সাহেবের গলার নয় অন্তত, আর তাতে অনেক ভুল-ভালও ছিল। তাছাড়া গ্রাম শহরে ইদানীং খুব তফাৎ আর নেই, কানে শুনে শুনেও অনেক ইংরেজি বুলি রপ্ত হতে পারে। এ-সব চর্চা যারা করে তাদের বিশেষ ক্ষমতাও কিছু থাকতে পারে। ভাবতে গিয়ে আমার আরো মনে হয়েছে, আত্মসম্মোহন বলে একটা কথা আছে, তাতে অনেকের দ্বারা অনেক কিছুই হয়তো সম্ভব হয়। চাঁপার মা এমনকি মা-ও বলেছে, সেই সাধিকা মা আর যাই হোক লোভী নয়, লোভ থাকলে বাবার মৃত্যুর আগে সে অনেক টাকাই আদায় করতে পারত। কারণ কেবল দাদু ছাড়া আর সকলের তো তখন মোহগ্রস্ত দশা। বাবার একেবারে শেষ সময়ে কাকু গাড়ি করে সেই সাধিকা মা-কে বাড়িতে ধরে এনেছিল। বাবার অবস্থা দেখে সে নাকি নিঃশব্দে কেঁদেছে আর চোখ বুজে প্রার্থনা করেছে। সকলেই এরা ঠক প্রবঞ্চক না-ও হতে পারে, আত্মসম্মোহনের ফলে তারা নিজেরাই 'ভরে' বিশ্বাস করে। সেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অনেক কিছু বলে, অনেক কিছু করে।

...বাতাসে কলাপাতা নড়তেই পারে, তাতে সাজানো ফলও নড়েচড়ে যেতে পারে। সমস্ত রাত বাতাসে থাকলে মাছের মুড়োও শুকনো হবে, আর ভাজা, পোলাউও শুকিয়ে যেতে পারে। বাতাসে তার কিছু ছড়াতেও পারে। আর খোলা বোতলের হুইস্কি তো কিছুটা উড়ে যাবেই, তাতে স্পিরিটের পরিমাণ বেশি থাকলে বেশিই উড়বে।

...সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার সেই দড়িতে বসা মৌনী কাকের সভা। অত লোভনীয় খাবার কেউ ছোঁয়নি। কিন্তু কাকচরিত্র কে আর নির্ভুল জানে ? কাক বোকা প্রাণীও নয় শুনেছি। সামনে এভাবে সব লোভনীয় খাবার সাজিয়ে রাখাটা তারা কোনোরকম মারাত্মক ট্র্যাপ ভাবতে পারে—ওদের মারার জন্য ওতে বিষ মেশানো আছে ভাবতে পারে। আর, প্রথম কিছুদিন বাবাকে একটু ভালো দেখছে মনে হওয়াটা সকলের মিলিত ইচ্ছা বা উইল-ফোর্সের ফল ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

যাক, একদিকে বাবার অমন মারাত্মক অসুখ আর অন্যদিকে এ-সব ধকলের মধ্যে পড়ে মায়ের তখনকার মানসিক অবস্থাটা আঁচ করতে পারি। মানুষ সব দিক থেকে



নিরুপায় হলেই দৈবের বা অলৌকিক কিছুর পিছনে ছোটে। এ-সবে মায়ের এখনো ভয়-মেশানো দুর্বলতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই ধলভূম সিংভূম বা বিহারে মানুষের অন্ধ সংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস পশ্চিম বাংলার মানুষদের থেকে ঢের বেশি। প্রেত বিদ্যায়, জাদু বিদ্যায় তুক-তাক ঝাড়-ফুঁকে রোগ সারে, শত্রুনাশ হয়, বিত্ত লাভ হয়—তেমন বিপাকে পড়লে অশিক্ষিত ছেড়ে অনেক মোটামুটি শিক্ষিত লোকও এতে বিশ্বাস করে এর পিছনে ছোটে। আর ঠিক এই কারণেই এখানকার গুণীনদের শিক্ষিত ভক্ত যোগাড় করার আগ্রহ বেশি। এতে অশিক্ষিত লোকদের কাছে প্রচার বাড়ে, বিস্ময় আর বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়।

...এরপর ছেলেবেলা থেকে আমার জীবনে পুরুষ প্রসঙ্গ। প্রথম পুরুষ বলতে ষোল বছরের একটা ছেলে। আমার বয়েস তখন দশ।...দাদুর বাড়িতে থাকি। সকলের মতোই টগবগ করে বাংলা বলি। আর চার বছর বয়েস পর্যন্ত মায়ের কাছে ছিলাম বলেই হয়তো আমার বয়সী এমন কি সাত বছরের বড় উমাদির থেকেও ইংরেজি ঢের ভালো বলি। আর, দাদুর মতে, ইংরেজি থেকে বাংলায় আমার ঢের বেশি দখল। উমাদি আর খুড়তুতো ভাইদের জন্য বাড়িতে আলাদা মাস্টার। আমার কোনো মাস্টার নেই। দাদু নিজে আমাকে পড়াতো। মেম বউয়ের মেয়ে বলেই হয়তো নিজের অজান্তে দাদু আমার বাংলার ওপর বেশি জোর দিয়েছিল। খুশি হয়ে আমার এক-আধটা রচনা দাদু উমাদিকে পর্যন্ত ডেকে শুনিয়েছে।

...সে-সময়ে বিলেতের ব্যুরো অফ সোশ্যাল হাইজিনের' কোনো অস্তিত্ব বা তাদের গবেষণার কোনো কথাই জানি না। কিন্তু এটা জোর দিয়ে বলতে পারি, খুব ছেলেবেলা থেকে আমার কাম-চেতনা বা অনুভূতির মূলে কোনো বই নয়, ছবি নয়, সিনেমা-থিয়েটার নয়—শুধু পুরুষ।

...সেই ষোল বছরের ছেলেটার নাম রতন। আমার জেঠির নিজের ছোট বোনের ছেলে। স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। দাদুর বাড়ির কাছেই তাদের বাড়ি। ফলে যখন তখন আমাদের বাড়ি আসত। আর সুযোগ সুবিধে পেলেই আমার ওপর হামলা চালাতো। আমি তার উদ্দেশ্য কিছু বুঝতাম না, শুধু ভাবতাম আমাকে কষ্ট দিয়ে আর জ্বালাতন করেই তার আনন্দ। আমি ওকে ভয়ই করতাম, ওকে দেখলেই চাঁপার মায়ের সঙ্গে লেপটে থাকতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু বাড়ির একজন হয়েও আমি যে আলাদা রকমের কেউ সেটা ও-ছেলে খুব ভালো বুঝে নিয়েছিল। আর এ-ও বুঝেছিল, ওর শাসনের ভয়ে হোক, মারের ভয়ে হোক বা নিজের স্বভাবের দরুন হোক, আমি কক্ষনো কারো নামে নালিশ-টালিশ করতাম না।

...তখনো আমি নিচের তলার সেই কোণের ঘরে বেশিরভাগ সময় থাকি, চাঁপার মা রাতে ওই ঘরের মেঝেতে শোয়। আমার সমস্ত ব্যবস্থাই ওর হাতে। কিন্তু দিনে, ছুটির

দিনের দুপুরে বা সন্ধ্যায় চাঁপার মায়ের তো কত কাজ। আমাকে আগলে বসে থাকার অত সময় সে পাবে কোথায়? সন্ধ্যার সময়ও আমাকে ওপরে যেতে হত না, শনি আর রবিবার ছাড়া সন্ধ্যার পরে দাদু এই নিচের ঘরে এসে আমাকে পড়িয়ে যেত।

...যা বলছিলাম, ওই রতন পাজী ঠিক ফাঁক বুঝে এসে কাচপোকার মতো আমাকে ধরত। কখনো বা সকলের অলক্ষ্যে ছুটির দুপুরে বা বিকেলে আমাকে বাইরে থেকেও জাপটে তুলে ধরে ছুটে আমার ঘরে চলে আসত। কেউ দেখে ফেললেও ভাবত দশ বছরের মেয়েটার সঙ্গে খেলা করছে বা খুনসুটি করছে। ভিতরে এসেই দরজা দুটো ভেজিয়ে দিত। নিজে চৌকিতে বসে দু'পায়ের ফাঁকে আমাকে টেনে নিয়ে গালে ঠোঁটে চুমু খেত, আর এত জোরে চেপে চেপে ধরত যে আমার দম বন্ধ হবার দাখিল। বাধা দেবার চেষ্টা করলে চাপা গলায় ফুঁসে উঠত, মেরে ফেলব! কখনো বা গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিত। বলত, কাউকে কিছু বললে তোকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলব। আবার কখনো হেসে হেসে বলত, তোদের সাহেব-মেমদের তো চুমু খাওয়া একটা সভ্যতা—বোকা মেয়ে এ-ও জানিস না?

ওর দৌরাত্ম্য বাড়তেই থাকল। আর আমার যন্ত্রণা। শুধু গালে ঠোঁটে চুমু খাওয়া নয়, দাঁতে করে আমার বুকের মাংস জামার ওপর দিয়ে টেনে ছিঁড়তে চাইত। একটা কঠিন চাপে আমার খুব যন্ত্রণা হত, কিন্তু একটু উ-আ করলে রাগে ও আমার গলা টিপে ধরত। শেষে এমন হল যে রতনের ছায়া দেখলে আমার ত্রাস। চাঁপার মা-কে না পেলে দৌড়ে দোতলায় উঠে যেতাম। দূর থেকে রক্ত চোখে তাকিয়ে ও আমাকে ইশারায় নিচে যেতে বলত। বেগতিক দেখলে আমি দাদুর ঘরেও ঢুকে পড়তাম।

...একদিন দুপুরে কি কারণে আমার বাংলা মিডিয়ামের স্কুল ছুটি। উমাদি বা খুড়তুতো ভাইয়ের ইংরেজি মিডিয়ামের স্কুল খোলা। নিচের বাথরুম ও-মাথায়। চাঁপার মা সেখানে আমার আধ-ময়লা স্কুল-ড্রেসগুলো নিয়ে কেচে দিচ্ছে। শুকোলে ইস্ত্রিও ও-ই করে। টেবিল চেয়ারে বসে আমি মন দিয়ে হোম-টাস্ক করছি। সামনে বিভীষিকা দেখে চমকে উঠলাম। রতন এমন পা-টিপে ঘরে ঢুকেছে, টেরও পাইনি। পিছন থেকে আমার ঝাঁকড়া চুলের মুঠি টেনে ধরে চেয়ার সুদ্ধ আমাকে উল্টে ফেলে দেয় আর কি। চেঁচিয়ে উঠতে পারি ভেবেই ও একই সঙ্গে অন্য হাতে মুখ চেপে ধরেছে। তারপর চুলের ঝুঁটি প্রায় ছিঁড়ে ফেলে চাপা রাগ আর গর্জন।—টু-শব্দ করবি?

ভয়ে দিশেহারা হয়ে মাথা নাড়লাম। করব না।

চেয়ার থেকে টেনে আমাকে নিয়ে চৌকিতে এসে বসল। আমি ওর দু'পায়ের ফাঁকে। সন্ত্রাসে দেখলাম, দরজা দুটো বেশ চেপে বন্ধ করা হয়েছে।

আবার ফিসফিস গর্জন, এত সাহস তোর, আমার অবাধ্য হয়ে ওপরে এসে পালিয়ে থাকিস! আজ তোকে আমি আস্ত রাখব—

কথা শেষ করার আগেই আমাকে আস্ত না রাখার কাজ শুরু হয়ে গেল। দাঁতে করে হাতে করে ঠোঁট গাল গায়ের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিতে চাইল। আর থেকে থেকে খুব



চাপা গর্জন টু-শব্দ করলে আজ তোকে মেরেই ফেলব!

কয়েক মিনিটের মধ্যে রতন বুঝি পাগল হয়ে গেল। মনে হল ওর হাতে আজ আমার অবধারিত মৃত্যু। একটা কঠিন যন্ত্রণার অনুভূতি। গায়ের ফ্রক আগেই উঠে গেছল, ইজেরটাও এবারে ছিঁড়েখুঁড়ে যাবে। একই সঙ্গে প্রাণপণেও আমাকে নিজের বুকের সঙ্গে পিষে মারছে। বাঁচার তাড়নায় মুহূর্তের মধ্যে যা করলাম তা কোনদিন করতে পারি ভাবিনি। নড়তে না পেরে কপাল দিয়েই আচমকা ওর নাকে প্রচণ্ড গুঁতো বসিয়ে দিলাম। ও বসে ছিল বলে আমার গলার কাছে ওর নাক মুখ। এত জোরে মারলাম মনে হল ওর নাকটা ফেটেই গেল বুঝি। একটা চাপা আর্তনাদ করে আমাকে ছেড়ে ও বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ল।

পলকের মধ্যে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। একেবারে বাথরুমে চাঁপার মায়ের কাছে। ওর কাচা শেষ হয়েছিল। দাঁড়িয়ে ভেজা জামা-ফ্রকের জল নিংড়াচ্ছিল। আমি পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরে বললাম, রতনদা আমাকে মেরে ফেলছে, আমাকে বাঁচাও!

হাতের জামা ফেলে চাঁপার মা আমার দিকে চেয়ে হাঁ খানিক্ষণ। ভেজা আঙুল দিয়ে আমার দু'দিকের গাল ঘষে দেখল, আরো কিছু চোখে পড়তে আঙুলে করে নিচের ঠোঁটটা টেনে দেখল। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে আরো কয়েক পলক আমার দিকে চেয়ে থেকে জিগ্যেস করল, রতন কোথায়?

—আমার ঘরে।

ডানা ধরে হিড়হিড় করে টেনে আমাকে ঘরের দিকে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আমি যেতে রাজি নই। বললাম, কপাল দিয়ে ঠুকে আমি ওর নাকে জোরে মেরেছি, ধরতে পারলে ও আমাকে মেরে ফেলবে!

আমাকে টেনে আনতে না পেরে চাঁপার মা ছুটে ওই কোণের ঘরে চলে গেল। তারপরেই বেরিয়ে এসে দু'রকম করে হাত নাড়ল। এটার অর্থ ঘরে কেউ নেই। অন্যটার অর্থ এসো। কাছে যেতে বলল, পাজিটা পালিয়েছে—

হাত ধরে আমাকে ঘরে নিয়ে এলো। কি হয়েছে জিগ্যেস করল। বললাম। প্রায়ই এ-রকম করে জেরায় পড়ে তা-ও বলতে হল। রাগে গরগর করতে চাঁপার মা প্রায় ধমকে উঠল, আমাকে আগে বলোনি কেন—ওরা এক নম্বরের কাপুরুষ, ওদের ভয় পেতে আছে! আমি ব্যবস্থা করছি, ও আর তোমার ছায়া মাড়াবে না দেখো—

আমার ভয় কাটেনি। কিন্তু এত দাপটের ছেলে এভাবে পালিয়ে যেতে একেবারে অবিশ্বাসও করলাম না। অন্য আশঙ্কার কথাও বললাম, ওর নাকে এত জোরে কপাল দিয়ে ঠুকেছি...জেঠিকে যদি বলে দেয়?

চাঁপার মা রাগের মধ্যেও হেসে ফেলল, তারপর আশ্বাস দিল, ও তোমার থেকে একশ গুণ খারাপ কাজ করেছে, জেঠিকে ও কিছুই বলবে না, শিগগীর এ-বাড়িতে আর আসবেও না দেখো।

দু'দিনের মধ্যে আর আসেনি। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে ঘরে বসে আমি একাই পড়ছিলাম। চাঁপার মা এসে জানালো, বাদরটাকে আজ ও পার্কে গিয়ে ধরেছিল। মাসিকে অর্থাৎ আমার জেঠিকে সব বলে দেবে বলে শাসাতে রতন নাকি ওর পায়ে ধরতে গেছল। কাকুতি মিনতি করে বলেছে, আর কখনো আমাদের বাড়ি-মুখোই হবে না। তারপর চাঁপার মা খুব হাসল একদফা। পরে বলল, কপাল দিয়ে ঠুকে তুমি ওর নাকের হাড় ভেঙে দিয়েছ, ডাক্তার দেখাতে হয়েছে। বাড়িতে বলেছে ফুটবল খেলার সময় একজন বল হেড করতে গিয়ে নাক ঠুকে দিয়েছে—তাইতে এমন হয়েছে। রক্তে নাকি জামাসুদ্ধ ভিজে গেছল—ও বলেছে ওর এতেই খুব শাস্তি হয়েছে আর খুব শিক্ষা হয়েছে।

আমার আর এক অভিজ্ঞতা আমাদের গানের মাস্টার মশাই সঞ্জয় ঘোষকে নিয়ে। আগে উমাদির একলার গানের মাস্টার ছিল সে। ওপরে উমাদির পড়ার ঘরের দরজা ভেজিয়ে গান শেখা চলত। আমার বছর বারো বয়েস হতে দাদুর কি খেয়াল হল, হুকুম হল আমাকেও গান শিখতে হবে। টাকা যা বেশি লাগে দাদুই দেবে। এটা জেঠি বা জ্যাঠা কারো পছন্দ হয়নি। কিন্তু দাদুর কথার ওপর কার কথা।

সঞ্জয় মাস্টারমশাই দেখতে খুব স্মার্ট। পান খায়। লম্বার ওপর ভালো চেহারা। আর উমাদিও বেশ মিষ্টি দেখতে। সঞ্জয় ঘোষের বয়েস তখন আঠাশ-উনত্রিশ হবে। আমি এক বছর ধরে গান শিখছি, আমার তেরো। উমাদির কুড়ি। এই সময়ের মধ্যে পুরুষ সম্পর্কে কত রকমের অভিজ্ঞতা হচ্ছে উমাদির ধারণাও নেই। আমার মুখ দেখে কিছু বোঝারও উপায় নেই। নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথা পরে, আগে উমাদি আর সঞ্জয় মাস্টারমশাইরে ব্যাপারটা বলে নিই। ষোল বছর বয়েস পর্যন্ত উমাদি গানের স্কুলে গিয়ে গান শিখত। সঞ্জয় মাস্টার এখনো সেখানে মেয়েদের গান শেখায়। ষোল পেরুতে উমাদি বায়না ধরল, গানের স্কুলে যাবে না, বাড়িতে গান শিখবে এবং ওই সঞ্জয়বাবুর কাছেই।

উমাদির গানের গলা এমনিতেই বেশ ভালো আর মিষ্টি। তার ওপর এই চার বছর সঞ্জয়বাবুর কাছে গান শিখে আরো অনেক উন্নতি। এখন রেডিও-প্রোগ্রাম পাওয়ার চেষ্টা চলছে। চেষ্টা মাস্টারমশাই-ই করছে। গত চার বছরে তারও নাম ডাক কম বাড়েনি। অনেক দিন ধরেই রেডিওর প্রথম সারির শিল্পী। ইদানীং আবার কি একটা বাংলা ছবির মিউজিক ডাইরেক্টর হয়েছে। তাতেও উমাদির গাওয়া একটা গান থাকবে শুনছি। এ-সব কারণে উমাদির গানের ঝোঁক যত বাড়ছে, পড়ার ঝোঁক ততো কমছে। কোনরকমে বি-এটা পাশ করে ফেলতে পারলে আর পড়বেই না বলছে।

আমি সঞ্জয়বাবুর গানের দ্বিতীয় ছাত্রী হবার পর থেকে এই এক বছর ধরে সপ্তাহে দু'দিন বাড়ির গানের ক্লাস আমার নিচের এই কোণের ঘরে বসছে। ব্যবস্থাটা উমাদির। অন্য সব দিনও প্রায় রাত থাকতে উঠে নিচে নেমে এই ঘরে সেতার নিয়ে তার অনুশীলন চলে। এই নিষ্ঠা উমাদির সত্যি বেড়ে চলেছিল। ওপরে দাদু-ঠাকুমা



থাকে, বাবা-মা কাকা-কাকিমা থাকে, তার মধ্যে ঘর বন্ধ করে গলা সাধতে বা মাস্টারের কাছে গান শিখতে অসুবিধে হয়। আমার আপত্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু এই এক বছরে আমার ধারণা হয়েছে, গানের জন্য উমাদি'র নিচে এই কোণের ঘরের নিরিবিলিতে নেমে আসার আরো কারণ আছে। আমি মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এর মধ্যে কত পেকেছি এ আর ওরা জানবে কি করে। ওরা বলতে উমাদি আর সঞ্জয়বাবু। ওদের দু'জনের চোখে-চোখে কথা, ঠারে ঠোরে হাসি, সুরের সঙ্গে হারমোনিয়ামের ভুল রিডে হাত পড়লে উমাদির আঙুল ধরে ঠিক রিডে বসিয়ে দেওয়া, গানের সঙ্গে সঞ্জয়বাবুর তবলা জমে উঠলে মুখের দিকে চেয়ে উমাদির ফিক-ফিক হাসা—এ সব তো অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি। আর এ-সবের দ্বিতীয় ভাষাও বেশ বুঝতে পারি। ইদানীং প্রায় সন্ধ্যাতেই সঞ্জয়বাবুর জল তেষ্টা পায়। আমার ঘরে জল রাখার কাচের জাগ আছে। কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের ওই জল চলে না। তার মাটির কলসির টাটকা জল চাই, আর তা আমাকেই এনে দিতে হয়। অন্য দিকে উমাদিও কোনদিন গানের খাতা, কোনদিন স্বরলিপির বই, কোনদিন বা তার নিজস্ব কলম ওপরে ফেলে আসে। তাও আমাকেই এনে দিতে হয়। একবার দু'বার কোনো না কোনো ছুতোয় আমাকে ওরা বাইরে পাঠায়। আর একদিন উমাদির ধমক খেয়ে ঘর ছেড়ে বেরুলে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে যেতে ভুলি না। মজাটা টের পাই ফিরে এসেই। দু'জনের বসার ফারাক তখন আরো বেশি। কিন্তু উমাদির কান মুখ অবধারিত লাল। আর সঞ্জয়বাবুর পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসি চুঁয়ে পড়তে থাকে। একদিন তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চটপট ফিরে এসে উমাদির গালে লাল দাগই দেখলাম একটু। সেদিকে চেয়ে থাকার ফলে উমাদি কেমন ধড়ফড় করে উঠল।—কি দেখছিস?

—তোমার ওই গালে লাল মতো কি লেগে আছে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে উমাদির সেই ব্যস্তসমস্ত গালমোছা দেখে হাসি চাপা দায়। ওদিকে সঞ্জয়বাবু তখন গানের খাতা দেখতে ব্যস্ত।

যাক, নাটকটা একদিন একটু বেশি মাত্রায় জমে উঠল। সত্যিই সেদিন মাথাটা কেমন ব্যথা ব্যথা করছিল। সে-কথা জানিয়ে সঞ্জয়বাবুকে বললাম আজ গান করব না। সব দিনই আগে আমার শেখা শেষ হলে উমাদির শুরু হয়। প্রায়ই তখন আমি বিছানায় শুয়ে কোনো বইটই পড়ি। তখনই আমার ওপর এটা-ওটা আনার হুকুম হয়। গান শেখার পর যেদিন নিজে থেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই, সেদিন আর কিছুর দরকার হয় না। মাথা ধরার ফলে সেদিন বইও পড়ছিলাম না, এমনি শুয়ে ছিলাম। আড় চোখে থেকে থেকে দু'জনার চোখো-চোখি হাসা-হাসি আঙুল ছোঁয়া-ছুঁয়ি লক্ষ্য করে যাচ্ছি।

হঠাৎ উমাদি আমার দিকে ফিরে বলল, মাথা ধরেছে তো এ-সময় শুয়ে আছিস কেন—ছাদে চলে যা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় আধঘণ্টা কাটিয়ে আয়, দেখবি ঝরঝরে লাগবে।

হ্যাঁ তিন-তলার ছাদটা আমার প্রিয় জায়গা এ বাড়ির প্রায় সকলেই জানে।

বিকেলে-সন্ধ্যায় প্রায়ই যাই, বেশি গুমোট মনে হলে রাতেও যাই। কিন্তু উমাদির এ-প্রস্তাব আমার মাথা ধরার দরদে নয় এ খুব ভালো করে জানি বলেই জবাব না দিয়ে দু'তিন মিনিট শুয়ে রইলাম। তারপরেই মাথায় কি-যে দুষ্টুবুদ্ধি চাপল ! উঠলাম। বন্ধ দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে এসে দরজা দুটো আবার ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু বাদে খুব আস্তে করে আবার ছিটকিনি তুলে দেওয়ার শব্দ কানে এলো। গানের সময় ঘরের সামনের জানলা দুটো সব সময়ই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

...খুব নিঃশব্দে আমি বাড়ির পিছনের দিকটা ঘুরে আমার ওই কোণের ঘরের পিছনের দিকটায় চলে এলাম। আমার প্রায় বুক পর্যন্ত দেয়াল, তারপর লোহার গরাদ দেওয়া দুটো খোলা জানলা। পর্দা টাঙানো। পর্দার ওপর দিয়ে এক বিঘতের মতো ফাঁকা। খুব নিঃশব্দে পর্দার-তলা দিয়ে লোহার দুটো গরাদ ধরে হনুমানের মতো বেয়ে জানলার নিচের দেয়ালের খাঁজের ওপর উঠে বসলাম। হারমোনিয়ামের একটা টানা সুর কানে আসছে। থেকে থেকে দুই একটা তবলায় চাঁটিও। তারপর তিন চার মিনিট চুপচাপ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরের অন্ধকারে উঠোনের দিক থেকে আমাকে কারো দেখে ফেলার ভয় নেই। আমার মাথা তখন পর্দার অনেকটা ওপরে। আমি মেয়েটা ঢ্যাঙা বলে দু'হাতে গরাদ ধরে একটু হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে পর্দার ওপর দিয়ে ভিতরে চোখ চালালাম।

আর তারপর বোকার মতো আমার স্থান-কাল ভুল হয়ে গেল।...উমাদি সঞ্জয় ঘোষের প্রায় কোলের ওপর। এক হাতে দিদিকে আঁকড়ে ধরে চুমু খেয়ে চলেছে। অন্য হাতে থেকে থেকে তবলায় চাঁটি দিচ্ছে বা ওই এক হাতেই হারমোনিয়ামে দুই একবার ব্রো করে ছেড়ে দিয়ে রিডে এক হাতের আঙুল চালাচ্ছে। উমাদির বুকের আঁচল খসে পড়েছে, বুকে বুক চেপে দু'হাতে সঞ্জয় ঘোষের ঘাড় শক্ত করে জড়িয়ে ধরে উমাদিও চুমু খেয়ে চলেছে। এক-একবার অনেকক্ষণ ধরে। সঞ্জয় ঘোষের দ্বিতীয় হাতও আর বশে থাকল না। উমাদির পিঠ বেড়িয়ে উঠে এলো। তারপরের জাপটা-জাপটি চুমোচুমি দেখে আমার কান-মাথা গরম।

আমি হাঁদাই বটে একটা। নিঃশব্দে নেমে আসার কথা ভুলেই গেলাম। ফলে বিপত্তি। দম নেবার জন্য সঞ্জয় ঘোষ একটু মুখ তুলতেই সোজা আমার সঙ্গে চোখাচোখি। ভূত (না কি পেত্নী ?) দেখার মতো ভীষণ চমকে উঠে উমাদিকে কোল থেকে ঠেলে দিল। আর না বুঝে উমাদিও বিষম ধড়ফড় করে উঠে চোখের পলকে শাড়ির আঁচল টেনে দিয়ে পিছন ফিরে জানলার দিকে তাকালো। আমি ভ্যাবলা মেয়ের মতো দাঁড়িয়েই আছি।

ওরা দু'জনের উঠে দাঁড়াতে সম্বিত ফিরল। লাফ দিয়ে জানলা থেকে নেমে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বোধহয় মিনিট চার-পাঁচ হবে, উমাদির হ্যাঁচকা টানে ওর গায়ের সঙ্গেই ঠোক্কর খেলাম। উমাদি আমার গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে



দিল, দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে বার-দুই ঝাঁকালো। তারপর খুব চাপা গলায় ফোঁসফোঁস করে বলল, এক্ষুনি ঘরে আয়, তোকে আজ আমি মেরে ফেলব।

চড় খেয়ে আর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানোর ফলে আমার মাথায়ও রক্ত উঠে গেল। দুমদাম পা ফেলে ওর আগেই আমার ঘরে চলে এলাম। উমাদি নিঃশব্দে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। রাগে রক্তবর্ণ মুখ। কিন্তু রাগের তলায় ভয়টাও ঠিক আঁচ করছি। উমাদি তেড়ে এলো।—ওই জানলায় গিয়ে উঠেছিলি কেন ?

—বেশ করেছি উঠেছি, তোমরা কত দিন ধরে কি করে যাচ্ছ আমি বুঝি না ? আমাকে ছাদে কেন পাঠাচ্ছ বুঝেই ওখানে উঠেছি—নিজে দোষ করে আমাকে মারলে কেন—আরো যত খুশি মারো—আমি আজই দাদুকে সব বলে দেব।

উমাদির সমস্ত মুখ মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে। মুখের ওপর এ-রকম বলতে পারি কল্পনাও করেনি। তবু একটু তেজ দেখাতে চেষ্টা করল, এত সাহস তোর... !

ডবল ঝাঁঝে জবাব দিলাম, তুমিই বা এরপর আমাকে মারতে আস কোন্ সাহসে ? আজ দাদুকে বলবই আমি—

বাড়ির মধ্যে অতি ভয়ংকর গম্ভীর দাদু আমাকে কত ভালবাসে খুব ভালো করেই জানে। উমাদির হঠাৎ কাঁদো-কাঁদো মুখ। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে অনুনয় করে বলল, লক্ষ্মী ছোট বোন আমার—রাগ করিস না—আমার খুব অন্যায় হয়েছে, আর কক্ষনো তোকে মারব না—তুই কাউকে কিছু বলবি না। একটা মজার কথা তুই জানিস না তাই দোষ ভাবছিস... ওই সঞ্জয়বাবুকে তো আমি বিয়েই করব, ও তোর জামাইবাবু হবে...তাহলে আর দোষের কি ? আমি এখনো কাউকে কিছু বলিনি, বি-এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বলব...বুঝলি ?

যা বোঝাতে চায় তার থেকে ঢের বেশি বুঝেও আমি গোঁ ধরে চুপ মেরে রইলাম।

—কি হল ? দাদুকে বা কাউকে কি-চ্ছু বলবি না তো ?

—আর কোনদিন তুমি যদি আমার গায়ে হাত না তোল তাহলে বলব না।

—বললাম তো আর কক্ষনো মারব না—তুই তিন সত্যি কর বলবি না ?

—আগে তুমি করো।

—সত্যি সত্যি সত্যি—মারব না।

—সত্যি সত্যি সত্যি—না মারলে বলব না—মারলেই বলে দেব।

তখনকার মতো আপোস হল। তবু এমন একটা ব্যাপার স্বচক্ষে দেখার ফলে উমাদি বোধহয় আমার ওপর খুব আস্থা রাখতে পারল না। কিন্তু সেটা আমি তখন বুঝিনি। এর তিন দিন পরে সঞ্জয় ঘোষ আবার যখন গান শেখাতে এলো, ভয়ংকর রকমের গম্ভীর, উমাদিও। মাঝখানে অনেকটা ফারাক রেখে বসল। আমার গান শেখা হয়ে গেল। সেদিন না শুয়ে আমি চেয়ারে বসে একটা বই টেবিলের ওপর রেখে বসলাম। উমাদি তার স্বরলিপির বই ফেলে এসেছে। আজ আমাকে হুকুম না করে নিজেই সেটা আনতে চলে গেল। দরজা দুটোও ভেজিয়ে দিয়ে গেল দেখলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় ঘোষ শতরঞ্জী ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তেমনি গম্ভীর!—লিলি, এদিকে শোন তো?

আমি চেয়ারে বসেই মুখ তুললাম। সে আবার বলল, এদিকে এসো না—কথা আছে।

ভাবলাম আগের দিনের ব্যাপারটা নিয়ে সে-ও কিছু অনুরোধ করবে। উঠে কাছে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে ঠোঁটে এক লম্বা চুমু। আমি এত হকচকিয়ে গেছি যে বাধাও দিতে পারছি না। তারপরেই অবাক কাণ্ড। উমাদি বই না নিয়েই ঘরে ঢুকছে। পলকে দরজা ভেজিয়েই আগুন চোখে এগিয়ে এলো। ততক্ষণে সঞ্জয় ঘোষ শশব্যস্তে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। উমাদি সামনে এগিয়ে এসে হিসহিস করে তাকে বলল, আপনি এক্ষুনি বেরিয়ে যান—যান বলছি!

সঞ্জয়বাবু দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উমাদি দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে তেমনি রক্ত চোখ করে আমার দিকে এগিয়ে এলো।—এবার? এবার যদি আমি তোর কাণ্ড দাদুকে বলে দিই?

আমার মাথা তখন সত্যিকারের আগুন। চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমি কেন, আমিই বলব—আগের দিনের কথাও বলব আজকের কথাও বলব—চলো—এসো তুমি আমার সঙ্গে—নিজে বাঁচার জন্য ওর সঙ্গে ষড় করে তুমি এই কাণ্ড করিয়েছ আমি বুঝি না? দাদু আমাদের দুজনকেই শাস্তি দিক, কিন্তু ওই সঞ্জয় ঘোষ আর এ-বাড়িতে কি করে ঢোকে আমি দেখে ছাড়ব—বুঝলে? বুঝলে?

উমাদি বড় রকমের থতমত খেল এক দফা। তারপর হি-হি হি-হি করে হেসে উঠে দু'হাতে আমাকে জোরে জাপটে ধরল। আমার দু'গালে শব্দ করে দুটো করে চুমু খেল। তারপর দু'চোখ কপালে।—তুই এত বিচ্ছু মেয়ে—অ্যাঁ? আবার একদফা হাসি।—শোন, ভগ্নিপতি সম্পর্ক হবে বলেই তোর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে—

বুকে টেনে চুমু খেয়ে ঠাট্টা? আমি ঠাট্টা বার করছি—আর ও এ-বাড়িতে ঢুকবে না—ছাড়ো আমাকে!

বেগতিক দেখে উমাদি আমাকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরল।—আ-হা, এত রাগ করিস কেন—সব দোষ তো আমার—আচ্ছা এবার দিন এলে তুই ওর মাথায় গুণে গুণে তিনটে গাঁট্টা মারবি—তোর মতো শালীর তাহলে অমন ঠাট্টার যোগ্য জবাব হবে। ইস্, মেয়ের রাগ দেখো, চুমু খেল বলে ওর যেন খুব খারাপ লাগছে!

এরপর থেকে উমাদির সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব।

...বারো থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে পুরুষের আচরণের আরো যে অভিজ্ঞতা জমে আছে সে এক আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না। মেয়েদের স্কুলের সামনে ছেলেদের আনাগোনা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বোধহয়। ওই সময়ের মধ্যে কম করে দশ বারোটা ছেলে আমার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করে। ষোল আঠের কুড়ি বাইশের মধ্যে তাদের বয়েস। সে একরকম বরদাস্ত করা গেছে, কিন্তু যাতায়াতের সময় ভিড়ের



মধ্যে ওদের থেকে বয়স্ক মানুষগুলোর কাণ্ড দেখে আমার ভিতরে ভিতরে দ্বিগুণ বিরক্তি। সামনে পিছনে চাপাচাপি, বসা লোকের বিমনা হয়ে হাঁটুতে হাঁটু দিয়ে ঘষা ঘষি, টাল সামলাতে না পেরে বুকে হাত ঘষ্টানো—এ-সব যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার মুশকিল, মাঝ-পথ থেকে ভিড়ের বাসে ওঠা আর মাঝ-পথেই নামা। এই ওঠা নামার সময় আদেখলেগুলোর যেন আরো বেশি মওকা। এর একটা কারণ আমার কাছে খুব স্পষ্ট। কেউ আমাকে বাঙালি মেয়ে ভাবে না। বিরক্ত হয়ে আমার মুখ দিয়ে পরিষ্কার বাঙলা বেরুতে শুনলে এরা অনেকেই সচকিত হয়। বাঙালি না হলেই আমি যেন ওদের কাছে লোভের রাজভোগ একখানা।

...সকালে যাবার সময় বছর আঠাশ উনত্রিশের একটা লোক বাস স্টপে রোজই আমার জন্য খানিক অপেক্ষা করে লক্ষ্য করছিলাম। আমি এলে দুই একবার এদিক-ওদিকে পায়চারী করে আমার গা ঘেঁষে দাড়ায়। একসঙ্গে আমার সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি ঠেসা-ঠেসি করে ওঠে। তারপর ভিড়ের মধ্যে আমাকে হাত দিয়ে পা দিয়ে বুক দিয়ে ভিতরে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যেন ওর দায়িত্ব। ঠেলার সময় কথাও কানে আসে, ট্রাই টু গেট ইন, বি কেয়ারফুল—ডোন্ট্ ফল্...। যে ভাব দেখায় অন্য লোক ভাবে আমার পরিচিত লোক।

বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে একদিন হেসে জিগ্যেস করল, হোয়াট্স ইওর নেম?

—লিলি...।

—হাউ নাইস—ইউ আর লিলি হোয়াইট।

শুনে আমার দু'কান করকর করে উঠেছিল। শুনেছি, বাবা আমার ওই নাম রেখেছিল। আদর করে বলত, মাই লিলি...লিলি হোয়াইট...লিলি লিলি লিলি হোয়াইট!

একটু বড় হয়ে ওই নামের ওপর অবশ্য আমার খুব মোহ ছিল না। কারণ ততদিনে লিলি নামের অনেক কিছু চোখে পড়েছে। লিলি বিস্কুট, লিলি পাউডার, লিলি সাবান, লিলি বার্লি—একদিন একটা লিলি ডাই-ইং ক্লিনিংও চোখে পড়েছিল।

কিন্তু ওই হতচ্ছাড়ার মুখে লিলি হোয়াইট শুনে রাগে আমার হাড়পিত্তি জ্বলেছিল। মনে হয়েছিল বাবার ওই আদরের ডাকের ওপর কালির ছিটে পড়ল।

—হোয়াট্ ক্লাস ডু ইউ রিড ইন?

মুখের ওপর চোখ তুলে ফিরে জিগ্যেস করেছিলাম, হোয়াই আস্ক—আর ইউ স্কুল টিচার—লাইক টু টিচ মি সামথিং?

দাঁত বের করে হেসেছিল।

পরদিনও দেখি সেই লোক দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে হাসি-হাসি মুখ। ওর বরাতে বাসের ভিড়ও খুব বেশি। যত ভিড়ই হোক, আমি ঠেলেঠুলে উঠি ও জানে। কোনরকমে হ্যাণ্ডেল ধরে একসঙ্গে দু'জনে পা-দানিতে পা রাখলাম। কিন্তু বাসটা ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম। লোকটা ভেবাচাকা খেয়ে ফিরে তাকালো। বাস ততক্ষণে আরো পনের গজ এগিয়ে গেছে। লোকটাও লাফিয়ে নামল।

হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বাঁচল। তারপর ফিরে আবার বাস স্টপে এসে জিজ্ঞেস জিগ্যেস করল, হোয়াট্ ওয়জ্ দ্য ট্রাবল্, হোয়াই ডিড ইউ গেট ডাউন ?

আমি তেড়ে এক পা কাছে এগিয়ে এলাম। তারপর গলা চড়িয়ে বাংলায় জবাব দিলাম, আমার খুশি আমি নেমেছি, আপনার ট্রাবলটা কি ? আপনি নামলেন কেন ?

লোকটা হকচকিয়ে গেল প্রথম। তারপর বলেই ফেলল, কি আশ্চর্য...লিলি ইয়ে মানে তুমি বাঙালি ?

তেমনি তপতপে গলায় ফিরে বললাম, আপনি কি ভেবেছিলেন লিলি মানে কোনো মিস ইংরেজ রসগোল্লা ? আপনি কতদিন ধরে যা করে যাচ্ছেন লোকেদের ডেকে বলব ?

বাস স্ট্যাণ্ডে জনা দুই তিন আধবয়সী লোক এসে দাঁড়িয়েছে। ডেকে না বললেও তাদের কানে কিছু গেছে। আরো দু'তিন জনও এদিকে আসছে। কাপুরুষ আর কাকে বলে, লোকটা যেন প্রাণ বাঁচাতে হনহন করে হেঁটে চলে গেল। এই বাস স্টপে আর কোনদিন তাকে দেখিনি।

...এই চৌদ্দ বছর বয়সেই আমার কলকাতায় বাসের মিয়াদ ফুরিয়েছে জানতাম না।

দাদু হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। দিব্বি সুস্থ মানুষ। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বলল, বুকে ব্যাথা। বাঁ হাতেও দারুণ ব্যথা। খুব ঘাম হচ্ছিল। বাড়ির পরিচিত ডাক্তার এসে দেখেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলল। হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু করার আগেই শেষ।

বাবার মৃত্যু মনে নেই। জ্ঞান বয়সে বাড়িতে সেই প্রথম বড় শোকের ছায়া দেখলাম। আর আমার সেই প্রথম মনে হল, আমি এই একটি বটগাছের ছায়ায় ছিলাম। সেটা সরে গেল।

জ্যাঠা আর কাকা বারো দিনে বেশ ঘটা করেই দাদুর কাজ করল। আর তার পরদিনই দেখলাম আমার মা মাথার নিচের বসার ঘরে জ্যাঠা আর কাকার সঙ্গে কথা কইছে। একটু বাদে আমার ডাক পড়ল। জ্যাঠা বলল, ইনি তোমার মা—

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। মা আমার দিকে। আমাদের যে প্রতি মাসেই একবার করে দেখা হয় এক চাঁপার মা ছাড়া সে আর কে জানে ?

জ্যাঠা বলল, দাদু নেই, তোমার মা তোমাকে এখন জামসেদপুরে নিয়ে যেতে চান—সেখানে মেয়েদের ভালো স্কুল আছে বলছেন।

আমি বেশ স্পষ্ট জবাব দিলাম, দাদু নেই, আমারও আর এখানে ভালো লাগবে না। আমি মায়ের সঙ্গে যাব।

জবাব শুনে জ্যাঠা একটু ভুরু কোঁচকালো। আমার কথা থেকে তারা ধরে নিল, দাদু নেই মানেই এখানে আমার আর কেউ নেই। অতএব আমার মতো অকৃতজ্ঞ মেয়ের দায়িত্ব এড়াতে পেরে বাঁচল তারা।

ঠাকুমা তখনো সত্যি শোকে কাতর। জেঠি আর খুড়িরও তখন পর্যন্ত শোকের মুখ। তারা আমাকে কেউ কিছু বলল না। আমি চলে আসার দিন উমাদিকে বললাম, খবর



পেলে তোমার বিয়েতে নিশ্চয় আসব, কিন্তু আমাকে বোধহয় কেউ আসতে বলবে না।

জবাবে উমাদির চোখে সেই প্রথম জল দেখলাম। আমার মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছল। আরো খারাপ হয়ে গেছল চাঁপার মা-কে হাপুস হুপুস কাঁদতে দেখে।

## ॥ ৩ ॥

পরের কয়েকটা বছর অনেকটা ছিন্নমূল দশা আমার। আর মায়ের মনে কি ছিল তা-ও যদি বাড়ি থেকে বেরুনোর দিনও জানতাম !

কলকাতায় দাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মা আমাকে নিয়ে বড় রাস্তায় এলো। পিছনে চাকরের হাতে আমার সুটকেসটা শুধু। জামা ফ্রকগুলো ছাড়া মা আর কিছু সঙ্গে নিতে বারণ করেছিল। মায়ের সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম। সুটকেসটা ড্রাইভারের পাশেই রাখা হল। ট্যাক্সি একটু এগোতেই মা কলকাতার একটা মাঝারি নামী হোটেলের নাম করে সেখানে যেতে বলল।

হাওড়া স্টেশন বলল না দেখে একটু অবাক হয়েই মায়ের দিকে তাকালাম। আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়েও মা গম্ভীর। কিছুই বলল না।

—হোয়াই হোটেল মা ?

অসুবিধে হত বলে বছর দুই ধরে লেকে দেখা হলে মায়ের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলতাম—কিন্তু ম্যামি বা মাম্মি মুখে আসত না। মায়ের সেটা পছন্দ নয় জেনেও মা-ই ডাকতাম। তাছাড়া দাদুর মুখে শুনেছিলাম অনেক খাঁটি ইংরেজ ছেলে মেয়েও আদর করে মাদারের মা-টুকু শুধু বলে। আমার ইংরেজি বলাটাও মায়ের তেমন পছন্দ হত না। অথচ দাদুর মাস্টারির কল্যাণে ক্লাসের ইংরেজি ডিবেটেও আমি সেরা মেয়ে ছিলাম। কিন্তু মা বলত, আমার ইংরেজি অ্যাকসেণ্ট এক্কেবারে বাঙালীর মতো। আর প্রায়ই মন্তব্য করত, তোকে ভালবাসলেও দাদুর উচিত ছিল ভবিষ্যতের দিক চেয়ে কোনো ভালো ইংরেজি মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া।

দু'চোখ সামনের দিকে রেখে গম্ভীর মুখে মা জবাব দিল, আমি এবার ওই হোটেলে উঠেছি, দু'তিন দিন তোকে নিয়ে ওখানেই থাকব। তুই আপাতত জামসেদপুর যাচ্ছিস না।

আমি হাঁ খানিকক্ষণ।—জামসেদপুর যাচ্ছি না মানে ! তাহলে কোথায় থাকব—কোথায় পড়ব।

তেমনি গম্ভীর জবাবে মা আমার মুখ বন্ধ করে দিল, নট্ নাও—।

মায়ের সঙ্গে হোটেলের একটা দোতলার ঘরে উঠলাম। দু'জনার বেড-রুম। সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথ। তাড়াতাড়ি স্নান আর দুপুরের খাওয়া সেরে খানিক বিশ্রামের পর মা ট্যাক্সি করেই আমাকে নিয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানায় আর মিউজিয়ামে ঘুরল। কলকাতায় এখন পর্যন্ত আমার এ দুটোও দেখা হয়নি শুনে আগেই তার মুখে চাপা বিরক্তি লক্ষ্য

করে ছিলাম। কিকেল ছ'টার শো-তে ছোটদের একটা ইংরেজি সিনেমাও দেখালো। এ-ও আমার প্রথম। মায়ের ধারণা আমার কিছুই ইংরেজি শেখা হয়নি, সিনেমা দেখে অন্তত অনেকটাই বুঝলাম না। কিন্তু সেটা আর ফাঁস করলাম না। ব্যাপারখানা তো মোটামুটি বুঝেছি, কেবল অনেক কথা ধরতে পারিনি।

সোয়া আটটায় শো ভাঙতে আবার হোটেলে। ডিনার সারার পর মা আমার মুখোমুখি বসল। এরপর তার বক্তব্য সংকল্প দুই-ই স্পষ্ট। স্কুলের পড়াশুনা আমাকে কলকাতায় থেকেই শেষ করতে হবে। খিদিরপুরের দিকের একটা খুব নামী ইংরেজি মিশনারি স্কুলের রেক্টরের সঙ্গে মায়ের কথা-বার্তা পাকা হয়ে গেছে। সেখানে কম্পাউণ্ডের মধ্যেই হস্টেল—মেয়েরা সিঙ্গল-সীটেড রুমে থাকে। স্কুলের পড়া শেষ হলে আমাকে জামসেদপুরে নিয়ে গিয়ে উইমেনস কলেজে ভর্তি করা হবে। এই স্কুলে বাঙালী মেয়ে কিছু আছে, কিন্তু বেশির ভাগই নানা দেশের অবাঙালী মেয়ে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আর খাস ইংরেজের মেয়েরাই পড়ে। কেরিয়ার গড়তে হলে আমাকে তাদের সঙ্গেই বেশি মিশতে হবে, তাদের কথা-বার্তা আচার-আচরণ রপ্ত করতে হবে।

এরপর মায়ের সমস্ত মুখ আরো সীরিয়াস।—কিন্তু একটা কথা খুব ভালো করে জেনে রাখো, এখন থেকে তোমার সমস্ত দায় দায়িত্ব আমার—আ্যাণ্ড ইউ মাস্ট ওবে মি। এখানে যে তুমি আছ এবং যে-ক'টা বছর থাকবে—তোমার দাদুর বাড়ির কারো সঙ্গে তোমার কোন রকম যোগাযোগ থাকবে না। তুমি এখানে আছ তা-ও কেউ জানবে না। জানলে আমি খুব বিরক্ত হব। এমন কি তাতে তোমার এদিক-ওদিক দু'দিকই নষ্ট হতে পারে। বি ভেরি ভেরি পার্টিকিউলার অ্যাবাউট দিস্—মনে থাকবে?

মেয়ে আমি তলায় তলায় কত গোঁয়ার মায়ের জানার কথা নয়, জানেও না। মায়ের এই কঠিন মুখ দেখে আর অকরুণ কথা শুনে প্রথম রাগই হয়ে গেল। আবার সেই সঙ্গে ভয়ও একটু। হাজার হোক, বয়েস তো মাত্র চৌদ্দ আমার। ... দাদুর বাড়িতে আর ঠাঁই হবে না বুঝে নিয়েছি, অন্যদিকে মায়ের আশ্রয়ও গেলে সব দিকই গেল। তবু জবাব দিলাম না, যা বোঝার বুঝে নিক।

রাতে ভালো ঘুম পর্যন্ত হল না। ... অনেক রকমের চিন্তা। মা আমাকে জামসেদপুরে নিয়ে গেল না শুধুই ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্যে, শুধু কথা-বার্তা আদব-কায়দা রপ্ত করার জন্য? ... মা কি আবার বিয়ে করেছে? তাই আমাকে নিয়ে যেতে অসুবিধে? যদি করে থাকে, আমার আর কোনো ভাই-বোন নেই তো? এদিকে দাদুর বাড়ি থেকে তো ছাড়িয়ে আনা হল, অন্যদিকে যা ভাবছি তাই যদি হয়—আমার নিরাপত্তা কতটুকু? কত দিনের? আবার মনে হল, মা কি তাহলে চাঁপার মায়ের মারফৎ এতদিন ধরে গোপন যোগাযোগ রাখত—দু'বছর ধরে দেখা সাক্ষাতের পর থেকে আমার ব্যাপারে এত ইণ্টারেস্ট নিত? মোট কথা, চিন্তাটা অস্বস্তিকর। আর একটা ব্যাপার মা বোঝে না। চারটে বছর মাত্র বাঙালীর ঘর করেছে, তার মধ্যেও টানা দু'বছর বাবার কঠিন ব্যামো—এর মধ্যে মা বাঙালীর বউ হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আমি—দুই থেকে



চৌদ্দ—টানা বারোটা বছর দাদুর বাড়িতে থেকে মনেপ্রাণে বাঙালীই হয়ে গেছি। বাঙালী মেয়ের খাওয়া-দাওয়া চলা-বলা আচার-আচরণেই আমি অভ্যস্ত। মা যা চায় আমার তা ভালো লাগবে কেন?

যাই হোক, ওই মিশনারি স্কুলে আর হস্টেল জীবনে অভ্যস্ত হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ভর্তি হবার দিন একটা ব্যাপারে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। ফর্মে গার্জেন হিসেবে মা নিজের নাম সই করেছে, মার্থা রয়। তার মানে তো হওয়া উচিত মা আর বিয়ে করেননি। নাকি এটা শুধু এখানকার জন্যেই লেখা?

মা এরপর আগের মতোই প্রতি মাসে একবার করে কলকাতায় এসেছে, দরকার মতো টাকা দিয়ে গেছে। আমার পোশাক-আশাক বই-পত্র, কোনো কিছুতে তার হাতটান দেখা যায়নি। অন্যদিকে আমিও তার হুকুম মেনেই চলেছি, কলকাতার বাড়ির সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগের চেষ্টা করিনি। গোড়ায় গোড়ায় চাঁপার মা আর উমাদির জন্য খুব কষ্ট হত। আর মায়ের ওপর খুব রাগ হত—এই দুজনে জানলে কি এমন ক্ষতি হত? বাড়ির লোকে জানলেই বা কি আমাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে আদর করে আবার ঘরে নিয়ে যাবে? যাবার আগে উমাদি ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখতে বলেছিল—সেই রাস্তাও বন্ধ। এমনকি সঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে উমাদির বিয়ে হলেও আমি জানতে পর্যন্ত পারব না।

সময় অনেক ভোলায়। দিন মাস বছর গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার খেদ-ক্ষোভও কমেছে। কিন্তু মাকে নিয়ে আমার বিস্ময় আর জল্পনা-কল্পনা বেড়েই চলেছে। স্কুলে বছরে একটা বড় ভেকেশন, একটা ছোট। গ্রীষ্মের বড় ছুটি আর এক্সমাস্-এ ছোট। এই দুটো ভেকেশনে হস্টেলে কোনো মেয়ে থাকে না।যে যার বাড়ি যায়। ধরেই নিয়েছিলাম, এ-দুটো ভেকেশনে অন্তত মা আমাকে জামসেদপুরে নিজের কাছে নিয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। প্রথম ছোট ভেকেশনে মায়ের সঙ্গে আমি দার্জিলিঙে কাটালাম। গ্রীষ্মের বড় ভেকেশনে দেরাদুন মুসৌরি। ... চাকরি করে মা বছরে এত ছুটি পায় কি করে ভেবে পাই না। তাছাড়া, চাকরিতে রোজগারই বা কত মায়ের। এত খরচ করে আমার পড়াশুনা চালাচ্ছে, যেখানে বেড়াতে যাই মোটামুটি ভালো হোটেলে ভালো স্টাইলে থাকি। কিন্তু এসবে আমার এতটুকু কৌতূহল দেখলে মা যেমন গম্ভীর তেমনি বিরক্ত। একবার জিগ্যেস করেছিলাম, ছুটিতে আমাকে জামসেদপুর নিয়ে যাচ্ছ না কেন?

মায়ের দু'চোখ আমার উপর স্থির একটু। জবাবও তেমনি। — জামসেদপুর কি এমন জায়গা, সেখানে যাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

পরের আর সব ভেকেশনেও নৈনিতাল রানীক্ষেত দিল্লি রাজস্থান মাদ্রাজ—অনেক জায়গায় গেছি। কিন্তু জামসেদপুরে নয়।

আমার ঠিক ঠিক পড়াশুনা শুরু হয়েছিল একটু দেরিতে। ফলে স্কুলের পাট চুকতে সতের পেরিয়ে গেল। এর পরে জামশেদপুর। সরাসরি কলেজে ভর্তি হওয়া আর হস্টেলে থাকা। তখনই জানলাম মা জামশেদপুরে থাকেই না মোটে। এখানকার চাকরি

তিন-চার বছর আগেই ছেড়ে দিয়ে ঘাটশিলার মৌভাণ্ডারে কপার করপোরেশনে কাজ নিয়েছে। পার্টনারশিপে সেখানে একজনের সঙ্গে বিজনেসও করে।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে হেঁয়ালির মতো লেগেছিল। কি বিজনেস জিগ্যেস করতেও বিরক্তি।—এসবে এখন মাথা দিয়ে কাজ কি, পড়াশুনা শেষ হলে সবই জানতে পারবি।

... জামশেদপুরের তিনটে বছর আনন্দে কেটেছে। কিন্তু পড়াশুনার ব্যাপারটা খুব ভালো হয়নি। স্কুলের মতো লেখাপড়ায় অত আর মন ছিল না। অথচ বাইরের বাজে বই কম পড়তাম না। মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল আমি ইকনমিক্স -এ দিগ্গজ হয়ে উঠি। তাই স্কুলের উঁচু ক্লাশ থেকে এই বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কলেজে এ-বিষয়ে নিয়ে অনার্স পড়তে গিয়ে হাঁপ ধরার দাখিল। মনে হত এত বিরক্তিকর সাবজেক্ট আর নেই। আসলে এ-ও জানতাম এটা সাবজেক্টের দোষ নয়। পড়ায় মন না বসলে আর ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকলে সব বিষয়ই কঠিন লাগে। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে নিজের চেহারাপত্র আর স্বাস্থ্যসৌষ্ঠব সম্পর্কে বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। খুব ভোরে উঠে নিয়মিত ব্যায়াম করি, হেঁটে অনেক দূরে দূরে চলে যাই। বাড়তি খরচ করে ভালো খাই দাই। হইহুল্লোড় করতাম না বা বেশি ফুর্তির উচ্ছাসও আমার কখনো ছিল না। কিন্তু কলেজের সমস্ত অনুষ্ঠানে বা ক্লাবের সব ফাংশানে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আমার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অনেক ছেলের চোখ টানে জানি। তাদের চোখে আমি ব্যক্তিত্বের এক বলিষ্ঠ মেয়ে। এই বলিষ্ঠ মেয়ের বি-এ পরীক্ষার রেজাল্ট যখন বেরুলো, দেখা গেল সে অনার্স পায়নি, পাস কোর্স-এ পাশ করেছে।

কিন্তু এ-জন্যে এতটুকু খেদ ছিল না।

... জামশেদপুর থেকে ঘাটশিলা কতক্ষণের বা কতটুকু আর পথ। বাসে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা আছে। কোনো কোনো মাসে মা দু-তিন বারও আসত। কি চাই না চাই খোঁজ নিত। টাকা দিত। কয়েক ঘণ্টা থেকে আবার চলে যেত। মা অনেকটা আগের মতোই গম্ভীর বটে। কিন্তু তার দুর্বল দিকটাও টের পেতাম। আসলে মা আমাকেই দেখতে আসত। কিন্তু আমাকে একটা দিনের জন্যেও কখনো ঘাটশিলা যেতে বলেনি। কলেজের বড় ভেকেশনে আগের মতোই তার সঙ্গে বাইরে দূরে দূরে কোথাও না কোথাও চলে যেতাম। আর ছোট ছুটি ছাটায় কলেজ আর হস্টেলের মেয়ে জুটিয়ে পাঁচ সাত দশ বিশ দিনের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়তাম। এতদিনে খুব ভালো করেই বুঝেছি আমাকে টাকা জোগান দেবার গৌরী সেন কোথাও আছে, নয়তো মা যদি সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে বলতে হবে তার পার্টনারশিপ ব্যবসার নৌকো বেশ অনুকূল স্রোতে ভেসে চলেছে। নিজের খরচ চালিয়ে চাকরির টাকা থেকে আমার ভাগে এর সিকিও জুটত কিনা সন্দেহ।

কেবল এক ব্যাপারে মাকে বরাবর সন্দিগ্ধ দেখেছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে বা



বুঝতে চেষ্টা করত আমি কোনো বাজে ছেলের সঙ্গে মিশছি কিনা। নিজেরা অর্থাৎ কলেজের মেয়েরা কোথাও বেরুব শুনলে জিগ্যেস করত, কোনো ছেলে বন্ধু আছে কিনা। আমি মজা করে বলতাম, নেই, কিন্তু বলো তো কয়েক গণ্ডা জোটাতে পারি—তোমার মেয়ের জন্য কত ছেলের যে বুক ফাটছে তা যদি জানতে।

ধমক-ধামকের দিন গেছে। তবু মা রেগে গিয়ে বলত, বুক ফেটে মরুক, তুই কারো দিকে তাকাবি না।

আমি হাসতাম। একদিন দু'চোখ কপালে তুলে বলেছিলাম, বলো কি মা—কোনো দিন না। এভাবে থেকেই তোমার মতো বুড়ো হবো? এখনো মাকে মোটেই বুড়ো দেখায় না। ভেবেছিলাম বুড়ো বলাতে মা রেগেই যাবে। খেয়ালই করল না। —সে-কথা কে বলেছে, 'সময় হলে আমিই ব্যবস্থা করব—তুই দুনিয়ার কতটুকু জানিস্। নিজের ভালো কি-ই বা বুঝিস।

আমি ভালো মুখ করে সায় দিয়েছি।—তা অবশ্য ঠিক, তুমি নিজের ভালো এমন বুঝেছিলে যে ভিতরে ভিতরে সে-জন্যে আজও পস্তাচ্ছ।

মায়ের বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। তারপর ঠিকই বুঝেছে। রাগ-রাগ মুখ করে বলেছে, পস্তাচ্ছি তোকে কে বলেছে, আমার কপালে বাঁচল না ... বাঁচলে সুখেরই হত বুঝলি? তোর বাবাকে আমি আজও অশ্রদ্ধা করি না।

মায়ের এমনি উল্টোপাল্টা কথা সময় সময়। যদি এর জবাবে বলতাম, দেখে শুনে ভালো বুঝে আমিও যদি কোনো বাঙালী ছেলেকে বিয়ে করি (যে ইচ্ছে আমার মনে মনে এখনো আছে, কিন্তু তেমন কোনো ছেলে আজ পর্যন্ত চোখেই পড়েনি), আর আমার কপালে সে যদি বাঁচে তাহলে আমার জীবনও সুখের হবে না তুমি ভাবছ কেন? ... কিন্তু শুনলে মা রেগেই যাবে। আর তারপর তার দুশ্চিন্তা বাড়বে শুধু। কিছুই বলিনি।

... মাস সাত-আট আগে মায়ের সম্পর্কে আমার এত দিনের কৌতূহলের ভারী পর্দা কিছুটা সরে গেল। উনিশ পেরিয়ে সবে তখন কুড়িতে পড়েছি। নিজের ব্যক্তিত্ব বোধ আগের থেকেও বেশি। লিলি রয় নামে সুঠাম স্বাস্থ্য এক মিষ্টি মেয়ের এই মিষ্টি ব্যক্তিত্ব যে-ছেলের চোখে সম্প্রতি পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, থেকে থেকে তার মুখখানা চোখে ভাসছে। সকালে উঠে সামনে বই খুলে ভাবছি, পড়াশুনার যা হাল, পরীক্ষায় ফেল মারলে সে-বেচারার মুখখানা কতটা বেজার হবে। ভাবছি আর নিজের মনেই হাসছি। এদিকে ছুটির দিনে খানিকটা মন দিয়ে পড়ব বলেই বই খুলে বসেছিলাম। বন্ধ দরজায় টকটক শব্দ। ছুটির দিনে বেলা দশটা নাগাত সেই প্রেমিক ভদ্রলোক স্লিপ পাঠায়। ... এত সকালে কে?

এ-বছরে সিঙ্গল সীটেড রুম পেয়েছি। ভাবলাম কোনো মেয়ে দৌরাত্ম্য করতে এলো। উঠে দরজা খুলে দেখি মা। আমি অবাক। সবে সকাল আটটা এখন। তার মানে ভোরে বেরিয়ে পড়েছে। মায়ের মুখখানা কেমন শুকনো মনে হলো।—কি ব্যাপার মা, তুমি এ সময়ে?

মা হাসল একটু।—তোর ছুটির দিন ... চলে এলাম। ভিতরে এসে আমার চৌকির বিছানায় বসল।

দরজা দুটো বন্ধ করে চেয়ারটা টেনে তার মুখোমুখি বসলাম। হ্যাঁ, মুখখানা শুকনোই লাগছে।—চা খাবে?

—নাঃ, চা খেয়েই বেরিয়েছি। টেবিলের খোলা বইটার দিকে তাকালো একবার।—পড়ছিলি?

—বই খুলে বসেছিলাম। প্রথম সুযোগেই সাফাই গেয়ে রাখলাম, পড়াশুনা যা করেছি না, পাশ করব আশা কোরো না।

শোনামাত্র মায়ের তেতে ওঠার কথা। পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু রাগ ছেড়ে কথাগুলো কানে গেছে কিনা বোঝা গেল না। একটু বাদে বিমনার মতো জিগ্যেস করল, তোর পরীক্ষার আর দেরি কত?

—দেরি আর কোথায় মাঝে আর ছ'সাতটা মাস মাত্র আছে। দুই এক মিনিট চুপ আবার। তারপর বলল, পড়াশুনা যদি ভালো নাই হয়ে থাকে তাহলে আর সময় নষ্ট করে লাভ কি—আমার ওখানে চলে আয়।

শুনে আমি তো হাঁ প্রথম। মা তার কাছে আমাকে কখনো নিয়ে যেতে চাইবে ভাবিনি। তাছাড়া, পড়াশুনার ব্যাপারে তার এই নিস্পৃহতাও অবাক ব্যাপার। পরীক্ষা না দিয়েই চলে যেতে বলছে!

মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম।—কি ব্যাপার বলো তো মা, তুমি কি একথা বলার জন্যে ভোরের বাস ধরে চলে এলে নাকি?

—তা না ... চল্ বাইরে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কথা বলি।

মা সকালের দিকে এলে দুপুরের খাওয়া কোনো হোটেলে খেয়ে নিই। জিগ্যেস করলাম, নো মিল করে দিয়ে যাব?

—না ... আজ বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

আবারও মনে হল মা হঠাৎই আমাকে দেখতে চলে আসেনি। যে-কারণেই হোক আমাকে এত বছর পরে তার দরকার হয়ে পড়েছে। নইলে সাত মাস আগে পরীক্ষা না দিয়েই চলে আসতে বলত না। ঘর বন্ধ করে তাকে নিয়ে বেরলাম। মায়ের কথায় ফেল করার দুশ্চিন্তা মাথা থেকে গেছে বটে, কিন্তু ফেল করি আর পাশ করি, পরীক্ষাটা দেবই—তার আগে এখান থেকে নড়ছিও না।

দুজনে হস্টেলের সামনের রাস্তা ধরেই হাঁটতে লাগলাম। দিনটা ঠাণ্ডা। রোদও তেমন নেই। তাছাড়া, রাস্তাটার দুপাশে গাছের সারি। বাতাসের ঝিরঝির সড়সড় শব্দও ভালো লাগছে। কিন্তু আমার মনোযোগ মায়ের দিকে। প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যে একটি কথাও বলল না। বিমনা হয়ে পাশে হাঁটছে।

—তোমার কি হয়েছে বলো তো মা, সকালেই চলে এলে—মুখ শুকনো দেখছি ... আর অত ভাবছই বা কি? প্রেসার বাড়েনি তো?



কিছুদিন আগে মা-ই বলেছিল, ডাক্তার তার হার্টের কি গোলযোগ পেয়েছে, আর থেকে-থেকে প্রেসারও বাড়ছে। আমি কলকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে বলেছিলাম। কিন্তু মায়ের নাকি সে ফুরসত নেই। মা আমার দিকে তাকালো না, পায়ের দিকে চোখ রেখে হেঁটে চলেছে। ... না ... মনটা তেমন ভালো নেই, আমার বিজনেসের পার্টনার ভদ্রলোক মারা গেল।

আমি থমকে তাকালাম।—কবে?

—এই চারদিন হল।

চট করে দেখে নিলাম মায়ের পোশাকে শোকের কোনো কালো চিহ্ন আছে কি না। নেই। হাত-ব্যাগে আছে কিনা জানি না।

—কত বয়েস হয়েছিল?

—তা সত্তর-বাহাত্তর হবে।

—কি নাম? বয়েস শুনে আমি একটু নিশ্চিন্ত।

চলতে চলতে এবারে মা চট করে একবার আমার মুখের দিকে তাকালো। আমার প্রশ্নগুলো কানে জেরার মতো লাগল বোধ হয়। বলল, রবার্ট গারল্যাণ্ড।

এই নামের আমার কাছে কোনো অর্থ নেই। মায়ের চেনা-জানা কাউকেও আমি চিনি। তবু জিগ্যেস করলাম, এখানকার কেউ না ইংল্যাণ্ডের?

—ইংল্যাণ্ডেরই ... তবে তিরিশ-বত্রিশ বছর যাবত ইণ্ডিয়াতেই ছিল।

সামনেই ছোট পার্ক একটা। শেডের নিচে বেঞ্চিও আছে। মা-কে নিয়ে সেই বেঞ্চিতে এসে বসলাম। ছুটির দিন বলে পার্কের অন্য দিকে আট-দশটা বাচ্চা ছেলে খেলা করছে।

—ঘাটশীলায় তোমাদের কিসের বিজনেস?

—ঘাটশীলায় নয়, তার থেকে কিছু দূরে ... জাদুচকে। একটা পেট্রল আর একটা ডিজেল পাম্প আছে—কাছাকাছির মধ্যে আর পাম্পিং স্টেশন নেই বলে ভালোই চলছে, ভদ্রলোক মারা যেতে হঠাৎ অসুবিধেয় পড়েছি ...

কাজের অসুবিধে কি পার্টনারের উত্তরাধিকারীদের নিয়ে বোঝা গেল না। বললাম, এতদিন তো তোমার ব্যবসা-ট্যাবসার কোনো কথাই আমাকে বলোনি—তুমি কপার করপোরেশনে চাকরি করছ তো এখনো?

—না, সে-তো কত বছর আগেই ছেড়ে দিয়েছি।

—তা-ও তো এতদিন আমাকে বলোনি, দুজনে মিলে বিজনেস দেখতে?

—হুঁ ...।

—তা কি অসুবিধেয় পড়েছ, তোমার পার্টনারের দাবীদাররা কেউ গোল পাকাচ্ছে?

—দাবীদার কেউ নেই, রবার্ট পার্টনার হলেও কাগজে কলমে আমিই মালিক ছিলাম। আমার দিকে চেয়ে মা হাসল একটু, ওই পাম্পিং স্টেশনের তোর নামেই

নাম—... লিলি সার্ভিসিং স্টেশন।

ভিতরে ভিতরে এবারে আমি সত্যি সচকিত। হিসেবে মিলছে না। ... রবার্ট গারল্যাণ্ডের বয়েস হয়েছিল সত্তরর-বাহাত্তর, আর মায়ের বড় জোর ছেচল্লিশ, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের তফাৎ, অথচ মায়ের মুখ দিয়ে শুধু রবার্ট বেরিয়ে এলো ... পার্টনারশিপ বিজনেস অথচ কাগজে কলমে মা একলা মালিক, আর সেই বিজনেসেরও কিনা আমার নামে নাম। ... এত উদার মানুষ এ-যুগে হয়? মা আমার দিকে ভালো করে তাকাচ্ছে না কেন ... অস্বস্তি বোধ করছে, না মন খারাপ? কিন্তু আমি মেয়েটা কত স্পষ্টভাষী মায়ের ভালো জানা নেই। তাই আমার পরের কথায় সচকিত একটু।—আলোচনা যখন উঠলই সব খোলাখুলি বলছ না কেন—পেট্রোল ডিজেলের পাম্পিং স্টেশন খুলে বসতে সুপারিশ ছাড়া টাকাও তো অনেক লাগে, চাকরি করে নিজের খরচ আর আমার খরচ চালিয়ে পার্টনার হবার মতো অত টাকা পেলে কোথায়?

—আমার কিছু ছিল ... বেশির ভাগই রবার্ট দিয়েছে।

—অথচ নিজের দাবী কিছু রাখেনি, ব্যবসাও আমার নামে—ভদ্রলোক তোমার জন্য এত করতে গেল কেন? তার বউ ছেলেপুলে কিছু নেই?

—ছিল, অনেক বছর আগে তার স্ত্রী ডিভোর্স করে ছেলে-মেয়ে নিয়ে লণ্ডন চলে গেছল। দ্বিধা কাটিয়ে মুখ তুলে আবার বলল, আমার জন্যে এত করেছে কারণ আমাকে খুব ভালবাসতো।

খট্ করে কানে লাগল কারণ মা বলল না বয়সে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বড় ওই ভদ্রলোক তাকে মেয়ের মতো ভালোবাসত। সেটা বলাই স্বাভাবিক ছিল। জিগ্যেস করলাম, আর তুমি?

—আমিও তাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম, এখনো করি।

... বাবার সম্পর্কেও একদিন বলেছিল, শ্রদ্ধা করে।—তার সঙ্গে তোমার কত দিনের জানাশোনা?

লক্ষ্য করে যাচ্ছি পর পর এই জেরার সুরে প্রশ্ন করে যাওয়া সত্ত্বেও মায়ের মুখে কোনরকম বিরক্তির চিহ্ন নেই। ঠাণ্ডা মুখ, ঠাণ্ডা জবাব।

—অনেক বছরের। ... সে এই জামসেদপুরে ইস্পাত কারখানার বড় কর্তাদের একজন ছিল, আমি তার স্টেনোগ্রাফার হয়ে কাজে ঢুকেছিলাম। পরে তারই রেকমেনডেশানে ডিপার্টমেণ্টাল সেক্রেটারি হতে পেরেছিলাম। রিটায়ারমেণ্টের পর রবার্ট গারল্যাণ্ড ঘাটশীলায় থাকত, তারই সুপারিশে কপার করপোরেশনে আমিও চলে গেছলাম, বিজনেস স্টার্ট করার পর চাকরি ছেড়েছি ... তাছাড়া মিস্টার গারল্যাণ্ডকে সেভাবে দেখাশোনা করার মতো আর কেউ ছিল না, শেষের দিকে প্রায়ই ভুগত।

এই প্রথম রবার্ট ছেড়ে মিস্টার গারল্যাণ্ড। আমার দুচোখ সোজা তার মুখের ওপর।—তুমি কি মিসেস গারল্যাণ্ড হয়েছ?

মা-ও মুখ তুলে সোজা তাকালো। ঠাণ্ডা জবাব ছিল, না।



না যখন এই শেষের প্রশ্নে অন্তত মায়ের রেগে ওঠার কথা। কিন্তু রাগের চিহ্নও দেখা গেল না সেটুকুই আশ্চর্য। বরং মনে হল, আমার সমস্ত জেরা খুব স্বাভাবিকই ধরে নিয়েছে। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে মা বেঞ্চি ছেড়ে উঠল।—চল্ এবারে কোথাও বসে একটু চা-টা খেয়ে নিই।

কাছেই রাস্তার ওদিকে একটা ভালো রেস্তোরাঁ আছে। মাকে নিয়ে সেদিকে পা বাড়ালাম। এ-প্রসঙ্গ আর তুললাম না, কিন্তু মনে হল এখনো আমার কিছু জানতে বুঝতে বাকি থেকে গেল।

চলতে চলতে মা এবার নিজে থেকেই বলল, এ-ব্যবসা সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়, একলা পড়ে গেছি, এ-সময় তুই এলে ভালো হত ...।

বললাম, পরীক্ষাটা দেবার ইচ্ছে আছে, এ কটা মাস চালিয়ে নাও তারপর দেখা যাবে।

—দেখা আবার কি যাবে, তারপর কি আবার এম· এ· পড়ার ইচ্ছে নাকি তোর?

হাসলাম।—বি-এ পরীক্ষায় ফেলও করতে পারি বললাম তো—কিন্তু এতকাল পড়াশুনা করে একটা ডিগ্রী পর্যন্ত থাকবে না ভাবতে ভালো লাগে? ফেল করলে আবার পড়তে হবে না?

এতক্ষণে মায়ের মুখে সেই চিরাচরিত বিরক্তি।—ফেল করবি কেন—তিন-তিনটে বছর তাহলে করলি কি?

চুপ করেই গেলাম। তিনটে নয়, আড়াইটে বছরের মধ্যে এই শেষের প্রায় একটা বছর পড়ায় কেন মন দিতে পারিনি আপাতত তা ফাঁস করার মতোও নয়। কিন্তু এমনই বরাত, রেস্তোরাঁয় ঢোকার মিনিট পনেরোর মধ্যে ফাঁস বোধহয় কিছুটা হয়েই গেল।

মা দুটো স্যাণ্ডউইচ আর এক পেয়ালা চা নিল শুধু। কিন্তু ভালো রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়লে আমি আবার ভালোমন্দ কিছু না খেয়ে পারি না। চিকেন কাটলেট প্রায় তৈরি শুনে তাই দুটো অর্ডার দিলাম। সঙ্গে একটা মোগলাই পরোটা। এই খেলেই হস্টেলের একঘেয়ে লাঞ্চ বাতিল।

মায়ের স্যাণ্ডউইচ শেষ। একটু একটু করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। আমি নিজের ডিশ দুটোর ওপর সবে চড়াও হয়েছি। তার মধ্যে বিপত্তি। একবার মুখ তুলে দেখি, বড় বড় পা ফেলে হারানিধি খুঁজে পেল গোছের মুখ করে সেই ছেলে এই টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। মায়ের চোখে চোখ পড়তে কোনরকম ইশারা করারও সুযোগ পেলাম না। আর প্রেমে পড়লে ব্যাটাছেলে এমনি ভ্যাবলাকান্ত হয় বোধহয়। আমার টেবিলের উল্টো দিকে এক মেমসাহেব মহিলাকে দেখেই হয়তো গ্রাহ্য করল না। হড়বড় করে বলে উঠল, তুমি এখানে বসে এই সব সাঁটাচ্ছ। আর হস্টেলে তোমাকে না পেয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে আমি সতের জায়গা চষে বেড়াচ্ছি!

মা বাংলা তেমন বলতে পারে না, কিন্তু বোঝে যে বেশ সেটা এই লোক ভাববে কি করে। তবু আমার রাগই হচ্ছে। আড়চোখে একবার মায়ের দিকে তাকালাম। হাঁ করে

ওর দিকে চেয়ে আছে।

আমি গম্ভীর।—বাজে বোকো না, আগে পরিচয় করিয়ে দিই—আমার মা ... আর মা, এ হল আমার বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... এখানকার হিউম্ পাইপের এ পি আর ও—অ্যাসিস্ট্যানট পাবলিক রিলেশনস অফিসার।

পরিচয়ের শুরুতেই সরোজের হকচকানো মূর্তি দেখেও আমার বিরক্তি। মা ঠাণ্ডা দুচোখ তার মুখের ওপর রেখে নির্বিষ্টভাবে জরিপ করছে। সরোজ হাত বাড়াবে কি প্রমাণই ঠুকবে একটা ভেবে পেল না। তারপর বলে উঠল, সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ মাদার!

মায়ের দু'চোখ আরো ঠাণ্ডা। সামান্য মাথা নাড়ল। সীট ডাউন প্লীজ! চেয়ারে টেনে বসল।

—হোয়াট উইল ইউ টেক?

পাবলিক রিলেশন অফিসার সাধারণত সপ্রতিভ হয়। এই ছেলেও আনস্মার্ট নয়। কিন্তু হঠাৎ এমনই ভেবাচেকা খেয়ে গেছে যে তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকালো। এমনিতে আমার মতোই পেটুক। —নো, নাথিং অ্যাট দিস অড্ আওয়ার—ওনলি এ কাপ অফ টি।

—বোয়!

বয় আসতে মা-ও শুধু এক পেয়ালা চায়েরই অরডার দিল। আমি তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করলাম। বয় বিল নিয়ে আসতে সরোজ বোকার মতো সেটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো। মা ওর দিকে একটা উষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে বিলটা হাতে নিল। ব্যাগ খুলে টাকা দিয়ে উঠে সোজা দরজার দিকে এগোল।

আমার গরম চোখের দিকে চেয়ে সরোজ ভেবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়েই রইল। আমি মায়ের পিছন ধাওয়া করলাম। রাস্তায় নেমে তার সঙ্গ নিয়ে দেখলাম, মুখখানা রাগে ফেটে পড়ছে। ব্লাডপ্রেসারও হয়তো চড়ে গেছে।

—ও ছোঁড়া কে?

শুনেই রাগ হয়ে গেল।—এ-ভাবে বলছ কেন, পরিচয় তো দিলাম, তোমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যাবার মতো নয়।

মা আরো রেগে গেল দেখে আমি অবাকই একটু।—সে ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট হোক, তোর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

এবারে হাসলাম।—সম্পর্ক এখন পর্যন্ত কিছু না, তবে ও একটা সম্পর্ক করার জন্য উঁঠে পড়ে লেগেছে।

—সেই জন্যেই তোর এই অবস্থা, পরীক্ষা দিলে পাশ পর্যন্ত করবি কিনা ঠিক নেই!

খুব মিথ্যে বলেনি। তাই জোর দিয়ে জবাব দিলাম, পাশ না করলে আমার দোষ, সেটা অন্য কারো ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন?

এ-কথায় মা দস্তুরমতো তেতে উঠল।—আমি কাউকে কারো ঘাড়ে চাপাতে চাই না,



যা বুঝলাম তাই বললাম—তুই আমাকে খুব বোকা ঠাউরেছিস—কেমন? কোনো বাঙালী ছেলেকে পাত্তা দিবি না আমি তোকে নিষেধ করেছিলাম কি না?

এবারে আমারও মেজাজ গরম একটু।—তুমি ঘা খেয়েছ তাই নিষেধ করেছ, কিন্তু আমাকেও কি তুমি কচি মেয়ে ঠাউরেছ? এ-ব্যাপারে আমার নিজের কোনো স্বাধীনতা থাকতে পারে না?

মা এত রেগে যেতে পারে আমার চিন্তার বাইরে। বলে উঠল, ও···! আমার খেয়ে পড়ে বড় হয়ে এখন তুই মস্ত স্বাধীন হয়ে উঠেছিস—কেমন? তোর ভালো-মন্দর কোনো দায়িত্ব আমার নেই?

মায়ের সঙ্গে এমন ঝগড়ার মুখোমুখি এই প্রথম। খাওয়া-পড়ার খোঁচা খেয়ে আঁতে লাগল। ফোঁস করেই উঠলাম বললাম, ঠিক আছে, নিজের মেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে একেবারে মাথা কিনে নিয়েছ ভাবছ যখন বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেলেই সব দায়িত্ব থেকেই তোমাকে অব্যাহতি দেবার কথা ভাবব।

এবারে থমকালো। দাঁড়িয়ে গেল। কটা চোখের তপতপে রাগ কমতে লাগল।—ও ছেলেটার সঙ্গে তুই কতটা এগিয়েছিস?

—আমার দিক থেকে একটুও এগোইনি, পরীক্ষা টরীক্ষা শেষ হবার আগে ও-সব ভাবতেও রাজি নই বলেছি···তুমি এ-ভাবে কথা বলছিলে বলেই আমারও রাগ হয়ে গেছে। তবে ও ছেলে তোমার অত তুচ্ছ করার মতো নয়—

আমার মেজাজের আঁচ পেয়ে হোক বা যে জন্যেই হোক, মায়ের মুখখানা বেশ মোলায়েম এখন। ছোট্ট মেয়েকে ভোলাবার মতো ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসিও দেখা গেল।—কেন যে ও-ভাবে কথা বললাম জানলে রাগের বদলে তোর আনন্দ হত। ঠিক আছে, এখন কোনো দিকে মাথা না দিয়ে পরীক্ষাটা দিয়ে ফ্যাল, তারপর আমার ওখানে আয়—সেখানে আমিও তোকে একজনকে দেখাব, আলাপ করিয়ে দেব—চেহারা, জ্ঞানে গুণে হাসিতে খুশিতে এই বাঙালী ছেলেকে যদি তার পায়ের নখের যুগ্যিও মনে হয় তাহলেও তোর যা খুশি করিস—কিন্তু তার আগে কাউকে কিছু কমিট করে বসিস না।

এবারে আমার আঁতকে ওঠার পালা।—কি সর্বনাশ! তার মানে তুমি কাউকে কথা দিয়ে বসে আছ?

মায়ের মুখে আবারও হাসি।—আমি অত কাঁচা নই, তবে গিয়ে দেখলে আর আলাপ পরিচয় হলে তোরই মনে হবে মা এ কাজটুকু এগিয়ে রাখলেই ভালো করত। হঠাৎ আমার মাথার পিছনে একটা হাত দিয়ে কাছে টেনে আনল। তারপর কানে কানে বলার মতো করে বলল, হি ইজ এ ম্যান অ্যাণ্ড এ ডার্লিং—আর ছ' সাতটা মাস আর দশটা মেয়ের কাছ থেকে তাকে আগলে রাখতে পারলে হয়—বুঝলি?

ভালোই বুঝলাম। তাইতে আমায় অস্বস্তি আরো বেশি ছাড়া কম নয়। মায়ের এই হাসি-হাসি মুখ দেখে মনে হল, দুনিয়ার সেরা একখানা স্বামী রত্ন আমার জন্য বাছাই করে রেখেছে!

## ॥ ৪ ॥

পরীক্ষা শেষ হবার আগের দিন মায়ের পোস্টকার্ড পেলাম। ঠিকানার জায়গায় শুধু লেখা, টিকিলি, ধলভূম। তার নিচে তারিখ। মা কোথায় থাকে তা-ও এই প্রথম জানলাম। ঠিকানায় নিচে আগের দিনের তারিখ।

লিখেছে, দশটা থেকে একটার মধ্যে পরীক্ষা শেষ। বেলা দুটো আড়াইটে নাগাদ আমাকে নিজে নিতে আসবে। আমি যেন সব গোছগাছ করে রেডি হয়ে থাকি।

...দিন পনের আগে এসে মা কিছু টাকা রেখে গেছল। সেই সময় জেনে গেছল কবে পরীক্ষা শুরু আর কবে কখন শেষ। চিঠিতে এই দিনই নিতে আসছে শুনে আমার বিরক্তি। ভেবেছিলাম পরীক্ষার পর আরো চার পাঁচ দিন এখানে থেকে একটু ফুর্তি-টুর্তি করে তারপর মায়ের কাছে যাব। তাছাড়া বেচারা সরোজ-ব্যাণ্ডো (বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমিই ব্যাণ্ডো করে নিয়েছিলাম) এ ক'মাস আমার পড়ার ঝোঁক দেখে মান অভিমান ছেড়ে এখন একেবারে চুপসে আছে। পড়ার ঝোঁক না ছাই, মায়ের সেদিনের সেই মূর্তি দেখে আর তার পরের কথা শুনে পরীক্ষার পড়ার নাম করে আমিই মেলামেশা কমিয়েছি। মা আর একজনের সঙ্গে আমার ব্যাপারে কতটা লটঘট পাকিয়ে রেখেছে ঠিক কি। চিঠি পেয়ে আরো মনে হল, পরীক্ষার পরে ব্যাণ্ডোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ফুরসত না দেবার জন্যেই আমাকে তার ওখানে নিয়ে গিয়ে ফেলার তাড়া। পরে মনে হয়েছে ভালোই হল। সেখানে কোন্ কিউপিডকে আমার জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আগে দেখে নেওয়াই ভালো। নিজের মা হলেও আমি তাকে খুব সোজা সরল মেয়ে ভাবি না। দিন কতক বাদে না হয় আবার জামসেদপুরে এসে ক'টা দিন থেকে যাওয়া যাবে। হস্টেল ছাড়লেও থাকার মতো ভালো হোটেলের অভাব নেই এখানে।

একটা মাত্র পাস্ পেপার বাকি ছিল। মনে মনে জানি পড়াশুনার পাট এখানেই শেষ। একটার জায়গায় সাড়ে বারোটার মধ্যে খাতা জমা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। গত রাতেই শোবার আগে মোটামুটি গোছগাছ করে রেখেছিলাম। পোশাক-আসাক সব দুটো বড় সুটকেশ ঠাসাঠাসি করে ঢুকে গেছে। হোলড্-অল্টা গুটিয়ে নিলেই হল। নিচের ক্লাসের এক মেয়ে বই খাতা চেয়ে রেখেছিল। তাকে ডেকে সব দিয়ে দিলাম। আর ব্যাণ্ডোর নামে ওর হাতে একটা খাম বন্ধ চিঠি দিলাম। সে আমার খোঁজে এলে তাকে দিয়ে দিতে হবে। হস্টেলের অনেকেরে ধারণা ওই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে পাকা। তাকে লিখলাম মা এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, দশ পনের দিনের মধ্যেই ফিরে আসছি আশা করতে পারে।

ঠিক দুটো পনেরয় ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। মায়ের ঘড়ি ধরা কাজ আগেই জানি। কিন্তু দরজা খুলেই আমি হাঁ। মা···আর তার পিছনে আর একজন।

এলো দেখল আর মন জয় করে নিয়ে গেল—এ-রকম একটা কথা শোনা ছিল। কিন্তু চাক্ষুষ এ-রকম মানুষ এই প্রথম দেখলাম। ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা হবে। চওড়া



বুকের ছাতি, সরু কোমর, দুই পরিপুষ্ট লম্বা বাহুর দিকে তাকালেই বোঝা যায় এক ছটাক মেদ নেই। ঝাঁকড়া কোঁকড়া লালচে চুল, বড় বড় চোখ, নাকটা সামান্য বড় বলেই আরো সুন্দর, উপমা দিতে হলে কিউপিডের ঠোঁটই বলতে হয়। দু'চোখে আর ঠোঁটে হাসির মায়া জড়ানো। পরনে খুব হালকা চাপা রঙের ওপর সাদা স্ট্রাইপের ট্রাউজারস্ গায়ে সেই রঙেরই একটা মোটা গেঞ্জি। তাইতেই পুরুষের রূপ আরো ফেটে পড়ছে। গায়ের রঙ আর পোশাকের রঙে মিশে গেছে মনে হয়। মা বড়াই কিছু করেনি, পুরুষের এমন বলিষ্ঠ সুন্দর রূপ আমি আর দেখিনি বটে। বয়েস জোর সাতাশ হতে পারে।

যেন কত ক্লান্ত এমনি মুখ করে মা ধুপ করে শয্যাশূন্য চৌকিটার ওপর বসল। আসলে আমার এই পুরুষ দেখার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। ওই লোকও ততক্ষণে ঘরে ঢুকে সোজা আমার দিকে চেয়ে অল্প অল্প হাসছে। রমণীয় এই নির্বাক পর্যবেক্ষণে এতটুকু অনভ্যস্ত মনে হল না।

আধ-মিনিট-টাক সময় নিয়ে মা বলল, জেরি রুবিন, আর এই আমার মেয়ে লিলি।

এগিয়ে এসে নিজের দু'হাতের থাবায় আমার ডান হাত তুলে নিয়ে উল্টো দিকে আলতো করে চুমু খেল। তাইতেই মনে হল হাতের চামড়ায় গরম ছ্যাঁকা লাগল একটু। উষ্ণ দু'হাতের স্পর্শেও শিহরণ একটু। ছেলেবেলা থেকে এই শরীরটার ওপর পুরুষের হামলা গেছে, এই দুটো হাত কতবার ব্যাণ্ডোর দু'হাতের দখলের মধ্যে চলে গেছে ঠিক নেই—একবার তার এক পার্টিতে নেমন্তন্ন করে পেগ দুই চালানোর পর দরকারি কথা আছে বলে সকলের চোখের আড়ালে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বুকে চেপে ধরেছিল আর ঠোঁটেও চুমু খেয়েছিল। আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। পরদিন ও এসে ঘটা করে ক্ষমা চেয়েছিল,বলেছিল তার দোষ নয়, ড্রিংকের দোষ। সে যাক, বলছিলাম ব্যাণ্ডো ওভাবে চুমু খাওয়া সত্ত্বেও এরকম শিহরণ অনুভব করিনি।

মুখে একটু আত্মস্থ হাসি টেনে বললাম, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

আমার হাত ছেড়ে দিল না,সামান্য ঝুঁকে ঠোটের আর চোখের হাসি আরো মজার করে তুলল। ইংরেজিতেই জবাব দিল, তুমি আমাকে এই প্রথম মিট করছ, কিন্তু গত দেড় বছর ধরে আমি তোমাকে কতবার মিট করেছি ঠিক নেই।

আমি অবাক। কোথায় ?

—হোয়াই···ইন টিকিলি।

—কিন্তু আমি তো আজ পর্যন্ত সেখানে যাই নি ?

—বাট স্টিল ইউ আর অলওয়েজ দেয়ার···ইন মাদারস রুম—অ্যাণ্ড আই ডিড্ অলওয়েজ্ অ্যাডোর ইউ।

বুঝলাম। মায়ের ঘরে আমার হালে তোলা ফোটো থাকা সম্ভব। কিন্তু মা তক্ষুনি জেরি রুবিনের উদ্দেশে চোখ পাকালো, ইউ রাস্কেল, ওর সেই বড় ফোটো তো আমার শোবার ঘরে—সেখানে আমি কাউকে এলাউ করি না—তুমি তাহলে চুরি করে ঢুকে দেখতে—আই মাস্ট স্যাক্ অ্যানজেলা (অ্যানজেলাকে আমি তখন পর্যন্ত জানি

না)—বাট্ বি কেয়ারফুল, ডোন্ট্ গো ট্যু ফার—ইউ হ্যাভ এ রাইভ্যাল হিয়ার।

হাসছে। হাত এখনো তার দুটো হাতে, কিন্তু ছাড়িয়ে নেবার কথা ভুলে আমি ওই হাসি দেখছি। জবাবটুকু আরো সুন্দর। বলল, কোয়াইট পসিবল—আই উইশ হিম লাক···বাট মাই রাইভ্যালস আর অলওয়েজ আনফরচুনেট। তাড়াতাড়ি একটু সংশোধনও করল আবার, অফকোরস্ ইফ আই কেয়ার টু উইন হুইচ্ আই সেলডম ডু।

মা হাসছে। আমিও। হঠাৎ মায়ের কিছু মনে পড়ল। জেরি রুবিনকে বাংলা হিন্দি আর সাঁওতালীর খিচুড়ি পাকিয়ে বলল, লিলির সঙ্গে ঠুম বাংলা কঠা বোলছে না কেনো—ও বাংলা বহুট্ পিয়ার করে। হেসে মা আমার দিকে তাকালো।—জেরি হিন্দী বাংলা আর সন্তালি ভি বহুৎ আচ্ছা বোলে—

এবারে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে জেরি মায়ের দিকে ফিরে প্রায় স্পষ্ট বাংলায় সবিনয়ে বলল, তুমি দয়া করে এ-চেষ্টা কোরো না মা, লোকে শুনলে ভাববে এক সঙ্গে তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজকেই গাল দিচ্ছ।

আমি হাসছি। মা কিছু বুঝে আর কিছু না বুঝে ওকে চোখ পাকালো। জেরি আমার দিকে ফিরল। তুমি রেডি ?

মাথা নাড়তে ও একবার ঘরের চার দিক দেখে নিয়ে অত বড় আর ভারী সুটকেসটা অনায়াসে দু'হাতে তুলে নিয়ে লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে এগলো। কাম অন্, বেডিংটা নেবার জন্য নিচে থেকে কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ও বেরুতেই একটু ব্যস্ত হয়ে মা-কে বললাম, ওকে ডাকো, এদিকে ট্যাক্সি পাবে না, আগে কেউ গিয়ে দুটো সাইকেল রিকশ ধরে আনুক—

মায়ের এই গোছের পরিতৃপ্ত মুখ কখনো দেখিনি। একেবারে কাত ভাবছে আমাকে (খুব মিথ্যে ভাবছে কিনা জানি না)।—কিছু দরকার নেই, সঙ্গে গাড়ি আছে। পিট পিট করে হাসছে।—কেমন দেখলি ?

—বাইরেটা ভালো এ আর কে না বলবে।

মায়ের হাসি আর একটু প্রশস্ত।—চ্যালেঞ্জ রাখলাম, ভেতরও বাজিয়ে দেখে নে।

···নিজেই অস্বস্তি বোধ করছি। ওই লোকের ভিতর সম্পর্কেও আমার ভেতরটা হার মানতে চাইছে কিনা বুঝছি না।

মা-কে নিয়ে নিচে নেমে দেখলাম, ফটকের সামনে চকচকে সুন্দর একটা অস্টিন গাড়ি। পিছনের ক্যারিয়ার খুলে জেরি রুবিন সুটকেশের ওপর হোল্ড অলটা রেখে এক হাতে চাপ দিয়ে অন্য হাতে ক্যারিয়ারের ঢাকনা বন্ধ করতে চেষ্টা করছে। বুকের ছাতি ফুলে উঠেছে, দু'হাতের মাসল লোহার মতো উঁচিয়ে উঠেছে। ড্রাইভার নেই। ধরেই নিলাম ওটা জেরি রুবিনের গাড়ি।

···টাটা ব্রোড ধরে গাড়ি ছুটেছে। জেরি রুবিনের চালাবার শিথিল ভঙ্গিটাও অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। পাশে আমি বসে। পিছনে মা। ইচ্ছে করছে ঘুরে বসে জেরির গাড়ি চালানো দেখি। দারুণ সুন্দর। কিন্তু তা করাও যায় না, বলাও যায় না। যা করা যায়



আর বলা যায় তাই করলাম আর বললাম। অল্প একটু ঘুরে বললাম, তোমার গাড়িটা খুব সুন্দর।

জেরি দাঁতে করে নিচের ঠোঁটের কোণ সামান্য একটু ঘষ্টে হাসল। বলল, এটা আমার গাড়ি নয়, মায়ের গাড়ি, উনিই চালান—আজ তুমি যাচ্ছ, তাই দয়া করে উদার হয়ে আমাকে ড্রাইভার করেছেন।

এটুকু সময়ের মধ্যে আমার মনে হয়েছে লোকটা কথা বলার আর্ট জানে বটে। গাড়ি মায়ের অর্থাৎ আমাদের জেনে দারুণ আনন্দ হল।তখনই মা পিছন থেকে গাড়ি কেনার সমাচার শোনালো। চার বছর আগে মা আর রবার্ট গরল্যাণ্ডের এক রিটায়ার করা বিদায়ী বন্ধুর কাছ থেকে গাড়িটা জলের দরে কেনা হয়েছে।

মেজাজখানা দারুন প্রসন্ন আমার।—তুমিও তো খুব ভালো গাড়ি চালাও দেখি—আমাকে শেখাবে ?

ও জবাব দেবার আগে পিছন থেকে মা ফসফস করে বলে গেলো, ও ভালো গাড়ি চালাবে না তো কি, মৌ ভাণ্ডারের কার পুলে কত বড় অটোএঞ্জিনিয়ার ছিল জানিস—গাড়ি আর মোটর বাইকের নাড়ি নক্ষত্র জানে—নেহাত ইডিয়েট তাই অমন চাকরি ছেড়ে নিজে অটো ফার্ম খুলে বসার ধান্ধায় ঘুরছে—প্রশংসা করে করে রবার্ট গারল্যাণ্ডই ওর মাথাটা খেয়েছে।

নিন্দার আড়ালে সবটুকুই প্রশংসা। সামনের দিকে চোখ রেখে টিপটিপ হেসে জেরি রুবিন আমার কথার জবাব দিল, মা যদি এই দুর্লভ প্রিভিলেজ দ্যান···তাহলে শেখাব।

পিছন থেকে মা হৃষ্ট সুরে জানান দিল, স্যাংশন্ড—কিন্তু প্রিভিলেজটা দুর্লভ কেন ?

সামনের দিকে চোখ রেখে তেমনি শিথিল ভঙ্গিতে গাড়ি চালাতে চালাতে আর ঠোঁটের টিপটিপ হাসি ছড়িয়ে জেরি জবাব দিল, ইউ নো হোয়াই—মিস্টার গারল্যাণ্ড আপনার গাড়ি চালানোর গুরু—গাড়ি চালানো শিখতে হলে ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রায় তার গুরুর কোলের ওপর বসে স্টিয়ারিং ধরতে হয়,আর তার পায়ের ওপর দিয়ে পা চালিয়ে ব্রেক চাপতে হয় অ্যাকসেলেটর ধরতে হয়।

রাগত সুরে মা পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, ইউ রাসকেল ! স্যাংশন উইথড্রন !

এবারে আমি এই লোকের দিকে ঘুরে না তাকিয়ে পারলাম না। একটু গা-ছেড়ে বসার ভঙ্গী, শিথিল অথচ তৎপর হাতে গাড়ি চালাবার ঢং, ঠোঁটের হাসি, মুখের লাগাম ছাড়া কথা—সবেতে এক ধরনের পুরুষকার উপছে উঠতে দেখছি। জামসেদপুর হস্টেলে থাকতে আমার সেই গোড়ার দিকের রুম মোট রিনা বাগ, যে নিজেকে পুরুষ আর আমাকে তার হৃদয়েশ্বরী ভাবত,পুরুষের চোখে আমাকে দেখে সে একবার একটা কবিতা লিখেছিল। কবিতার মর্ম, এই পৃথিবীর বুকে আমি রক্ত মাংসের এক বাস্তব ভেনাস। আমার চলাফেরায় নড়া-চড়ায় ভেনাসের সেই যৌবন তরঙ্গ এই দেহতটে ধরে না, উপছে ওঠে আর মিলিয়ে যায়, সর্ব অঙ্গে সাড়া জাগায়। সোজা হয়ে বসে আবার আড় চোখে দেখছি আর মনে হচ্ছে, এই লোকের উপছে-উঠা আর মিলিয়ে-যাওয়া

পুরুষকার নিয়েও সে-রকম কিছু লেখা যায়। আর এটুকু সময়ের মধ্যেই মনে হল ব্যাটাছেলে অনেক দেখেছি, কিন্তু পুরুষ ক'জন দেখেছি! মুখের ওপর মা-কে অনায়াসে যা বলে দিল ক'টা বেপরোয়া ছেলে তা পারে? অথচ আমি কেন, মায়েরও বরদাস্ত করতে খারাপ লাগেনি।

জায়গার নাম টিকলি আগেই জেনেছি। দূর থেকে বাংলো দেখেও চমৎকার লাগল। রাঙা মাটির রাস্তা। দু'দিকে শাল শিমুলের সারি। কাছাকাছি বোধহয় মহুয়ার জঙ্গল আছে। বিকেল না হতে বাতাসে মহুয়ার গন্ধ। দূর থেকে বুঝতে পারিনি, বেশ বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যেই বাংলো। চারদিকে এক বুক উঁচু দেয়াল। সামনে লোহার গেট। খোলাই ছিল। কারণ ভিতরে মালি কাজ করছে। দু'দিকে সুন্দর বাগান—রকমারি ফুল ফুটে আছে। গাড়ি ভিতরে ঢুকে সোজা সিঁড়ির গায়ে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে প্রায় আধখানা দাঁড়িয়ে বলতে গেলে আমার একদিকের কাঁধের ওপর দিয়েই ঝুঁকে পিছনে মায়ের দিকের দরজাটা খুলে দিল। মা আমার দিকে একবার তাকালো শুধু। তার সাদা অর্থ, সৌজন্য বোধটুকুও দেখে রাখ্।

আমি গাড়ি থেকে নামার আগেই সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো যে মূর্তিটি, দেখেই আমি তো হাঁ প্রথম। বিধাতার রমণী গড়ার এক বেপরোয়া নজির বলতে হবে। নিখাদ কালো বিপুল বপুখানা বিপুলতর স্কার্ট ব্লাউসে ঢাকা না থাকলে এ কোন জাতীয় জীব চট করে ঠাওর করা যেত কিনা সন্দেহ। গলা খাটো করে বলেই ফেললাম, ও-বাবা, এ চিজ্ কোথা থেকে জোগাড় করলে!

স্-স্-স্! ভ্রূকুটির সঙ্গে মায়ের চাপা জবাব, চেহারা নিয়ে কক্ষনো ঠাট্টা করবি না, দু:খ পাবে···ওর নাম অ্যানজেলা, অনেক বছর ধরে আমার কাছে আছে।

চেহারায় আর নামে এমন সামঞ্জস্য দেখে আমি আরো মুগ্ধ। গভীর মনোযোগে অ্যানজেলা আমাকেই দেখছে। বারান্দায় উঠে মা আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দিল, এই হল অ্যান্জেলা, আমার যা কিছু দেখাশুনা সব ও-ই করে—আর এই আমার মেয়ে লিলি, তোমার ছোট মেমসাহেব।

অ্যানজেলা সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর আধা-আধি হাঁটু মুড়ে অত বড় শরীরখানা বেশ খানিকটা নামিয়ে বিলিতি কায়দায় অভিবাদন জানালো। কালো মুখের লালচে ঠোঁট ফাঁক করে হাসার চেষ্টা। তারই মধ্যে ছোট মেমসায়েবের চেহারা পত্র শুধু নয়, মন মেজাজও চোখ দিয়ে মেপে নিতে চেষ্টা করছে।

জবাবে আমি সদয় হাসির মহড়া দিলাম একটু। তারপরেই মায়ের হতবাক গলা শুনে ঘুরে দাঁড়ালাম:—ইউ জেরি, নটি বয়—হোয়াট্ আর ইউ ডুইং!

নটি বয়ের কাণ্ড দেখে আমিও হাঁ। জেরির দু'হাতে আমার সেই ঢাউস সুটকেস দুটো, আর বিছানা-বালিশ কম্বলে ঠাসা মোটকা হোল্ড অল তার দাঁতে ঝুলছে, ওটার মাঝখানের চামড়ার হ্যাণ্ডেল দাঁতে কামড়ে একই সঙ্গে নিয়ে আসছে। টপাটপ সিঁড়ি ক'টা টপকে সামনে এসে আগে হাতের সুটকেস দুটো রাখল। তারপর হাঁ করে



হোল্ড-অলটা ছেড়ে দিয়ে হাসতে লাগল।

শব্দশূন্য প্রশস্ত ছেলেমানুষি হাসি। অনেকগুলো ধপধপে সাদা শক্তপোক্ত সুন্দর দাঁত একসঙ্গে ঝকঝক করে উঠল। মা রাগ করেই ধমক লাগালো, এগুলো এভাবে কে তোমাকে টেনে আনতে বলেছে?

এবারে দাঁত দেখা যাচ্ছে না, দুষ্টু দুষ্টু হাসি। বলল, দু'বারের জায়গায় একবারের পরিশ্রমে সব হয়ে গেল!

—হয়ে যাবার চিন্তা তোমাকে কে করতে বলেছিল। —এসব, অ্যান্জেলা আনতে পারত না?

চুকচুক করে জিভ দিয়ে শব্দ করল একটু।—আ-হা, অ্যান্জেলাকে এগুলো টানতে হলে ওর ওপর অবিচার করা হত, আফ্টার অল্ সি ইজ্ এ সুইট ডারলিং। ধুপ করে বারান্দার সোফায় বসে পড়ে ডাকল, অ্যানজেলা, কাম হিয়ার!

অ্যানজেলা সবিনয়ে তার দিকে একটু এগিয়ে গেল।

—আমাদের একটু চা খাওয়াতে তোমার কি খু-উ-ব কষ্ট হবে? ওন্লি টি, নাথিং এলস্—

বিনয়বিগলিত মুখে অ্যান্জেলা থপথপ করে ঘরে ঢুকে গেল। আমি বেশি শব্দ না করেও হেসে উঠলাম। মা-ও হাসছে। সোফায় গা-ছেড়ে জেরি রুবিন ঢিলে-ঢালা হয়ে বসল। তারপর খুব হালকা মৃদু শিস দিতে লাগল। দু'চোখ সামনের বাগান ছাড়িয়ে দূরের শাল শিমুলের দিকে। শিস দিচ্ছে কিন্তু বড় বড় দুই স্বপ্নালু চোখে হাসির ছোঁয়া। চা আসার ফাঁকে একবার ঘরগুলো দেখে নেব ভাবছিলাম। কিন্তু ওই শিসের সুরে পা দুটো প্রায় নিজের অজ্ঞাতে আটকে গেল। চেয়ে দেখলাম একবার। কাউকে শোনাবার জন্য এ শিস মনে হল না, আনন্দের কোনো এক উৎস থেকে এ যেন আপনি আসছে আর একটু একটু করে নিটোল মিষ্টি হয়ে উঠছে। কলকাতায় তো যে-কোনো উৎসবে মাইকের গানে কান ঝালাপালা, জামসেদপুরেও চটুল গান প্রচুর কানে আসত! এ জিনিসটা কানে নতুন ঠেকল। এই শিসের চেনা সুরটাও গভীর কিছু নয়, বরং হালকাই বলা যেতে পারে। কিন্তু শিসের তাল-লয় ওঠা-নামা এমন নির্ভুল অথচ মিষ্টি হতে পারে জানা ছিল না।

মা একটা চেয়ার টেনে বসে আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। অর্থাৎ দেখে নে, বুঝে নে, এখনো অনেক অবাক হতে বাকি। পাছে মায়ের দিকে বা ওই লোকের দিকে চেয়ে থাকলে মিষ্টি বিমনা ভাবটুকু ব্যাহত হয়, তাই পায়ে পায়ে সিঁড়ির দিকে এসে আমি বাগানের শোভা দেখতে লাগলাম। দু'কান সজাগ।

ওই শিস আরো জমে ওঠার মুহূর্তেই ছন্দপতন—থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ,অ্যানজেলা ইউ আর সো সুইট অ্যাণ্ড সো নাইস!

ঘুরে দেখি দু'হাত বাড়িয়ে খুশি মুখে জেরি রুবিনস চায়ের ট্রে নিয়ে সামনের সেন্টার টেবিলে রাখল। ভাবলাম হতচ্ছাড়ি মেয়ে আর তিনটে মিনিট বাদে চা নিয়ে আসতে

পারল না ! ও হেলেদুলে প্রস্থান করল।

—কাম অন্ লিলি—লেট্ মি সারভ।

সামনে ঝুঁকে আগে চিনির পট টেনে নিল। নিজের পেয়ালায় দুটে চিনি কিউব ফেলল, মায়ের পেয়ালায়ও তাই। তারপর আমার দিকে তাকালো। ওয়ান অর ট্যু ?

মুখোমুখি সোফায় বসে বললাম, নান—

—নান্ ! অবাক যেন। স্ট্রেঞ্জ···বাট ইউ আর রিয়েলি সুইট !

যেন চিনি খেয়েই ওর নিজের চেহারাখানা এত মিষ্টি। ঠোঁটের ফাঁকে বাচ্চা ছেলের কাঁচা হাসি ঝুলছে। চা তৈরি করতে করতে মন্তব্য করল, লোকের হ্যাবিট দেখে আমি কিছুটা সাইকোলজি স্টাডি করতে পারি, চায়ে চিনি খাও না মানে দরকারে তুমি রুড্ আর রাফ হতে পারো।

এবারে আমি হাসলাম। চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়লাম।—এটা একেবারে ঠিক বলেছ।

মুখে মেকি দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল, মুখেও বলল, ভাবালে দেখছি, মাদারের তো আমাকে দেখলেই শাসন, এখন আবার তোমার সঙ্গেও সর্বদা কশাস্ থাকতে হবে !

নিজের চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে মা একটু ভ্রুকুটি করল। কশাস্ শব্দটা তোমার ডিকশনারিতে আছে ?

হাসতে লাগল। বেশির ভাগ সময়ই শব্দ করে হাসে না লক্ষ্য করছি। দু' মিনিটে ওর চায়ের পেয়ালা খালি। সোফা ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। হাসি-ছোঁয়া ঠোঁটে আবার একটু হালকা শিস দিতে দিতে সিঁড়ির দিকে এগলো। বিদায়সূচক সৌজন্য প্রকাশের ধার ধারে না দেখলাম। পিছন থেকে মা বাধা দিল, দোকানটা একবার হয়ে যাবে নাকি, আজ আর আমি যেতে পারছি না, কি দিয়ে কি করছে ওরা কে জানে—

সেখানেই ঘুরে দাঁড়ালো। লম্বা হাত দুটো কোমরে উঠে এলো। চাউনি মায়ের দিক থেকে আস্তে আস্তে আমার দিকে। ছোট ছেলে কিছু দুষ্টুমি চাপতে গেলে যেমন দেখতে হয়। চোখ দুটো আমার মুখ থেকে বুক হয়ে কোমরের দিকে নামতে নামতে আবার মায়ের দিকে ঘুরল। ঠোঁটে হাসি। বলল, একদিন ওরা সুযোগ যখন পেয়েছে যা খুশি ওদের করতে দাও না মাদার আমি এখন ওদিক মাড়াচ্ছি না, আমাকে একবার রামদেও মাহাতোর ডেরায় যেতে হবে—

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে মুখে একটু যেন অস্বস্তির ছায়া দেখলাম। জিগ্যেস করল, এখনই আবার সেখানে কেন ?

জবাবে আর একবার আমাকে দেখে নিয়েই আবার মায়ের দিকে। হাসিটা স্বভাবের দোসর মনে হল। জবাব দিল, ভিতরে ভিতরে আমি ওর মতোই বুজরুকিতে এক্সপার্ট হয়ে উঠছি, কিন্তু ভালো ডাক্তারও নিজের চিকিৎসা করে না, ভালো জ্যোতিষীও নিজের ভাগ্য গোণে না—

আমার দিকে আবার একটা তেরছা দৃষ্টি ছুঁড়ে হালকা শিসটা ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে



নেমে গেল। গাড়িটার পাশ কাটিয়ে শিথিল অথচ লম্বা পা ফেলে গেটের দিকে চলল। আমার দিকে দু' দুবার ওভাবে তাকানোর অর্থ মনে হল কেবল মা-ই বুঝেছে, কারণ তার ঠোঁটেও প্রশ্রয়ের হাসি লক্ষ্য করছি।

ফস করে জিগ্যেস করলাম, রামদেও মাহাতো কে ?

মা জবাব এড়াতে পারলে বাঁচে। ও আছে একজন, তুই চিনবি না।

জেরি রুবিন বলে গেল, ভালো ডাক্তারও নিজের চিকিৎসা করে না, ভালো জ্যোতিষীও নিজের ভাগ্য গোণে না। ডাক্তার নয় বুঝতেই পারছি কারণ বুজরুকির কথাও বলেছে। কে বলেই না—ভাগ্য গোণে ?

মা একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। দায়সারা গোছের জবাব দিল, ঠিক তা না···এ লোকাল ভুডু ম্যান।

পরে অ্যানজেলার কথায় নয়, ভুডু শব্দটা মায়ের মুখেই প্রথম শুনেছিলাম।

মা আর জেরা করার ফুরসত দিল না। সোফা ছেড়ে উঠে ঘরে চলে গেল। ভুডু বা ভুডুম্যান কি না বুঝলেও এটুকু অন্তত বুঝেছি জেরি রুবিন আমাকে নিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু রসিকতা করে গেল। মায়ের ঠোঁটের ফাঁকেও প্রশ্রয়ের হাসি দেখলাম। হঠাৎ সাত-আট বছর আগে চাঁপার মায়ের সেই সব অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের গল্প মনে পড়ে গেল—বাবার সেই রোগ সারানোর চেষ্টায় কত রকমের দৈবের পিছনে ঠাকুমা জ্যাঠা-জেঠি কাকা-কাকিমার তাগিদে মা-কে ছুটতে হয়েছিল। মা কি তাহলে সে-সব বুজরুকতে বিশ্বাস করে !

বাংলোটা আমার সত্যি ভারি ভালো লেগে গেল। পরপর তিনখানা বড় ঘর। ডান দিকের কোণের ঘরটা মায়ের। বাঁয়ের কোণের ঘরটাও দেখলাম বসার ঘরই। সেখানেও সুন্দর সোফা সেটি ডিভান পাতা। মাঝের ঘরটা মনে হয় খালিই পড়ে ছিল। শুনলাম এখন থেকে সেটা আমার ঘর। খাট, বিছানা ড্রেসিং টেবল আলমারি সব সুবিন্যস্ত করে সাজানো হয়ে গেছে। পিছনে ডাইনিং স্পেসে সুন্দর টেবিল চেয়ার পাতা। তার পাশে অ্যানজেলার ঘর। আর তার পাশে কিচেন। পিছন দিকে আবার খানিকটা খালি জমি।

সন্ধ্যার পর মায়ের সঙ্গে গল্প করতে বসে বললাম, তোমার বিজনেস তো বেশ ভালই চলছে মনে হচ্ছে—

মা খুশি মুখ করে বলেন, মন্দ না, কলকাতা থেকে আসার পথে বাহারাগোড়া ছাড়ালে আর পাম্পিং স্টেশন নেই—আমারটাই প্রথম। এখন তুই এলি, আরো ভালো চলবে আশা করি—জেরিটা এত কাজের আর এত বুদ্ধি ধরে, কিন্তু একেবারে ইরেসপনসিবল।

নিন্দা সত্ত্বেও স্নেহের সুরই বেশি বাজল। জিগ্যেস করলাম, সে-ও কি তোমার ওখানে কাজ করছে নাকি ?

—কাজ করছে মানে, ও-কি কম সাহায্য করছে আমাকে—এই লাইসেন্স পাওয়ার

আগে বিহারের গভমেন্ট লেভেলে যত ধরাধরি আর হবনবিং তো সব ওকে নিয়েই—ছেলেটা কথার জাদু জানে—আর রবার্ট মারা যাবার পর থেকে তো ও-ই আমার ভরসা। কেবল একটা দোষ, কাজ নিয়ে ডুবে গেল তো গেল—তখন নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান নেই—আবার যখন উধাও হল,সাত দিনের মধ্যে আর টিকির দেখা নেই। আর ভীষণ খরচে, রবার্ট মারা যাবার পর আমার সঙ্গে সব দেখাশুনা করছে বলে জোর করেই একরকম ওর হাতে আমি মাসে হাজার টাকা করে গুঁজে দিচ্ছি—কিন্তু ও টাকা ফুঁকে দিতে ওর সাতটা দিনও লাগে না। মুখ কাঁচুমাচু করে ইদানীং প্রায়ই বলে, মা কিছু ধার দেবে। ও-রকম করে বললে না দিয়ে পারা যায়! কিন্তু মাসের শেষে ধারের ব্যাপার ভুলে বসে থাকে, পুরো টাকা হাতে পেয়ে ধার শোধ করার কথা মনেও পড়ে না। উল্টে ক'দিন না যেতে আবার ধারের জন্য হাত পাতে। সেদিন আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছি—কিন্তু ওকে ধমকানো আর পাথরে ঘা মারা এক ব্যাপার।

মা হাসছে। এই হাসিতেও নির্ভেজাল খুশির প্রশ্রয়। একটু পরই উৎসুক। প্রশ্ন, তা এই একদিনে ছেলেটাকে কেমন লাগল তোর?

আমিও হেসেই পাল্টা বললাম, একটা দিন কি লাগালাগির মতো লম্বা সময়?

আমার নিজের ভিতরেই যে চিড় ধরেছে মা যেন তা বুঝতেই পারছে। পরিতৃষ্ট মুখ। তা ঠিক। আমি তোকে বায়াস করতে চাই না—নিজেই দেখে শুনে বুঝে নে···জামসেদপুরে যাকে একটু-আধটু মনে ধরেছিস তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নে।

কথাগুলো মোলায়েম হলেও অবধারিত চ্যালেঞ্জ জেতার মতো। চকিতে ব্যাণ্ডার মুখখানা চোখের সামনে ভাসল। পাশাপাশি জেরি রুবিনের মুখও। তার সমস্ত দিনের কথাবার্তা মায়ের সঙ্গে তার এমন আশ্চর্য সহজ আচরণ, দু'হাতে সুটকেস আর দাঁতে করে বেডিং টেনে আনা, সর্বক্ষণের অদ্ভুত কচিকাঁচা হাসি, অমন শিস দেওয়া। নাঃ, ব্যাণ্ডোকে বিয়ে করবই পণ ধরলে সে আলাদা কথা, কিন্তু তুলনা করতে গেলে কোনো তুলনাই হয় না তা আমি একদিনেই বেশ অনুভব করছি।

মা আমাকে বায়াস করতে চায় না বলেও তার প্রসঙ্গই চালিয়ে গেল।—খাঁটি ইংরেজ নয় অবশ্য, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। লেখাপড়া আর অটো এঞ্জিনিয়ার হওয়া সব কলকাতা থেকে। তারপর বাউণ্ডুলের মতো এই বিহার চষে বেড়িয়েছে। চাকরি ধরে আর ছাড়ে। রিটায়ারমেন্টের আগে আগে রবার্ট ওর চেহারা দেখে আর পনের মিনিট কথা বলেই এক-গাদা লোককে ছেঁটে দিয়ে ওকে ইম্পাত কারখানার চাকরিতে নিয়ে নিয়েছিল। মোটা মাইনে পেলে কি হবে, রবার্ট থাকতেই ওর নামে নালিশের পর নালিশ—কাজে মন নেই, না জানিয়ে কামাই করে।। রবার্ট রিটায়ার করার দু' মাসের মধ্যে ওরও চাকরি গেল। চাকরি খুইয়ে জামসেদপুর থেকে সোজা তার কাছে ঘাটশীলায় এসে হাজির। আবার তদ্বির তদারক করে রবার্ট সৌ মৌভাণ্ডারের কপার করপোরেশনে ঢোকালো—ভালো অটো এঞ্জিনিয়ারের চাহিদা তো সর্বত্র। কিন্তু এই বাউণ্ডুলের তা-ও বেশি দিন ভালো লাগল না—চাল নেই চুলো নেই নিজে ব্যবসা ফেঁদে বসবে বলে এ



চাকরিও ছেড়ে বসল। কিন্তু এই পাম্পিং স্টেশান করার আগে ছেলেটা আমাদের জন্যে করলে বটে। আর কিরকম ট্যালেন্ট জানিস? কলকাতায় থাকতে বাংলা ভালোই শিখেছিল, তারপর এত বছর বিহারে ঘুরে ঘুরে আর উঁচু নিচু সকলের সঙ্গে মিশে মিশে এখন হিন্দী আর সাঁওতালি ভাষায় পর্যন্ত মুখে কথার খই ফোটে।

নিন্দার আড়ালে প্রশংসার এই বিজ্ঞাপন শুনতে একটুও খারাপ লাগছিল না। কান পেতে শুনছিলাম।

পরদিন থেকে মায়ের সঙ্গে আমিও দেকানে গেছি। মেটালের বড় বড় হরপে দোকানের নাম লিলি পাম্পিং স্টেশান দেখে বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। নিজের নামটার প্রতি এই প্রথম বোধহয় দারুণ শ্রদ্ধা হয়েছিল। আর এটুকু থেকেই মা যে ভিতরে ভিতরে কত ভালবাসে তা-ও অনুভব করছিলাম।

দোকানে সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত জেরি রুবিনও ছিল। আমাকে কাজ বুঝিয়েছে। তখন কাজ বলতে গেলে গাড়ি এলে পেট্রল বা ডিজেল দেওয়া। সেটা দুটো ছোকরা করে, আবার জেরিও হাত লাগায়। ক্যাশমেমো লেখা, দুই একটিন মবিল, গীয়ার অয়েল বা ব্রেক অয়েল বিক্রী করা। পরের এই পাঁচ বছরে গাড়ি সার্ভিসিং ইউনিট আর পার্টস বিক্রীর দোকান সাজানো সব আমার একার কৃতিত্ব। মা তার পেট্রল ডিজেল মবিল বিক্রির লাভ নিয়েই খুশি ছিল। ব্যাঙ্কের টাকা খসিয়ে ব্যবসা বাড়ানোর ব্যাপারে খুঁতখুতুনি ছিল। বলত, লাভ তো বাড়তে পারে বুঝি, কিন্তু এত দেখাশুনা করে কে।

মায়ের কথা কানে নিইন। একটা বছর না যেতে নিজের ওপর প্রচুর আস্থা। আগে গাড়ি সার্ভিসিং চালু করেছি। এ-ব্যাপারে মৌভাণ্ডারের গ্যারাজ ইউনিট খুব সাহায্য করেছে। তাদের আগ্রহের কারণ, করপোরেশনেরও নিজস্ব গাড়ি সার্ভিসিংএর ব্যবস্থা নেই। আর এই দুবছর হল পার্টস বিক্রীর দোকান বসানো হয়েছে। মা ভাবতেও পারেনি তার মূলধন এত তাড়াতাড়ি উঠে আসবে।

পাঁচটা বছর পাড়ি দেবার আগে সেই গোড়ার প্রসঙ্গ। প্রথম দিনের কাজ শেষ হতে জেরি নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে আমাকে বাংলোয় পৌঁছে দিল। ও গাড়ি নিয়ে ফিরে গেলে মা রাতে আসবে। কিন্তু মা নিজে ড্রাইভ করে ফিরল রাত প্রায় দশটার পরে। বেশ রাগ রাগ মুখ। আমি তার অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বারান্দায় উঠেই মা চাপা গলায় গজগজ করে উঠল, ছেলেটার সব ভালো, কেবল এতটুকু সময়-জ্ঞান আর ডিসিপ্লিন জ্ঞান যদি থাকত—খুব বকেছি আজ।

বকার কারণ আমাকে বাংলোয় নামিয়ে দিয়ে জেরি রুবিন গাড়ি নিয়ে নিপাত্তা। মাত্র মিনিট কুড়ি আগে ফিরেছে। ভাবলাম বাংলোয় বসে তোর সঙ্গেই আড্ডা দিচ্ছে, তা না, নিজেই বলল আজও রামদেও মাহাতোর আড্ডায় গেছল বলে ফিরতে দেরি।

নামটা শুনে আমি উৎসুক একটু। জেরির গতকালের কথা মনে পড়ল, বলেছিল, জ্যোতিষী নিজের ভাগ্য নিজে গোণে না। বিশ্বাস করি বা না করি ভাগ্যের ফলাফল সম্পর্কে কার না কৌতূহল। কিন্তু সকাল থেকে দোকান নিয়ে এমন আনন্দ আর

উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে যে গতকালের কথা মনেই ছিল না। নইলে হয়তো ঠাট্টাই করে বসতাম, তার ভাগ্য গণনার ফল কি দাঁড়ালো। মা-ও আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ভিতরে চলে গেল।

···পরের দিন জেরি রুবিনের আর টিকির দেখা নেই। নিজের অগোচরেই তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। গতকালই লক্ষ্য করেছি লোকটা থাকলে দোকানের হাওয়া বেশ সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু বেলা বারোটা পর্যন্ত এলো না দেখে মা-কে জিগ্যেস করলাম, জেরি রুবিনকে হাজার টাকা করে দাও বলছিলে, সে রোজ আসে না ?

—সেই তো সারাক্ষণ হাল ধরে থাকে দোকানের, আজ আবার কি হল কে জানে !

ভাবলাম লাঞ্চের পরে এসে ওকে দোকানে দেখব। কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, তার দেখা নেই। মায়ের বিরক্তি আবার দুশ্চিন্তাও। কিছু হলটল কি-না কে জানে।

জিগ্যেস করলাম, কাল তোমার বকুনি খেয়ে রেগে যায়নি তো ?

মা হাসল।—আমার ওপর রেগে যাবে ! আমাকে মাদার-মাদার করে শুনিস নি ? বকুনি ছেড়ে কতদিন আমি থাপ্পড় দেব বলে হাত পর্যন্ত তুলেছি—ওছেলের রাগ-টাগ নেই।

পরদিনও জেরি রুবিন এলো না। তারপর দিনও না !

—আমি বললাম, অসুখ বিসুখ করল না তো ? থাকে কোথায় ?

শুনলাম এখানে একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আছে, নাম প্রসাদ গুপ্তা, পাথরের বাসন আর আসবাবপত্র চালান দিয়ে অনেক টাকা করেছে—তার বাংলোর লাগোয়া দুঘরের একটা আউট-হাউস আছে, বলতে গেলে বিনা ভাড়ায় সেটা সে জেরি রুবিনকে ছেড়ে দিয়েছে। মায়ের মন্তব্য, ছেলেটাকে ভালো তো সকলেই বাসে···যখন যার জন্য করে প্রাণ দিয়েই করে।

সেই ছেলের পর পর তিন দিন দেখা নেই। মায়ের দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। রাতে একটু আগেই আমাকে নিয়ে দোকান থেকে বেরুলো। গাড়ি একটা বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকতে শুনলাম সামনের ওই বাংলোটাই প্রসাম গুপ্তার। গাড়ি থামার শব্দে তার স্ত্রী মালা গুপ্তা বেরিয়ে এলো। গাড়ি থেকে মায়ের সঙ্গে আমাকে নামতে দেখে হাসি মুখে সাদর অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো।

আমাকে আর একটু ভালো করে দেখে নিয়ে সপ্রশংস উচ্ছ্বাসে মায়ের দিকে ফিরল। বাঃ ! আপনার মেয়ে লিলি লিশ্চয় ? কবে এলো ? মা এখন ভালোই হিন্দী বলতে পারে, কিন্তু কথাবার্তা ইংরেজিতে।

—দিন তিনেক···

—তিন দিন ! আর এর মধ্যে আপনি আমাকে ফোনেও একটা খবর দিলেন না ?

—সময় পেলাম কখন, দোকান নিয়ে হিমসিম, তিন দিন ধরে জেরির দেখা নেই—কি হয়েছে বলো তো ?



মালা গুপ্তাকেও অবাক মনে হল একটু। বারান্দার কোণের দিকে চলে গিয়ে বাইরের অন্ধকারে নজর করে কিছু দেখতে বা বুঝতে চেষ্টা করল। ফিরে এসে বলল, তার ঘরে তো আলো জ্বলছে না, ঘর তালাবন্ধ মনে হচ্ছে। আমি তো কিছু খবর রাখি না···বসুন, বেয়ারাকে ডেকে খবর নিচ্ছি—

মা বলল, তিন দিনের মধ্যে তোমার সঙ্গেও দেখা হয়নি ?

মালা গুপ্তা হেসেই জবাব দিল, তিরিশ দিনের মধ্যেও হয়েছে কিনা সন্দেহ, আমি তো বিকেল হলেই গাড়ি নিয়ে ঘাটশীলার ক্লাবে চলে যাই—তার ওপর কর্তা বিহারে বিজনেস ট্যুরে গেছে, এই তো খানিক আগে ফিরলাম।

আমার হাত ধরে একটা সোফায় টেনে বসালো।—তুমি এখানে আসছ তোমার মায়ের মুখে শুনেছি, কিন্তু তুমি যে এত সুন্দর সেটা উনি বলেননি—কি দেব, চা না কফি ?

মা সোফায় সবে বসেছিল, তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো। —এত রাতে কিছু না, ডিনারের সময় পেরিয়ে গেছে—বেয়ারাকে ডেকে তুমি ছেলেটার একটু খবর নাও চট্ করে।

আমাদের সামনেই বেয়ারাকে ডাকা হল। জিগ্যেস করতে ও জানান দিল, জেরি সাহেবকে তিনদিনের মধ্যেও তার ঘরে দেখেনি, দরজায় তালা ঝুলছে।

মালা গুপ্তা আমাদের সঙ্গে বারান্দা থেকে নেমে গাড়ি পর্যন্ত এলো। এর মধ্যে আমাকে দু-তিন বার আবার আসার আমন্ত্রণ জানালো। আর হেসে বলল, তুমি এবারে বিএ পরীক্ষা দিয়ে এলে, আর আমি দু বছর হয়ে গেল বিএ পাশই করেছি···বয়েসে কিছু বড় হলেও এখন থেকে তুমি আমার গুড ফ্রেণ্ড, এমন জায়গা যে এখানে এক তোমার মা ছাড়া আর মেলা-মেশার মতোও কেউ নেই।

শিগগীরই আবার দেখা হবে কথা দিয়ে গাড়িতে উঠলাম। কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে মায়ের একই মুখে মালা গুপ্তার নিন্দা আর প্রশংসা। নিন্দা, এখানে এসেও জেরির কোনো হদিস পেল না বলে। চাপা ঝাঁঝে বলল, খুব বড়লোকের বউ হয়েছে, তিন-তিনটে দিন একটা ছেলের ঘরে তালা ঝুলছে চোখেই পড়ল না !

আমার কিন্তু মন্দ লাগেনি মেয়েটাকে। আমার চেহারার খুব প্রশংসা করল বটে, কিন্তু নিজেও সুশ্রী। জিগ্যেস করলাম, টাকার খুব দেমাক বুঝি ?

—না দেমাক হবে কেন, এমনিতে বেশ ভালো মেয়ে···তবে ঘাটশীলার ক্লাব নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি করে—টাকা ঢালতে পারলে বেশি কদর হবে না কেন। আর মেয়েটাই বা দিন-রাত ঘরে বসে করবে কি, প্রসাদ গুপ্তা তো কম করে মাসের মধ্যে পনের দিন বিজনেস-টুরে বাইরে বাইরে চলে যায়। একদিন তো আমার সামনেই হাসব্যাণ্ডকে একহাত নিল, রাগ দেখিয়ে বলল, তোমার এগেনসটে বায়গেমির চার্জ আনব—আমার আগে তুমি তোমার বিজনেসকে বিয়ে করে বসে আছ !

রসিকতাটুকু ভালো লাগল। —ওদের হালে বিয়ে হয়েছে নাকি ?

—হালে কি, তিন বছর হতে চলল, বি-এ পরীক্ষার আগে বিয়ে হয়েছিল···প্রসাদের পড়াশুনার দৌড় বেশি না, বয়েসেও কম করে পনের বছরের বড়···কিন্তু টাকার জোর

থাকলে অনেক ঘাটতি পুষিয়ে যায়···তবে মেয়েটা ভালো, খুব সেবা-যত্ন করে, প্রসাদ তো বউয়ের গুণে মুগ্ধ একেবারে।

পরদিন জেরি রুবিন লাঞ্চের পরে এসে হাজির। চোখেমুখে সেই কচি-কাঁচা দুষ্টু দুষ্টু হাসি। ওকে দেখেই মায়ের মুখ যতটা সম্ভব গুরু-গম্ভীর। —এই সাড়ে তিনদিন কোন্ চুলোয় ছিলে ?

—বাঃ, রাগের কি হল ! তোমার মেয়ে এসে গেছে আমার তো ছুটি এখন !

—আমি তোমাকে বলেছি, মেয়ে এসে গেলে তোমার ছুটি ?

—ইয়ে, আমি তাই ধরে নিয়েছিলাম···।

বুড়ো ক্যাশিয়ারের (বৃন্দা অনেক পরে এসেছে) সামনেই মা আরো জোরে ধমকে উঠল, আমি কোনো বাজে কথা শুনতে চাই না—এ-ক'দিন কোথায় ছিলে ?

জেরি রুবিনের দিকে চেয়ে আমার মজাই লাগছে। কাঁচুমাচু মুখ, কিন্তু দুষ্টুমিতে ভরা। মাথা চুলকে জবাব দিল, দেওকী নারাঙ্-এর ডেরায়।

শুনে রাগ ভুলে মা প্রথমে যেন আঁতকেই উঠল। —দেওকী নারাঙ্ ! তিনদিন তিন রাত তার কাছে কাটিয়ে এলে ?

জবাব নেই। হাসছে।

রাগ সত্ত্বেও মায়ের উতলা মুখ লক্ষ্য করছি। —তুমি তার ডেরায় ছিলে রামদেও জানতে পারবে না ?

রামদেও নামটা শোনা, কে আবার দেওকী নারাঙ্ জানি না। জেরি বলল, জানলেই বা, আমি কারো কাছে দাসখত লিখে দিয়েছি নাকি !

মায়ের গলার স্বরও এবারে ঠাণ্ডা গোছের কঠিন। —আমি তোমাকে দেওকী নারাঙ্-এর কাছে ঘেঁষতে নিষেধ করেছি কিনা ?

কিন্তু জেরি রুবিনের মুখে হাসি লেগেই আছে। মা-কে আশ্বস্ত করার মতো করে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছ কেন মাদার, রামদেও মাহাতো ধরেই নেবে আমি তার হয়ে স্পাই-ইং করতে গেছলাম, আমি কি এত বোকা ! তবে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি, দেওকী নারাঙ্ তার এককালের গুরুর থেকে ঢের বেশি সেয়ানা—ও তাকে টপকে যাবেই।

এবারে কিছুটা বোধগম্য হল দেওকী নারাঙ্ লোকটা কে হতে পারে। আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাক, মা আরো বেশি ঝাঁঝিয়ে উঠল, তোমার মতামত কে জানতে চেয়েছে—তুমি এ-সবে মাথা গলাচ্ছ কেন ?

—বা রে ! আমি তো ওদের দুজনকেই একদিন ঘোল খাইয়ে ছাড়ব—মাথা না গলালে চলবে কেন ! মায়ের রাগ বা দুশ্চিন্তা ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার মতো করে হাসল (শব্দ না করে), তারপরেই মুখখানা কাঁচুমাচু আবার। —কিন্তু মাদার, একটু মুশকিলে পড়ে গেছি যে, আমার এ-মাসের টাকাটা যদি আগাম দিয়ে দিতে—খুব দরকার হয়ে পড়েছে।



মা খেঁকিয়ে উঠল, এক পয়সাও পাবে না, তুমি টাকা ওড়াচ্ছ আর ওদের পিছনেও ঢালছ !

এমন নির্দ্বিধায় টাকা চেয়ে বসতে দেখে আমি অবাক একটু। ফোড়ন কাটার সুরে বললাম, আমি আসাতে ছুটি হয়ে গেছে ধরে নিলে আবার আগাম টাকার কথা আসে কি করে !

তেমনি শব্দ না করে হেসে উঠল। —ব্যস ! এ দেখি মায়ের ওপর দিয়ে যায়। প্লীজ, বাগড়া দিও না, টাকাটা এক্ষুনি খুব দরকার, কাল থেকে ঘড়ির কাঁটা ধরে দোকানে আসবো—মাদার, প্লীজ্, হারি আপ !

আমি বেশ অবাক হয়েই দেখলাম, রাগত মুখে মা হ্যাঁচকা টানে ড্রয়ার খুলে চেকবই বার করল। জেরি রুবিন তাই দেখেই হাঁ-হাঁ করে উঠল, ওয়েট মাদার, ওয়েট ! বুড়ো ক্যাশিয়ারের দিকে ফিরল, জনাব আপকো স্ট্রং -রুমমে ক্যাশ কেতনা হ্যায়— !

ভদ্রলোকের বিড়ম্বনার একশেষ যেন। বিব্রত মুখে মায়ের দিকে তাকালো।

তখন পর্যন্ত ওই স্ট্রং-রুম অর্থাৎ পার্টিশন করা চিলতে ঘরে লোহার সিন্দুকটাই শুধু ছিল। ক্যাশ টাকা সব রাতে নিয়ে গিয়ে মা বাড়ির আলমারীর লকারে রাখত। দু-তিন দিন অন্তর একদিন ব্যাঙ্কে রেখে আসা হত। ম্যানেজারের ওই মুখের দিকে চেয়ে জেরি রুবিন বলে উঠল, থাক, বলতে হবে না বুঝে নিয়েছি। মাদার, প্লীজ ! আই ওয়ান্ট ক্যাশ—

মায়ের আবার হালছাড়া রাগের অভিব্যক্তি। ক্যাশিয়ারের দিকে চেয়ে একবার মাথা ঝাপটা মারল। অর্থাৎ দিয়ে দাও।

টাকা নিয়ে মনের আনন্দে চলে গেল।

রাতে খেতে বসে মা-কে বললাম, রামদেও মাহাতো, দেওকী নারাঙ্—এ-সব কি মা ? বাবা মারা যাবার পরেও এ-সবে তুমি বিশ্বাস করো !

মা দেখলাম এ-প্রসঙ্গ পছন্দই করে না। বিড়বিড় করে বলল, সকলের বেলায় সব করা সম্ভব হলে কোনো মানুষই আর মরত না, দুনিয়ায় কত লোকের কত রকমের সাইকিক পাওয়ার আছে তুই জানিস না আমি জানি।

পরে অ্যানজেলার মুখে শুনেছি, জেরি সাহেব মা-কেও রামদেও মাহাতোর ডেরায় নিয়ে গেছল, সে মা-কে বলে দিয়েছিল অনেক বড় লোক হবে—আর বলেছিল, পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবসায় মায়ের অনেক টাকা হবে—তখন সবে চেষ্টা চলছে, লাইসেন্স হয়নি। মায়ের মঙ্গলরে জন্য রামদেও মাহাতো কিছু কাজও করেছিল।

আমার ধারণা, জেরিই রামদেও মাহাতোকে বলে দিয়েছিল রবার্ট গারল্যাণ্ড আর মা পেট্রল-ডিজেলের লাইসেন্স পেতে চেষ্টা করছে।

পরের দিন জেরি সত্যি সকালে তার সময় ধরে দোকানে এলো। আর সেই দিনই কথায় কথায় আমি তাকে বললাম, আমার গাড়ি চালানো শেখার কি হল ?

তক্ষুনি দারুণ উৎসাহ। —আজ থেকে শুরু হবে ?

—আজ না, রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমার ছুটি, রবিবার থেকে শুরু হবে।

গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে টের পেলাম, এত মিষ্টি মানুষটা পাজি কতবড়। প্রথম দিনই আমাকে নিজের সঙ্গে সাপটে নিয়ে বসালো। আমার হাতে স্টিয়ারিং ছাড়ল বটে, কিন্তু আমার পিঠের ওপর দিয়ে আর বাহুর তলা দিয়ে হাত চালিয়ে নিজেও স্টিয়ারিং ধরে রাখল। ব্রেক-শূ আর অ্যাকসেলেটারের ওপর থেকে থেকে দুজনারই পা।

খানিক বাদে আমি বললাম, গাড়ি চালানো শিখতে হলে এভাবেই শিখতে হয় নাকি ?

কি দুষ্টু কি দুষ্টু ! লাজুক লাজুক হেসে বলল তোমার অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে পারছি, বলো তো, স্টিটা একটু পিছিয়ে নিই, তুমিও সামনে কোলের কাছে বসলে স্টিয়ারিং ধরতে আর ব্রেক-অ্যাকসেলেটারে পা রাখতে অনেক সুবিধে হবে।

আমি রেগে গিয়ে ওর দিকে ঘাড় ঘোরাতে গালে গাল-মুখ ঘষে গেল। কিন্তু মেয়েটা আমিও ভেতরে ভেতরে বেপরোয়া। শিখবই গাড়ি চালানো। আমার আর কি, ও নিজেই তো ঘেমে উঠবে। গাড়ি চালানো শেখা বন্ধ হল না। অল্প অল্প করে ওর দৌড়াত্ম্যও বাড়তে থাকল। ভালো করে চালানোর সুবিধের জন্য আমাকে নিজের সঙ্গে সেঁটে ধরে, গালে গাল তো ঠেকেই আছে, কখনো বা আমার চালানোর দোষে বিরক্ত হয়ে আমার ডান-পাটা নিজের হাতে তুলে নিজের বাঁ-পায়ের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে হুকুম করে, ঠিকমতো অ্যাকসেলেটারে পা রাখো।

আমি শিক্ষার্থিনীর মতোই বাধ্য আর মনোযোগী। এর পরে দেখা গেল, থেকে থেকে ওর হাতও আমার বুকে ঠেকে যাচ্ছে। আমাকে শেখানোর ব্যাপারে এত উৎসাহ যে খুব ভোরের দু ঘন্টার এই মহড়ায় একদিনও কামাই নেই। অথচ ফাঁক পেলেই দোকান থেকে ডুব। মা রাগ করলে উল্টে বলে, কত ডিউটি করব, তোমার মেয়েকে ড্রাউভিং শেখাচ্ছি না !

···সেদিন ওর হাত আর কনুই বড় ঘন ঘন বুকে ঠেকছিল। হঠাৎই ব্রেক কষে গাড়িটা থামিয়ে দিলাম। ওর পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে চার আঙুল সরে বসে (নইলে ওর গালে মুখ ঠেকে যাবে) সোজা ঘুরে তাকালাম !

—কি হল ? খুব অবাক যেন।

—আমার আর কি হবে ? তুমিই অ্যাক্সিডেন্ট করবে।

হাসতে লাগল। —আমার হাত দেখে কি মনে হয়, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ?

—যে-ভাবে বাড়ছ তাতে হাত খুব বশে থাকবে না, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে।

শব্দ না করে হাসছে।—তোমার ভয় করছে ?

—না। তোমাকে সাবধান করছি।

হাসতেই লাগল। —আমাকে তাহলে এখনো ঠিক বুঝতে পারোনি, তুমি আপত্তি না করলে এর থেকে ঢের বেশি কসরত দেখিয়েও তোমাকে গাড়ি চালানো শেখাতে পারি।



ইচ্ছে করল, গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে এ-কথার জবাব দিই।

রাগ হোক আর যা-ই হোক, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সকালের এই দুটো ঘণ্টার জন্য আমি লালায়িত হয়ে থাকি। দুটো ঘণ্টা কোথা থেকে কেটে যায় টেরও পাই না। বিকেল আর সন্ধ্যার দিকে চালানোর নেশায় বাড়ির কাছা-কাছি গাড়ি নিয়ে খানিকক্ষণ করে ঘুরি। ওকে বাদ দিলেও এখন হাত রপ্ত হতে পারে এ-বিশ্বাস আছে। কিন্তু ওর আসতে দু মিনিট দেরি হলে আমার মেজাজ চড়তে থাকে। ···আর এ-ও স্বীকার করতে হবে, জামসেদপুরে সরোজ ব্যাগুে নামে হিউম পাইপের একজন এ পি আর ও আমার জন্য হা-পিত্যেশে দিন গুণছে দিনান্তে তা মনেও পড়ে না।

যাক, গায়ের সঙ্গে সেঁটে বসার দিন গেল। কুনুইয়ের ধাক্কায় আমিই সরিয়ে দিই। ও সখেদে বলে, এত তাড়াতাড়ি এতটা হাত রপ্ত হওয়া আমার পছন্দ নয়।

জবাবে আমি হাসি। আবার নিজের ওপরেই রাগ হয়। ···ইদানীং এই ফারাকটুকু নিজেরও আমার পছন্দ নয়।

একমাসের মাথায় খুব ভোরে ওই গাড়িতেই আমাকে জামসেদপুর নিয়ে চলল। মোটর ভেহিক্‌ল্‌স-এ টেষ্ট। উতরোলে লাইসেন্স পাব। উতরে যাব আমার কোনো সন্দেহ নেই। নিজেই চালিয়ে এলাম।. জেরি রুবিন পাশে বসে।

কিন্তু পরীক্ষাটা একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার। একটু-আধটু ভুলচুক করেই ফেললাম। পরীক্ষক অর্থাৎ সারজেন্ট ভদ্রলোক শুধরে দিল। ড্রাইভিং টেস্ট শেষ হতে আমি কটাক্ষবানে তাকে বিদ্ধ করলাম। বললাম, টিকিলি থেকে নিজে ড্রাইভ করে আসছি, কিন্তু আপনার পরীক্ষার মুখে পড়ে একটু-আধটু নার্ভাস হয়ে গেলাম।

সার্জেন্ট কৃতার্থ হয়ে বলল, না, না, চমৎকার চালিয়েছেন।

ওরালেও সে আমার কোনো খুঁত ধরল না। একবারে পাস।

ফিরতি পথে জেরি রুবিন গাড়ি চালাচ্ছে। চালাচ্ছে আর নিজের মনে হাসছে। ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলাম, পাশ করলাম তাতে হাসির কি আছে, তুমি কি ভেবেছিলে ফেল করব ?

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ফেল করার কথা, ওই সার্জেন্টের চরিত্রখানা আমার মতো বলেই পাশ করে গেলে—আমি সঙ্গে না থাকলে ব্যাটা ঠিক ঘুষ চেয়ে বসত।

—চাইলে দিতাম। টাকা তো কিছু সঙ্গে ছিলই।

—তোমার কাছে টাকার ঘুষ চাইত কোন্ আহাম্মক, অন্য ঘুষ···

ঘুরে বসে জোরেই ওর মাথায় একটা চাঁটি বসিয়ে দিলাম।

জেরি রুবিন গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাতে লাগল। মাঝামাঝি পথ এসে একটা মস্ত শালগাছের ছায়ায় গাড়িটা থামালো। দুপুরের রোদ্দুরে দুজনারই মুখ লাল। আমি ভাবলাম, এন্‌জিন গরম হয়ে গেছে বলেই গাড়িটা গাছের ছায়ায় থামালো।

স্টিয়ারিং ছেড়ে আমার দিকে একটু সরে এসে ঘুরে তাকালো। ঠোঁটের আর চোখের দুষ্টু হাসি দেখে বুঝলাম গাড়ি থামানোর পিছনে অন্য মতলব আছে। আমিও একটু ঘুরে

সোজা তাকালাম। ওই লোকের দু' চোখ আমার মুখ থেকে বুক হয়ে কোমরে নেমে এলো, তেমনি আস্তে আস্তে আবার মুখে উঠে এলো। আমি চেয়েই আছি, সাহসের দৌড় দেখছি।

কিন্তু ওই লোক তাড়াহুড়ো না করে উল্টে যেন আমাকেই প্রস্তুত হবার সুযোগ দিচ্ছে। আরো সরে এলো। হাত দুটো আমার দুই বাহুর তলা দিয়ে ধীরেসুস্থে পিঠে আশ্রয় নিল। নিবিড় করে টেনে নিল। আমি তার বুকের ওপর। দুষ্টুমি-ছোঁয়া ঠোঁট দুটো আমার মুখের ওপর নেমে এলো।

আমার মতলব ছিল ঠিক সময়ে একটা প্রবল ধাক্কায় এমন ঠেলে দেব যাতে মাথাটা ওদিকের দরজায় ঠুকে যায়। কিন্তু বাহুর নিচ দিয়ে হাত দুটো আমার পিঠের ওপর নিবিড় হবার পর জামার ওপর দিয়ে দশ আঙুলের কারসাজিতে আমার ভিতরের একটা সুপ্ত তাগিদের যেন মূল ধরে নাড়া দিতে লাগল। ...উষ্ণ ঘন অধর স্পর্শের এই নিবিড় অনুভূতিও পাগল করার মতো। আমি স্থান-কাল ভুলে যেতে লাগলাম। ...মুখ এক মুহূর্তের জন্যও তুলল না, ঠোঁট দাঁত জিভের সুস্থির অথচ গভীর স্পর্শ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে, একটা হাত পিঠের ওপর থেকে উঠে এসে সর্বাঙ্গে নড়েচড়ে আমারই অগোচর-বাসনার স্থানগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

...আমার দম বন্ধ হবার পর ও আমাকে ছাড়বে কিনা জানি না।

ছাড়ল। সোজা হয়ে আস্তে স্টিয়ারিং-এর দিকে সরে গেল। চেয়ে আছে। শুধু চোখে নয়, দুই ঠোঁটের কৌতুক টসটস করছে।

নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। সামনে আর আশপাশের চারদিক একবার দেখে নিলাম। একদিকের মাঠে কতগুলো গোরু চড়ে বেড়াচ্ছে। দূরের গাছতলায় শুয়ে একটা লোক ঘুমোচ্ছে। একটা অল্প স্পিডের অ্যামব্যাসাডার পাশ কাটালো। দ্বিতীয় আরোহী নেই, চালক ভদ্রলোক আমার মুখের ওপর মজাদার হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গেল।

আমাদের গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। স্পিড বাড়ছে। মিনিট দুই বাদে আস্তে আস্তে পাশের দিকে ফিরলাম। —এটা কি হল ?

ঘাড় ফেরালো না। ঠোঁটে সেই হাসি। জবাব দিল, তুমি লাইসেন্স পেলে, আমি গুরুদক্ষিণা নিলাম।

—আমি এমন দক্ষিণা দিতে রাজি কিনা ভেবেছিলে ?

ঠোঁটের ফাঁকে নিঃশব্দ মজাদার হাসি। —তুমি কতটা রাজি সে কি নিজে জানো ! ...জেরি রুবিনের এই একটা কথা আর ওই মিনিট কয়েকের আচরণ আমাকে সজাগ করেছে। মিথ্যে বড়াই করেনি। দক্ষিণা কি নেবে না নেবে সেটা আমার মর্জির ওপর নির্ভর করছে না সেটা সমস্ত সত্তা দিয়ে টের পেয়েছি বলেই বরদাস্ত করতে আপত্তি। এ-ও সত্যি, ওর দখলে একবার পড়ে গেলে আমি কতটা রাজি ওই আচরণের এক মুহূর্ত আগেও জানতাম না।

বাড়ি ফিরে সেই রাতেই একটা নাটক করলাম। বললাম, কথা আছে, রাতে এসো,



এখানেই ডিনার খেয়ে যাবে।

কথা আছে মানেই বড় প্রত্যাশা কিছু ধরে নিল। বেজায় খুশি হয়ে চলে গেল। এই ভুলটা করুক আমি চেয়েছিলাম। রাতে এলো। ফোন করে মাকে রাতের ডিনারের কথা জানিয়ে রেখেছিলাম। মা-ও তাড়াতাড়িই ফিরল। আনজেলা বিকেল থেকেই কিচেনে ব্যস্ত। ওকে বলেছি, রাত আটটার মধ্যে টেবিলে তিনজনের খাবার সাজিয়ে দিতে হবে।

মা কিছু একটা আঁচ করে খুশি। একফাঁকে আমাকে জিগ্যেস করল, লাইসেন্স পেলি বলে ডিনার নাকি তারপর কিছু বলবিও ?

মুচকি হেসে জানালাম, ঠিক ধরেছ, তারপর কিছু বলবও।

খোশ মেজাজেই ডিনার শেষ হল। তার মধ্যেই জেরি আমার লাইসেন্স পাওয়ার কথা তুলল। মা-কে বলল, ড্রাইভিং টেস্টে আমার ফেল করা উচিত ছিল——সার্জেন্ট ব্যাটা আমার হাসিতে ভুলে পাশ করিয়ে দিয়েছে।

মা জিগ্যেস করেছে, সত্যি নাকি রে ?

আমি হেসেই মাথা নেড়েছি, সত্যি। বলেছি, তা কি করব, ফেল করে এলে ভালো হত !

ডিনারের পর তিনজনে ড্রইংরুমে এসে বসেছি। অ্যানজেলা কফির ট্রে রেখে যেতে আমার ধীরস্থির নাটক শুরু। —বললাম, শোনো মা, আমার কিছু কথা আছে···আজ না বললেও চলত, কিন্তু তাতে জেরির ভুল বোঝার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে—

এ-ধরনের ভূমিকা মায়ের ঠিক বোধগম্য হল না। জেরি নিঃশব্দে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, কিন্তু সকৌতুকে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার বলার মধ্যে কোনো তাড়া নেই। কোনরকম উষ্মার ছিটেফোঁটাও নেই। বললাম, মা এটা ঠিক যে জেরির জন্যেই চটপট লাইসেন্সটা পেয়ে গেলাম···মুখের ধন্যবাদ ছাড়াও ওকে তোমার আরো কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

মা বিনা মন্তব্যে আমার দিকে চেয়ে আছে। এই প্রস্তাব করব বলে ডিনার, সেটা ভাবেনি। জেরি এখনো হাসছে। এই কথায় মুখ খুলল। —আমি এখানে কারো চাকরি করছি বলে ভাবি না।

—তা যদি না ভাবে তাহলে মা ধন্যবাদ জানিয়ে ওকে তুমি কাল থেকে ছুটি দিয়ে দিতে পারো—আমাদের আর সাহায্যের দরকার নেই, তোমাতে-আমাতে দোকানের কাজ চালিয়ে নিতে পারব, আর চাকরি ভাববে এমন লোকও জুটে যাবে।

অপ্রত্যাশিত রকমের ঘা খেয়ে জেরি রুবিন একটু অবাক যেন। মা হতভম্ব। —আজ লাইসেন্স পেলি তারপর হঠাৎ তোর কি হল ?

—হঠাৎ নয়, ওঁর অসভ্যতা দিনকে দিন বাড়ছিল। ...আজ লাইসেন্স পেলাম সেই আনন্দে ও লাইসেনশাস হয়ে উঠতে চেয়েছিল। ওকে বিয়ে করব কিনা তুমি বিবেচনা করতে বলেছিলে, সেই বিবেচনার গোড়ায় ও নিজেই আজ ঘা বসিয়েছে, আর বিবেচনার

দরকার আছে মনে হয় না।

চড় খেয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গিয়েও এক-একটা দুষ্টু ছেলে হাসতেই চেষ্টা করে। জেরির অনেকটা সেই মুখ।

মা আরো খানিকক্ষণ হতবাক। জেরির দিকে ফিরেন। —ইউ স্কাউন্ড্রেল—কি হয়েছে ?

—আ-আই অ্যাম সরি···আমি ভেবেছিলাম ও আমাকে পছন্দ করে···।

আমি ওর দিকে ফিরলাম। এবারেও গলা চড়ালাম না। —তুমি ভেবেছিলে ? তুমি ভাবলেই হয়ে গেল ?

ঠোঁটের কাঁচা হাসি এখনো সুন্দরই বটে। সপ্রতিভ জবাব দিল, সেখানেই মস্ত ভুল হয়ে গেছে দেখছি, আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি সরি···একবারের ভুলে এত কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত নয়, তোমার বিবেচনার রাস্তা এখনো ওপেন থাক···।

শুনে গোপনে নিজেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এই মুহূর্তে আমার মতো আত্মস্থ আর কে ? জবাব দেবার আগে অপলক চেয়ে রইলাম খানিক। —ঠিক আছে, ওপেন থাকতে পারে, কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, আমি কমিট করছি কিছু।

উঠে ঘর ছেড়ে চলে এলাম।

মা-কে বরাবর গম্ভীর দেখেই অভ্যস্ত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কখন খুশি আর কখন অখুশি বোঝা যায়। সকালে চা খেতে খেতে বার কয়েক আমাকে দেখল। তারপর সাদাসিধে মন্তব্য করল, আজকালকার পুরুষগুলিকে একটু-আধটু লাগামের মুখেই রাখতে হয়···তুই ভালোই করেছিস—

জিগ্যেস করলাম, আমি উঠে আসার পর আর কিছু বলল ?

—কি আর বলবে, আমার কাছে অ্যাপলোজেটিক বলল, সি ইজ ডিফারেন্ট, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

আর পাঁচটা মেয়ের থেকে বরাবরই একটু স্বতন্ত্র পথে চলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই লোকের পাশে পাশে থেকে সেটা সহজ নয় খুব। তাই এই আত্মসংযমের মহড়া। তাই নিজের চারদিকের নির্লিপ্ত সহজ অবরোধের আড়ালে বসে থাকা। হ্যাঁ, নির্লিপ্ত অথচ সহজ থাকতে পারাটাই আমার পরের পাঁচ মাসের প্রধান অস্ত্র। ও বেপরোয়া হয়ে উঠতে চাইলে আমি দ্বিগুণ নির্লিপ্ত, দ্বিগুণ সহজ। এটুকু বুঝেছি এই লোকের কাছে বিকিয়ে গেলে আমার হার। এই লোককে উল্টে পাগল করে তুলতে পারলে তবেই আমার জিত। ওকে এড়াতে চাইলে আমার দুর্বলতা ফাঁস। বরং সহজ মেলামেশার ফাঁকে ও এগোতে চাইলে হাসিমুখে মাথায় ডাণ্ডশ মেরে তফাতে হটালে আমার সত্তা নিরাপদ। পাঁচটা মাস যাবত তাই করছি। ওকে বিয়ে করব কিনা তা-ও ও নিশ্চিত জানে না।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি এই লোকের অন্তরঙ্গ নিবিড় সান্নিধ্যের জন্য কত লালায়িত সে আর দ্বিতীয় কে জানে ?



ছেড়ে দিয়ে নয়, তফাতে হটে নয়, ওকে প্রায় ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে রেখেই এই অবরোধের বেষ্টনী। বেশির ভাগ সময় এখন আমি গাড়ি চালাই। পাশে জেরি রুবিন। বেশ ঠাণ্ডা ছেলের মতো বসে থাকে। কখনো হাল্কা শিস দিয়ে ইংরেজি বা হিন্দী গানের সুর ভাঁজে। সেটা কান পেতে শোনার মতো। মাঝেসাজে নিজের ফর্মে আসতে চেষ্টা করে। বিনীত অনুমতি চায়, তোমার কাঁধে একটু হাত রাখতে পারি ?

আমি কখনো ভ্রূকুটি করি। কখনো হেসে অনুমতি দিই, পারো, কিন্তু খবরদার, আঙুল কথা কইবে না।

জেরিও হাসে। —আমার আঙুলগুলো কি কাঠের টুকরো, অবাধ্য হতে চাইলে ?

—আঙুল কাটা যাবে।

···দোকানে একসঙ্গে কাজ করি, মাঝে লাঞ্চ-ব্রেক ছাড়া সন্ধ্যার আগে দুজনের কারো ছুটি নেই। ও কামাই করলে কড়া কৈফিয়ত তলব করি। তবে কামাই এখন খুব করে না। ওই অবরোধই ওকে টানছে বুঝতে পারি। এখনো রবিবারের সকালটা দুজনারই ছুটি। সেই দিন সকালে গাড়ি নিয়ে বেরোই। আমি চালাই। পাশে জেরি রুবিন। সন্ধ্যার পর সেদিন দোকান থেকে বেরিয়ে ওকে পাশে নিয়ে সুবর্ণরেখার দিকে চলেছি। ও হঠাৎ বলে উঠল, আমাকে এখানে নামিয়ে দাও···

গাড়ির স্পিড কমিয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও বলল, সুবর্ণরেখার এদিকে নয়, উল্টো দিকে যাব—

—উল্টো দিকে কোথায় ?

তপতপে গলায় জেরি রুবিন জবাব দিল, রামদেও মাহাতোর ডেরায়—ব্যাটাচ্ছেলে একটা চীজ, ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

বিশ্বাস নেই, কিন্তু কৌতূহল আছে। কারণ, অ্যানজেলার মুখে এর মধ্যে আমি অনেক গল্প শুনেছি। দোকান করার আগে আর পরেও মা নাকি তার কাছে অনেক বার গেছে।

জিগ্যেস করলাম, রামদেও মাহাতো কি করেছে ?

—ভাঁওতা দিয়েছে। বলেছিল, আমার পিয়ারের লেড়কী হাতের মধ্যে এসেই গেছে—পাঁচ মাস কাটতে চলল তোমার দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। সেদিন রাগারাগি করতে ব্যাটা বলল, একশো রুপয়া মিলে তো তুমকো উনকি ছাতি পর চঢ়া দি—ভাবছি একশটা টাকা আজ দিয়ে দেব, আর বলব জল্‌দি কাজ না হলে ওকেই আমি খতম করে দেব।

সাদা কথায়, রামদেও মাহাতো বলেছে, একশ টাকা পেলে সে জেরিকে আমার বুকের ওপর তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কান গরম হলেও ওর মুখে এ-রকম কথা শুনে কিছুটা অভ্যস্ত। আজও মনে হল, রামদেও মাহাতোর নাম করে ও আমাকেই বাজিয়ে দেখছে।

সাঁওতাল পল্লী চিনি। এ ক'দিনে এ-দিকের সর্বত্রই ঘুরেছি। গাড়ি ঘুরিয়ে সেদিকে চললাম।

জেরি বলে উঠল, এ কি, তুমিও যাবে নাকি ?

—হ্যাঁ আমার সামনেই টাকাটা দাও, আর ওকে বলে দিও, ওর তুকতাকে পাঁচ মাস ছেড়ে পাঁচ বছরের মধ্যেও যদি আমার সাড়া পাও, তাহলে গুণেগুণে ওকে আমি আরও পাঁচশ' টাকা দেব।

জেরি শশব্যস্ত স্টিয়ারিং-এর ওপরে আমার হাতটা চেপে ধরল। —থাক থাক, আমার চ্যালেঞ্জ ও অ্যাকসেপ্ট করে কাজ নেই—আমি ওকে এক পয়সাও দেব না! গাড়ি ফেরাও—

ফেরালাম না। হেসে বললাম, চলো লোকটাকে দেখে আসি।

সাঁওতাল পল্লীর ঘরগুলো সব মাটির। বেশির ভাগই টিনের ছাদ, কিছু কিছু টালির। একেবারে শেষ মাথায় সুবর্ণরেখার কাছাকাছি রামদেওর ডেরা। হেড-লাইট জ্বালিয়ে চলেছি। সামনের দিকে চোখ রেখে জেরি বলে উঠল, থামাও তো একটু—

সামনে আমারও কিছু চোখে পড়েছে। কিন্তু কি ঠাওর করতে পারিনি। কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে দেখলাম, রাস্তায় একটা গলাকাটা মুরগী পড়ে আছে—মাথাটা দু' হাত তফাতে।

জেরি বলল, গাড়িটা একটু ব্যাক করো, তারপর ওটার ওপর দিয়ে নয়, পাশ কাটিয়ে যাও।

ব্যাক না করেও পাশ কাটানো গেল। জিগ্যেস করলাম ওটা কি ব্যাপার ?

—রামদেও মাহাতো কারো রোগ চালান দিচ্ছে, ওটার ওপর দিয়ে যে যাবে বা ছোঁবে তার হয়ে গেল।

আমি বলে উঠলাম, এ কখনো হয় নাকি—আর হলেও এটা কি ভালো কাজ—লেখাপড়া শিখেও তোমরা এর পিছনে ছোটো!

জেরি হেসেই জবাব দিল, দুনিয়ায় কত কি হয় না হয় লেখাপড়া জানা মানুষ কি সব জানে···। তবে এখানকার লোকেরা এ-সবে বেশ বিশ্বাস করে—তারা ভুল করেও ওই কাটা মুরগী বা তার মাথা ডিঙোবে না—গোরু ছাগলে যাবে, শেয়াল কুকুর বা পাশের জঙ্গলের জানোয়ারও টেনে নিতে পারে—রোগ ও-সবের কোনটার ওপর দিয়ে যাবে।

—যত সব বুজরুকি!

—তা বলতে পারো, আমিও ঠিক বিশ্বাস করি না। কিন্তু আশ্চর্য আশ্চর্য কাণ্ড ঘটতেও দেখেছি। তবে এরা ছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষই প্রেত-বিদ্যা আর বশীকরণ-সম্মোহন বিদ্যার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে—আমিও এগুলো নিয়েই স্টাডি করছি।

মুখে বললাম, তোমার মাথা করছ। কিন্তু মা-ও এর পিছনে ছুটেছে মনে হতে কৌতূহল বাড়ছে।

রামদেও মাহাতোর ডেরার সামনে বসে অনেকগুলো লোক জটলা করছে।



মেয়েছেলেও আছে। বেশির ভাগই অশিক্ষিত স্থানীয় লোক। রামদেও মাহাতোর ভক্ত হবে। কেউ কেউ হয়তো মুশকিল আশানের আশায় এসেছে। অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে বসার দরুন তিন-তিনটে লণ্ঠনেও কারো মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। গাড়িটা তাদের সামনে এসে থামতে সকলেই উৎসুক একটু।

জেরি রুবিন এবং সঙ্গে আমাকে দেখে অনেকেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। জেরি এদের পরিচিত বোঝা গেল। হাসিমুখে ও কারো হাত ধরল, কারো বা পিঠ চাপড়ালো। একজন ছুটে সামনের চালাঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। আবার তেমনি এসে আদর করে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। সাদা চামড়ার এই কদর স্বাভাবিক।

কিন্তু ভিতরে ঢুকে বেশ একটু ধাক্কা খেলাম। মাঝারি সাইজের ঘরের মেঝেতে দুটো হারিকেন জ্বলছে। বাঘ-ছালের ওপর বসা লোকটাই রামদেও মাহাতো। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়েস হবে। রোগা ঢ্যাঙা। কালো। মাথায় ঝাঁকড়া কাঁচা-পাকা চুল। বড় বড় লাল চোখ নেশায় ঢুলুঢুলু মনে হয়। তার পাশের জিনিসটাই ধাক্কা খাবার মতো। প্রথমে বুঝতেই পারিনি কি ওটা। ভালো করে লক্ষ্য করতে বোঝা গেল। দশ বারো কিলো ওজনের একটা বিরাট কুমড়োর ওপর সাদা রঙের কারিগরি চালিয়ে এই মূর্তি করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে দাঁত বার করা একটা বিরাট মুখ জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। সাদা রং দিয়ে মুখ চোখ নাক দাঁত এঁকে দেওয়া হয়েছে। নাকের দু পাশে দুটো বড় বড় ফুটো—সে দুটোই চোখ। হাঁ-করা মুখের গহ্বরে টকটকে লাল একটা ছোট বাল্‌ব ফিট্ করা—ভেতরের ব্যাটারি দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে চোখ জ্বলছে, বিকট দাঁত দেখা যাচ্ছে। তাকানোমাত্র একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি মগজে ধাক্কা দেয়।

রামদেও মাহাতোর সামনে তার কোনো খদ্দের বসে। দু'জনার মাঝে মেঝের ওপর সাদা খড়িতে একটা মূর্তি আঁকা। তার বুকে খড়িতে আঁকা একটা তীর বিঁধে আছে।

রামদেও মাহাতো মুখ তুলে একবারও আমাদের দিকে তাকালো না। কঠিন মনোযোগে খড়িতে আঁকা সামনের শরবিদ্ধ মূর্তিটা দেখছে। তারপর ফ্যাঁসফেসে গলায় বিড়বিড় করে বলল, ঘাবড়াও মাত্, দুষমন গুজর জায়গা। চলা যাও—

লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উঠে চলে গেল।

জেরি খুব অন্তরঙ্গজনের মতো রামদেও মাহাতোর গা-ঘেঁষে বসল। হেসে বলে উঠল, টাকা খরচ করে গুণ্ডার দল পুষছ, শত্রু খতম হবে বই কি!

জবাবে প্রথম ঢুলুঢুলু দুই রক্ত-চক্ষু টান করে জেরির ভিতর সুদ্ধু দেখে নিল লোকটা। কালো ঠোঁটের ভিতরটা অসম্ভব লাল। হেসে টেনে টেনে সেই অদ্ভুত ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, অ্যায়সা বিস্‌য়োয়াশ্—তব আতা কিউ ?

—আমি প্রাণের দায়ে, আঙুল তুলে আমাকে দেখলো, একে চিনতে পারছ ?

লোকটা আমার দিকে তাকালো। ···চেয়েই আছে। এ-কি অদ্ভুত তাকানো রে বাবা! মনে হল আমার হাড়-মাংস আলাদা করে করে দেখে নিচ্ছে। এই দেখার ধাক্কায় আমার

গা শিরশির করছে। হাসল একটু। —জরুর, আমাদের মেমসায়েবকা লেড়কী।

এতে অবাক হবার কিছু নেই, আমার কথা জেরির মুখে তো শুনেইছে। হাত বাড়িয়ে সামনের মেঝেটা দেখিয়ে মুখ আর সেই সঙ্গে গলার সুরও খুব কোমল করে বলল, বয়েঠ্ যাও বিটি, তুমার মাতাজীর দিল্ বহুত বড়া আছে—তুমাকে খুব পিয়ার করে। তুমি এলে হামার বড়া আনন্দ হলো—বয়েঠ যাও বাপ!

মেঝেতে বসব ভাবিনি। সত্যিই বসলাম।

লোকটা আবার বলল, তুমহারি মা খুব বালো আউরত্ আছে, লেকিন বহুত রোজ, ইধর আতি কিঁউ নহী?

হাসতে চেষ্টা করে বললাম, মা-কে বলব।

জেরি হঠাৎ তার চুলের ঝুঁটি ধরে কান-মাথা নিজের কাছে টেনে নিয়ে এলো। তারপর কানে কানে বলল কি। লোকটা নিজের মাথা টেনে নিয়ে সোজা আমার দিকে তাকালো। এবারে আমার হাড়-মাংস ডবল বিঁধে বিঁধে ওই দৃষ্টি যেন দেহের সর্বত্র ঘুরে বেরিয়ে একসময় আবার মুখের ওপর স্থির হল। জেরি রুবিন কি বলেছে আঁচ করতে পারি, কিন্তু এই লোকটা এ-ভাবে কি দেখছে! দেখা শেষ হল। তারপর ঠিক জেরির মতো করে চুল ধরে ওর মাথা-কান নিজের মুখের কাছে নিয়ে এলো। তারপর কানে কানে বলল কিছু।

আমি জেরির খুশি মুখ দেখলাম। আর আমার মুখের ওপর ওর হাসি-হাসি চোখ দুটোতে লোভ ঠিকরে পড়ছে দেখলাম।

আমাকে গম্ভীর দেখেই জেরি আত্মস্থ একটু। এক হাত বাড়িয়ে লোকটাকে ঠেলে দিয়ে বলল, এর সম্পর্কে কিছু বলো ওস্তাদ!

লাল দু'চোখ আবার আমার মুখের ওপর। তীক্ষ্ণ নয় এখন। আমেজছোঁয়া ঢুলুঢুলু। বলল, লেড়কী তেজী বহুত্, সুরত্ সে ভি দিল খুবসুরত্—উ তো আপনে জিন্দগীমে রানী বন্ জায়গী—

জেরি বলে উঠল, খেলে দেখছি, ও রানী হলে আমি কি হব?

—তুমি নোকুর হোবে, রানীর বালো লাগে তো পিয়ারকো নোকরিভি হো সাক্তে। আমার দিকেই চেয়ে আছে, ঢুলু ঢুলু লাল চোখে এখন হাসির ছটা।—তুমার নাম কি আছে বিটি?

—লিলি।

বিড়বিড় করে নামটা দু'তিনবার উচ্চারণ করল, পাশ থেকে খড়ির ডেলাটা নিয়ে মেঝেতে আঁকিবুকি করল একটু। তার ওপর ঝুঁকে বার দুই তিন ফুঁ দিল। তারপর লাল চোখ আরো বড় করে মুখের ওপর রাখল।—তুমার শিরপর রুপয়া কা বারিশ (টাকার বৃষ্টি) হোবে—বেওসামে লাখো লাখো রুপয়া তুমি বানাবে—তব্ দুশমনসে ভি মোলাকাত্ জরুর হোবে—লেকিন ডরো মাত্, রামদেও মাহ্তো চাহে তো উয়ো চুহা বন্ জায়গা। তুমাকে দেখে হামি বহুত্ খুশ—তুমার মাতাজীকে হামার সেলাম জানাবে।



এ কথার পর মনে হল এবার ওঠা উচিত। ওঠার ভঙ্গি করে জেরির দিকে তাকাতে সে-ও উঠল। ফেরার আগে জেরির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলাম, কিছু দিয়ে যেতে হবে?

জবাব শোনার আগেই প্রায় চমকে ফিরে তাকাতে হল। রামদেও মাহাতো বলছে, কুছু দিতে হোবে না খোকী, আভি কুছু দিতে হোবে না—ড্যাবডেবে লাল দুটো চোখ আমার মুখের ওপর—লেকিন কো-ই রোজ হামার কাছে তুমি কুছু মাঙ্তে আসবে, কুছু লিতে আসবে—তব্ দেনে কা টাইম হোবে।

হাসছে। আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কানে কানে জেরিকে এত ফিসফিস করে জিগ্যেস করেছিলাম যে ও ভালো করে শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু আমি পিছন ফেরা সত্ত্বেও ওই লোকটা তা ঠিক বুঝল কি করে!

গুমোট গরম থেকে বাইরের হাওয়ায় এসে হাঁফ ফেললাম। মনে হল কোনো মধ্যযুগীয় পরিবেশ থেকে বেরিয়ে নীল আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম। বাইরের লোকগুলোর কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা এসে গাড়িতে উঠলাম। জেরির ঢিমেতালে হাঁটাচলাও বিরক্তিকর।

চুপচাপ মিনিট কয়েক গাড়ি চালিয়ে বলে উঠলাম, ভুড়ু না ছাই, সব ভাঁওতাবাজী!

—হবে।... তোমার মায়ের সামনে যেন বোলো না, ভয়ে সিঁটিয়ে যাবে।

—তুমি ওর কানে কানে কি বলছিলে? আর আমাকে খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে ও-ই বা তোমার কানে কানে কি বলল?

দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরা, সামনে চোখ। তবু মনে হল ও হাসছে। একটু পরে জবাব দিল, আমি আমার ভাগ্যের কথাই জিগ্যেস করছিলাম—

ও কি বলল?

—তোমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে ও আমাকে উল্লুকা পাঠ্ঠে বলল।

হাসি পেয়ে গেছল।—কেন?

আর জবাব দিল না। একটু বাদে হাল্কা শিস্ কানে এলো। একটু একটু করে মিষ্টি সুরেলা হয়ে উঠতে লাগল। যেমনটা শুনলে এক একসময় আমার সমস্ত মনোযোগে ছেদ পড়ে—তেমনি।

প্রসাদ গুপ্তার বাংলোর সামনে গাড়ি থামাতে জেরি আর একটা হাল্কা শিস্‌ের সুর ধরে নেমে গেল। ওর এই নিরুচ্ছ্বাস আসা-যাওয়ার ভঙ্গিটুকু ভালো লাগে। আগে ফটক দিয়ে ঢুকে বাংলোর গায়েই ওকে নামিয়ে দিতাম। দেখা হয়ে গেলে মালা গুপ্তা সাদর অভ্যর্থনা করে। প্রসাদ গুপ্তা মানুষটা আরো অমায়িক। এত যে বড়লোক বোঝাই যায় না। জেরি বলে ভদ্রলোক কিপটে। খুব দরাজ কেবল বউয়ের বেলায়। বউটার ভাগ্য দেখে ওর নাকি ভদ্রলোকের বউ হতে ইচ্ছে করে। বউ যা বলে তাই করে, যেমন রাখে তেমনি থাকে। বউ যদি বলে তোমার সর্দি হয়েছে, প্রসাদ গুপ্তা চেষ্টা করে দু'তিনটে হাঁচি দিয়ে দেখাবে সত্যিই সর্দি হয়েছে। আমি আর ভিতরে ঢুকি না মালা গুপ্তার

জানোই। এমনিতে ভালো বেশ, কিন্তু বড় দেমাক। জেরি গায় মাখে না বলে, কিন্তু ওকে প্রায় অপমানই করে। আমাকে ডেকে নিয়ে বসায় কিন্তু জেরির দিকে তাকায়ও না। আমাকেই ডাকতে হয়, চলো, ডাকছেন যখন একটু বসে যাই।

একতরফা গল্পও করে কেবল আমার সঙ্গেই। গল্পের বিষয় ক্লাব নয়তো স্বামী। আমি একদিনও তার ক্লাবে গেলাম না বলে অভিযোগ। তারপর এ-জায়গার নিন্দা থেকে স্বামীর নিন্দা—অর্থাৎ পরোক্ষ প্রশংসা। ব্যবসায় যার এত পাকা মাথা অন্য সব ব্যাপারে সে এত নির্ভরশীল আর এত ছেলেমানুষ হয় কি করে, ইত্যাদি। এ-সব লোক যে কেন জ্বালাতে বিয়ে করে, ইত্যাদি। আর একটা মানুষ (জেরি) তার কথায় কান না দিয়ে অন্য দিকে চেয়ে মৃদু শিস্ দিচ্ছে দেখে এক-একবার ভুরু কোঁচকায়। আমাদের বাংলোয় এসেও মালা গুপ্তা জেরিকে বসা দেখলেও তাই—যেন চেনেই না। জেরিকে একদিন জিগ্যেস করেছিলাম, তোমার সঙ্গে মিসেস গুপ্তার এ-রকম ব্যবহার কেন, তুমি কি তার খাস তালুকের প্রজা?

জেরির ঠোঁটে সেই কাঁচা দুষ্টু হাসি।—বিনে ভাড়ায় তাদের বাড়ির আউট-হাউসে থাকি, ব্যবহার এর থেকে ভালো হলে মহিলার স্বামীর দুশ্চিন্তার কারণ হত না?

—বিনে ভাড়ায় থাকো কেন—ভাড়া দিলেই পারো?

—নগদে না দিই অন্যভাবে পুষিয়ে দিই।

—কি রকম?

—গাড়ি বিগড়লে সারিয়ে দিই...তাছাড়া মাসাজ করি।

—মাসাজ! তার মানে গা হাত পা মাথা টেপা? কাকে?

হাসতে লাগল।—মিসেস গুপ্তাকে নয়, ভদ্রলোক আয়েসী লোক, বাংলোয় থাকলে আণ্ডার-অ্যার পরে রোজ সকালে এসে হাজির হয়।

শুনে ভালো লাগেনি।—তুমি মাসাজিং জানো?

—কত ভালো জানি তোমাকে বোঝাই কি করে...তোমার মা-কে জিগ্যেস করে দেখো—

মা-কে! আঁতকেই উঠেছিলাম।

ঠোঁটের হাসি সমস্ত মুখে ছড়ালো।—শেষের দিকে রবার্ট গারল্যাণ্ডকে দু'বেলা মাসাজ করতে হত, নইলে তার খিদে বা ঘুম কিছুই হত না। মাসাজ জানা থাকলে বশীকরণ বিদ্যেলাভ সহজ হয়।

স্বস্তি।

জেরিকে পাশে নিয়ে মোটর হাঁকিয়ে বেড়ানোর নেশা বেড়েই চলেছিল। কোনদিন মায়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বিকেলের আগেই বেরিয়ে পড়ি। দূরে দূরে চলে যাই। ঘাটশীলা গেছি, মোসাবনী-রাঘা'র রাস্তায় টহল দিয়েছি, ধলভূমরাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রংকিণীর মুখোমুখি মন্দির এলাকায় ঘুরেছি, ধারাগিরি জলপ্রপাতের নির্জনে দু'জনে



মুখোমুখি বসেছি। আমার ভিতরে আনন্দ আর আত্মপ্রত্যয়ের একটা নতুন স্বাদ। মনে হত একটা বুনো বাঘকে গলায় শেকল পরিয়ে অনায়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

...এই খেলার মেয়াদ ফুরিয়েছে জানতাম না।

সেদিন মা-কে বলে এসেছি লাঞ্চের পর আমি বা জেরি কেউ দোকানে আসছি না। আর ঘরে ফিরতে দেরি হলেও যেন চিন্তা না করে। আমি চাইলে এ-রকম ছুটি দিতে মায়ের একটুও আপত্তি নেই। পাঁচ মাসের মধ্যেও আমি কিছু বলছি না দেখেই বরং দুশ্চিন্তা তার। এই মেলামেশার ছুটি বা অনুমতিও তাই সহজে মিলছে।

এক সঙ্গে লাঞ্চ সেরে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছি জামসেদপুর। আসল উদ্দেশ্য বেড়ানো। কিন্তু উপলক্ষও একটা আছে। জেরি রুবিনের খবর, তার এক পরিচিত লোক দারুণ সস্তায় খুব ভালো একটা গাড়ি বিক্রি করবে। আমার গাড়ি কেনার তেমন আগ্রহ ছিল না কারণ যেটা আছে সেটা আমার এত ভালো লাগে যে ছাড়তে নারাজ। জেরির যুক্তি, কেনা হোক না হোক দেখতে ক্ষতি কি। তেমন দাঁওয়ে পেলে ও নিজেও কিনতে পারে। তাছাড়া আর কিছু না হোক বেড়ানো তো হবে।

জামসেদপুর পর্যন্ত আমিই চালালাম। কিন্তু তারপর একে তাকে জিগ্যেস করেও ওর পরিচিত লোকের বাড়ির হদিসই মিলছে না। মাথা চুলকে জেরি জবাবদিহি করল, পরিচিত হলেও লোকটার বাড়ি জানা নেই। আমার ধারণা, পরিচিত-টরিচিত কিছু নয়, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ও এসেছে।

যা-ই হোক, হদিস একসময় পাওয়া গেল। খুব ভালো গাড়ির নমুনা দেখে হাসিই পেয়ে গেল। ওটা ভালো ভিনটেজ গাড়ির লিস্ট-এ পড়তে পারে। গাড়ি দেখেই আমরা প্রস্থান করলাম।

আবার নিজেদের গাড়িতে। খানিকটা যেতে জেরি বলল, সেই প্রথম দিনের আলাপের সময় তোমার মায়ের মুখে শুনেছিলাম এখানে কে আমার একজন রাইভ্যাল আছে...তার ওখানে গেলে হত, একবার দেখতাম...

ওকে পরীক্ষা করার জন্যই গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম, আমিও তাই ভাবছিলাম, চলো যাওয়া যাক—

কিন্তু আড়চোখে তাকিয়ে ওই মুখে কোনো তাপ উত্তাপ দেখলাম না। অগত্যা নিজেই হেসে বললাম, থাক্‌গে, ও-ছেলে তোমার মতো হাড়-বজ্জাত নয়, শক্‌ড্ হতে পারে—

জেরি হেসে প্রস্তাব করল, তাহলে কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় চলো খিদে পেয়ে গেছে।

ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে চারটে। এরই মধ্যে খিদে পাওয়ার কথা নয়। তবে অনেকটা ঘোরাঘুরি হয়েছে বটে।

একটা বড় রেস্তোরাঁয় ঢুকে জেরি খাবারের ফর্দাও অর্ডার দিল। তারপর হেসেই বলল, ভর-পেট খেয়ে নেওয়া যাক, রাত্তিরে আর খাওয়া জুটবে কিনা কে জানে।

আমি অবাক একটু।—তার মানে, আর কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

জেরি ফিরে জিগ্যেস করল, ফিরতে দেরি হতে পারে তোমার মা-কে বলে আসনি ?

দেরি হতে পারে ও-ই বলতে বলেছিল।—বলেছি, কিন্তু কত আর দেরি হবে, আর কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

—না তো কি, এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে ?...কেন, তোমার ভয় করছে ?

ভয় কথাটা শুনলেই বোকার মতো আমার মেজাজ বিগড়ায়। ওই কথা শুনে আমার কিছু সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। বেয়ারা প্রথমদফা খাবার নিয়ে আসতে জবাব দিলাম না।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতে বিকেল পাঁচটা পনের। বেরিয়ে এসে জেরি আগেভাগে সোজা ড্রাইভারের আসনে উঠে বসল। তখনও কিছু সন্দেহ হল না। কারণ, এতক্ষণ ধরে একনাগাড়ে আমিই গাড়ি চালিয়েছি।

খানিক বাদেই লক্ষ্য করলাম, গাড়ি টাটা রোড ধরে ফিরছে না। জিগ্যেস না করে পারলাম না।—কোথায় চলেছ ?

—গোরুমহিষাণির দিকে।

—সেখানে কি আছে ?

—বিশেষ কিছু না, ইস্পাত কারখানার অয়রন ওর ওখান থেকে আসে।

—এখান থেকে কতদূর ?

—আশি কিলোমিটার হবে।...ভয় করছে ?

এবারে দাবড়ানি দিয়ে উঠলাম। ভয় করতে যাবে কেন, ভয়ের কি আছে ? সাড়ে পাঁচটা বাজে, যেতেই তো সন্ধ্যে পার হয়ে যাবে—অন্ধকারে গিয়ে কি দেখতে পাব ?

—যা পেলাম—পেলাম, বেড়ানো হবে। একটু খটকা লেগেছিল। কিন্তু সন্দেহ হয়নি।

শিস দিতে দিতে ঢিমে তালে গাড়ি চালাচ্ছে। ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের বেশি হবে না। কিন্তু এমন দরদভরা শিসও আগে শুনেছি কিনা জানি না। আমি তন্ময় হয়ে যেতে লাগলাম। একটা শেষ হতে মিনিট দশ পনের থেমে আর একটা সুর ধরল। এমনিই চলল।

দিনের আলো শেষ। সন্ধ্যা পার করে রাত এগিয়ে আসছে। আবছা অন্ধকারে এক অদ্ভুত নির্জনতা ফুঁড়ে গাড়ি চলেছে। রাত সাড়ে সাতটার পরে লোকলয়ে এলাম। সেও দূরে দূরে এক-একটা বাড়ি আর গোটাকতক করে চালাঘর। একটা লণ্ঠন জ্বালা দোকানের কাছে এসে আমি সচকিত। গাড়িটা হঠাৎ অস্বাভিক ঘটঘট শব্দ করে খানিক এগিয়ে থেমে গেল। শূন্যে অস্ফুট একটা গালাগাল ছুঁড়ে জেরি তার দিকের দরজা খুলে নামল। বনেট খুলে মিনিট পাঁচেক ধরে কি দেখল। তারপর ফিরে এসে আবার স্টার্ট দিতে এন্‌জিন তার গলা দিয়ে গোঁ গোঁ একটু শব্দ বার করল শুধু। স্টার্ট নিল না।

আবার নেমে বনেট খুলে পরীক্ষা করল। তারপর বলল, এই আলোয় ভালো বোঝা



যাচ্ছে না, তুমি স্টিয়ারিং-এ হাত লাগাও। তাই করলাম। পিছন থেকে গাড়িটা ঠেলে জেরি গাড়ি দোকানটার পাশে এনে দাঁড় করালো। দোকানদারের কাছ থেকে লণ্ঠনটা চেয়ে নিয়ে বনেট খুলে আবার দেখল। আমিও নেমে ওর পাশে দাঁড়িয়েছি। এ-গাড়ি নিয়ে এ-রকম বিভ্রাটে বিশেষ পড়িনি। প্রায় মিনিট পনের বাদে সোজা হয়ে হালছাড়া গলায় বলল, হবে না; এই আলোয় বোঝা যাচ্ছে না...বড় রকমের কিছু ফেঁসেছে বোধহয়।

লণ্ঠন হাতে দোকানদারের কাছে গিয়ে কিছু কথা-বার্তা বলে আধ-মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো। জানান দিল, এখান থেকে সব থেকে কাছের গ্যারাজও তিন মাইল দূরে, তাছাড়া রাতে খোলাও থাকে না। কাছেই একটা ডাক-বাংলোর মতো আছে...চলো দেখি ও-ব্যাটা ধারে কাছের কোনো মিস্ত্রীর সন্ধান দিতে পারে কিনা।

...আমি এত বোকা, তখনো কিছু সন্দেহ হয়নি।

ডাক বাংলো মিনিট চার-পাঁচের পথ। দূর থেকে মনে হল একটাই ঘর, ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে জেরি হনহন করে এগিয়ে গেল। আমি এসে দেখলাম ও একটা মাঝবয়সী লোকের পিঠে হাত রেখে কথা কইছে। লোকটা ওর অপরিচিত নয় বোঝা গেল। আমাকে দেখে লোকটা শশব্যস্তে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা দুটো ঠেলে খুলল। ডাকল, আইয়ে মেমসাব—

জেরি বলল, ঘরে গিয়ে বোসো, কোনো মিস্ত্রী ধরতে পারে কিনা ও খোঁজ করে দেখছে।

...এত বোকা আমি, তখন পর্যন্ত কিছুই সন্দেহ হয়নি।

আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল ভেবে ওই ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বেশ ছিমছাম ঘর। দেয়াল-ঘেঁষে একটা ডবল-বেডের খাট। শয্যার ওপর সুন্দর বেড-কভার। অন্য দিকে অ্যাটাচড বাথ। শয্যার ওপর সুন্দর বেড-কভার। পাশের ছোট টেবিলে বেড-ল্যাম্প। আলনা, ড্রেসিং টেবিল সবই সাজানো গোছানো।

ঘর খুলে দেবার মিনিট পাঁচেক বাদে হাল্‌কা শিস দিতে দিতে জেরি এলো। আমার দিকে তাকালোও না। ঘরে দরজা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

আর সেই ক'টা মুহূর্তের মধ্যে আমার মগজে চেতনার ঘা পড়ল। ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ-ভাঙা জলের মতো এক-রাশ চিন্তা বুদ্ধির দরজায় আছড়ে পড়ল।...ফিরতে রাত হবে আর খাওয়া জুটবে কিনা বলে বিকেলে রেস্তরাঁয় ভর-পেট খাইয়েছে, আগে ভাগে ড্রাইভারের জায়গা দখল করেছে, শিস দিয়ে পরের পর সুর ভেঁজে আমাকে তন্ময় করে রেখেছে, ওরই হাতে গাড়ি বিগড়েছে, নিজে অত ভালো টেকনিশিয়ান হয়েও গলদের হদিস পায়নি, গাড়িতে অনেক যন্ত্র-পাতি আছে জেনেও মিস্ত্রীর খোঁজে আমাকে ডাক-বাংলোয় এনে তুলেছে...

আমার মতো বোকা পৃথিবীতে আর ক'জন আছে ? চেঁচিয়ে উঠলাম, দরজা বন্ধ করছ কেন ?

পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এলো। নিঃশব্দ হাসিতে ভরাট মুখ। ওটুকুই জবাব। দু'হাত আমার দুই কাঁধে তুলে দিল। আরো মিষ্টি করে হেসে মুখের কাছে ঝুঁকল।—ভয় করছে ?

আমার ভিতরে কোথাও বারুদ জমে আছে। ওই দুটো কথা দুটো শব্দ তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য, আমি ঝলসে উঠলাম না। তার বদলে স্থির। চোখে চোখ।—গাড়ির কি হয়েছে ?

—কিছুই হয়নি। অনেক পরিশ্রমের পর বেচারাকে বিশ্রাম দিলাম একটু। যখন চাইবে আবার ঠিক রওনা হবে।

এত সাহস কল্পনা করতে পারছি না। দুই কাঁধের ওপর হাতদুটো থাবার মতো চেপে বসেছে। চোখের হাসি গাল বেয়ে ঠোঁটের দিকে নামছে। আমি চেয়ে আছি। এখনো সাহসের পরীক্ষা নিচ্ছি কিনা জানি না।—কি মতলব ?

যা করল তার জন্য অন্তত প্রস্তুত ছিলাম না। মুখের কথা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দুই কাঁধ ধরে প্রচণ্ড জোরে তিন চারবার ঝাঁকুনি দিল। এত জোরে যে শরীরের হাড়-মাংস নড়েচড়ে গেল মনে হল। হাসছে। গলার স্বরও ওই হাসির মতো নরম।—আমার মতলব বরাবরই খুব স্পষ্ট।...কিন্তু তুমি এক নম্বরের চীট, নিজেকে ঠকাচ্ছ, আমাকে ভোগাচ্ছ। জামসেদপুর থেকে তোমার লাইসেন্স নিয়ে ফেরার দিনে এই শরীরটার (আবার ঝাঁকুনি একটা) সমস্ত কণা আমাকে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলে, একেবারে দিন-দুপুর না হলে ওই গাড়িতেই তোমাকে আমি পেতে পারতাম।... সেই দুর্বলতা ঢাকতে আজ পাঁচ মাস ধরে দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছ ?

চেয়ে আছি। পাঁচমাস ধরে এই লোকটাকেই কি দেখে আসছি !

মুখের হাসি আবার গলা দিয়ে গলে গলে পড়ছে।—রামদেব মাহাতো সেদিন কি বলেছিল শুনতে চেয়েছিলে না ? তোমাকে খুব ভালো করে দেখে নিয়ে আমার কান-মাথা টেনে নিয়ে বলেছিল, আওরত বিলকুল তৈয়ার—উল্লু কা পাঠঠে তুম্ দাওয়াই নহী জানতে হো ?...তারপর থেকে আমি এমনি একটা রাতের অপেক্ষায় ছিলাম। মতলব বুঝতে পারছ ?

## ॥ ৫ ॥

পরদিন বাংলোর ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম বেলা সাড়ে এগারোটার পরে। গেট থেকে তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে গাড়িটা একবার থামিয়ে ছিলাম। জ্বলন্ত চোখে পাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। নামতে বলছি তক্ষুনি বুঝেছে। কিন্তু না বোঝার ভান করেছে।—কি হল ?

সমস্ত পথ কথা না বলে কেবল জ্বলতে জ্বলতে এসেছি। এখনো কথা বলিনি। তাকিয়েই ছিলাম।



—ও, না...এখানে নামব না, একটা ভালো কাজ সেরে এলাম, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাই।

রাগের মাথায় আবার ধাঁ করে গাড়ি চালিয়ে ফটকে ঢুকে গেছি। এই লোকের দুঃসাহসের বিচার করতে বসে আর লাভ নেই। বিচার হয়েই গেছে। তবু টিট যদি করতে হয় তো ভেবে-চিন্তে পরে। এই মুহূর্তে আমি চাইছি মা যেন বাংলোয় না থাকে, যেন দোকানে থাকে। তাহলে ফেরার খবরটা ফোনে দেওয়া যাবে, মুখ দেখাতে হবে না। মুখ দেখাবার আগে কিছুটা অন্তত সহজ হবার মতো সময় দরকার।

কিন্তু অমন ভাগ্য হবে কেন। ঘরে নয়, মা একেবারে বাংলোর বারান্দায় বসে। ভেতরটা ডবল তেতে উঠল। নেমে ঠাস করে দরজাটা বন্ধ করে তিন লাফে বাংলোয় উঠলাম। চেয়ার ছেড়ে মা উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল সমস্ত রাত ভালো ঘুমোয়নি। আমার রাগ হয়ে গেল।—হাঁ করে দেখছ কি, চিনতে পারছ না ?

মায়ের দু'চোখ আরো গোল। বিমূঢ় দৃষ্টিটা আমাকে ছেড়ে জেরির ওপর। ও-শয়তানের মুখে চিরাচরিত কচি-কাঁচা হাসি দেখে কি বুঝবে ? ফের আবার আমার দিকে।—অমন মেজাজে ফুটছিস কেন...ওদিকে ভেবে ভেবে সমস্ত রাত ঘুমোতে পর্যন্ত পারলাম না।

—অত ভাবনার কি হয়েছিল, বলেই তো গেছলাম দেরি হতে পারে !

এমন মেজাজের পর এই জবাব শুনে মা দুজনকেই আর একদফা দেখে নিল। তারপর রাগত সুরে বলল, কাল দুপুরে বেরিয়ে আজ বেলা বারোটায় ফিরলি—এর নাম দেরি হতে পারে !

বোকার মতো রাগ করছি বুঝতেই পারছি। বললাম, তা কি করা যাবে, রেজিষ্ট্রি অফিসে একেবারে নোটিস দিয়ে ফিরলাম।

মুখের কথা শেষ হতে না হতে নিজের ঘরে ঢুকে গেলাম। মায়ের জেরা আর খুঁটিয়ে দেখার হাত থেকে পালানোর তাগিদ। এটুকু থেকেই মা যা বোঝার বুঝে নিক। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে চোখ রাখতে পারছি না। একটা মেয়ে প্রায় সমস্ত রাত ধরে ভোগের ঝড়ের মধ্যে পড়ে না গেলে তার এই মূর্তি হয় ? অথচ ওই ভিজে বেড়ালের মুখ দেখে কে কি বুঝবে ! জেরিকে বিদায় দিয়ে মা এই ঘরে ঢুকতে পারে। তাড়াতাড়ি চানে চলে গেলাম।

খাবার টেবিলে বসে মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা, উল্টোদিকে মায়ের চেয়ার খালি। টেলিফোনে কথা বলছে টের পেয়েছি। আমি ফেরার পর নিশ্চিন্ত হয়ে দোকানের কেনা-বেচার খবরাখবর নিচ্ছে বোধহয়। দু'হাত দূরে অ্যানজেলা দাঁড়িয়ে। গভীর মনোযোগে আমাকেই লক্ষ্য করছে। কিছু জিগ্যেস করার সাহস নেই। কৌতূহলে ওর কালো মুখ টসটস করছে। মনে মনে ও যাকে পছন্দ করে না এমন একটা লোকের সঙ্গে গতকাল দুপুরে বেরিয়ে আজ দুপুরে ফিরল, ছোট মেমসাহেবের এতবড় বেচাল ওর কল্পনার বাইরে।

মা এসে তার চেয়ার টেনে বসল। গম্ভীর কিন্তু অখুশি নয়। চামচে দিয়ে বাটির সুপ নাড়তে নাড়তে আড়চোখে দুই একবার আমাকে দেখে নিল। তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, কংগ্র্যাচুলেশননস... হঠাৎ ঠিক করেছিস একদিন থেকে গিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিস দিয়ে ফিরবি—তা না-হয় হল, কিন্তু রাতে তো বড় হোটেলে ঘর নিয়ে ছিলি শুনলাম, সেখান থেকে আমাকে একটা ফোনে খবর দিলি না কেন?

মায়ের জেরায় পড়ে এক-রাশ মিথ্যে যে বলে গেছে জানা কথা। রাগের মাথায় বলতে যাচ্ছিলাম, এরও কৈফিয়ত ওই বাঁদরটার কাছ থেকেই নিলে না কেন? সামলে নিয়েও ইচ্ছে করে জেরির ঘাড়েই দোষ চাপাতে চেষ্টা করলাম, বলেছিলাম তো, করেনি জানব কি করে!

—দু'জনেরই সমান কাণ্ডজ্ঞান তোদের। সুপের বাটি খালি করে জিগ্যেস করল, বিয়েটা কবে পড়ছে—এক মাসের নোটিস দিয়েছিস তো?

নোটিস এক মাসেরই দিতে হয়, কিন্তু ঘুষের জোরে জেরি সেটা দশ দিনে টেনে এনেছে। আমি তখন রাগে চিড়বিড় করছিলাম, কিন্তু বাধা দিইনি। একটা অন্যরকমের দুশ্চিন্তা উকিঝুঁকি দিয়ে গেছল।...ওই বেপরোয়া সোহাগরাতের জের টানতে হবে কিনা কে জানে, নিজেও তো শেষ পর্যন্ত অতলেই ডুবেছিলাম।

—না। দশ দিনের...। আমার খাওয়ায় মনোযোগ।

দশ দিনের নোটিস কি করে সম্ভব হল মা সে ভাবনার দিক দিয়ে গেল না।—দশ দিনের! দু'জনেরই কি তোদের মাথা খারাপ হয়ে গেল! আর কিছু না হোক, তোর বিয়ের ড্রেস তো করতে হবে—কখন কি হবে!

মুখ না তুলেই জবাব দিলাম, দশ দিন অনেক সময়, ভাবনা চিন্তা ছেড়ে তুমি খাও তো এখন।

—হুঁঃ।

মায়ের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। অ্যানজেলা তাড়াতাড়ি ধরতে গেল। একটু বাদে ফিরে এসে জানান দিল, মিসেস গুপ্ত...দিদিমনি ফিরেছে কিনা খবর নিচ্ছিল, বলে দিলাম আজ ফিরেছে।

এবারে মুখ তুলতে হল। যুক্তি নেই, তবু বিরক্তি।—তুমি কি ওদের কানেও ঢাক-ঢোল বাজিয়েছ নাকি?

আমার কথা-বার্তার ধরনে মা এখন অনেক অভ্যস্ত। আগে সব কথার তাৎপর্য বুঝত না।—রাত দশটার পরেও তোর পাত্তা নেই, ওখানে গিয়ে আড্ডায় জমেছিস কিনা খবর নেব না—তোদের অবুঝপনার জন্য কম দুশ্চিন্তায় রাত কেটেছে আমার! আমি হার্ট আর প্রেসারের রোগী সে খেয়াল আছে!

খামাখা রাগে একবার অ্যানজেলার দিকে তাকালাম। মনে হল উত্তেজনায় আর কৌতূহলে কালো মুখ ফাটো-ফাটো।

মা এমনিতেই কম খায়। ইদানীং খাওয়া আরো কমেছে। একটু বেশি খেলে হাঁপ



ধরে। হার্টে চাপ পড়ে। আগের সেই বাঙালী-ডাক্তার বলেছিল মায়ের হার্টের একটা ভালব্ অকেজো হয়ে আসছে। আমাদের গাড়িতে মায়ের সঙ্গে ঘাটশীলায় গিয়ে এক্স-রে ই. সি. জি করিয়ে এনেছে। রিপোর্ট মোটামুটি ভালো। হাঁপ-ধরা ছাড়া ব্লাডপ্রেসার নিয়েও মা মাথা ঘামায়। ব্লাডপ্রেসারের দু'-দশ ওঠা-নামা অনুযায়ী তার মেজাজের ওঠা-নামা। আগে এখানকার সেই বাঙালী ডাক্তার এসে সপ্তাহে একদিন মায়ের প্রেসার চেক করত। মাস তিনেক আগে অরুণলাল ওই জাদুচকেই চেম্বার করে বসার পর থেকে আগের ডাক্তার বাতিল। মিসেস মালা গুপ্তার বাপের বাড়ির এলাকার মানুষ। আগের পরিচিত। মিস্টার আর মিসেস গুপ্তা তাকে সঙ্গে করে এনে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তার চিকিৎসার ঢালাও প্রশংসাও করেছিল। এত ভালো ডাক্তার নিজের দেশ ছেড়ে এখানে এসে প্র্যাকটিস শুরু করল কেন তা অবশ্য বলেনি। এরই মধ্যে মায়ের তাকে খুব পছন্দ। বিকেলে দোকান থেকে বেরিয়ে একদিন পর একদিন তার চেম্বারে গিয়ে প্রেসার দেখিয়ে এলে হাত পেতে টাকা নেয় না, যত্ন নিয়ে দেখে, আলোচনা করে। ফোনে ডাকলে আধঘণ্টার মধ্যে সাইকেল রিকশয় চপে বাংলোয় হাজির হয়। এ-দিকে অন্য রোগী দেখতে এলেও বাংলোয় এসে মায়ের খবর নিয়ে যায়। দেখতে সুশ্রী (জেরির ধারে কাছে নয় তা বলে), সপ্রতিভ। বছর তিরিশ হবে বয়েস। ভদ্রলোককে আমারও অপছন্দ নয়। বিনয়ী, মার্জিত রুচির মানুষ। একটা বড় গুণ, কথা কম বলে—শোনে বেশি। সব রোগীরই এটা পছন্দ। এই থেকেই বোঝা যায় লোকটি বুদ্ধিমান। তার মতামত শুনেই মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি মোটামুটি নিশ্চিন্ত। মাকে বাংলোয় দেখতে এলে সঠিক খবর শোনার জন্য আমি তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিই। একই কথা শুনি, আপনার মায়ের হার্ট বা প্রেসার এমন কিছুই খারাপ নয়। একটা ভালব্ অমন অনেকেরই খারাপ থাকে—জানতেও পারে না। আসলে উনি রোগ নিয়ে বেশি ভাবেন। আপনারাও একটু-আধটু ভাবছেন দেখলে উনি ইগনোরড্ ফিল করবেন না।

দোষের মধ্যে খাবার পর বুকে মাঝে মাঝে চাপ ধরে আর তখন একটু আধটু শ্বাস কষ্টও হয় শুনে এই ডাক্তার বলেছিল একবারে বেশি খাবেন না। ব্যস, সেই থেকে মায়ের খাওয়া ক্রমশ কমছেই। কিন্তু স্বাস্থ্য একটুও খারাপ হচ্ছে না। ওষুধের নাম করে ডাক্তার অরুণলাল কি খাওয়াচ্ছে সেই জানে। আজও আমার আধা-আধি খাওয়া না হতে মায়ের শেষ।তাছাড়া রাগের জ্বালায় আর খিদের জ্বালায় হয়তো বেশিই খাচ্ছিলাম। গত কাল সেই বিকেলের পর থেকে তো আর খাওয়া হয়নি।

মা বেরুবার জন্য তৈরি হয়েই খেতে বসেছিল। উঠে পড়ল।—তুই এখন যাবি না আমি চলে যাব?

—গেলেও বিকেলের আগে নয়।

—গাড়ি পাঠিয়ে দেব?

তারমানেই জেরি গাড়ি নিয়ে আসবে। ঝাঁঝালো গলায় বললাম, কেন, দরকার হলে

রিকশয় যেতে পারব না ? কাউকে পাঠাতে হবে না !

মা এই মেজাজের তলকুল না পেয়ে চলে গেল।

খেতে খেতে এবারে আমার দু'চোখ অ্যানজেলার মুখের ওপর চড়াও হল।—সেই থেকে অমন ড্যাবড্যাব করে কি দেখছ ?

অ্যানজেলা ধড়ফড় করে উঠল প্রথম। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, ছোট মেমসায়েব জেরি সাহেবের সঙ্গে তোমার বিয়ে ?

আমার গলায় আবার অকারণ ধমকের সুর।—একদিন না একদিন তার সঙ্গেই বিয়ে হবে তুমি জানতে না ?

ও আমতা-আমতা করে জবাব দিল, আগে ভেবেছিলাম হবে, এতগুলো মাস চলে যেতে ভাবলাম হবে না, আবার কাল রামদেও মাহাতো বলল শিগগিরি হবে—আর আজই মেমসাহেব তোমাকে কংগ্র্যাচুলেট করল।

খাওয়া ভুলে এবারে আমি আকাশ থেকে পড়লাম।—কাল রামদেও মাহাতো বলল ! তাকে তুমি কোথায় পেলে ?

সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত হয়ে তিন আঙুল জিভ কাটলো অ্যানজেলা। কালো মুখে ভয়ের ছায়া। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে উঠল, মেমসাহেব তোমাকে বলতে নিষেধ করে দিয়েছিল যে !

চেয়ে আছি।—মা কিছু জানবে না, বলো।

—দোহাই ছোট মেমসাহেব—

—তুমি বলবে কি বলবে না ? এক্ষুনি উঠে গিয়ে মা-কে ফোনে জিগ্যেস করব !

অ্যানজেলার মুখের দিকে তাকালে দয়া হবার কথা, কিন্তু আমার শোনার তাগিদও কম নয়।

—তুমি আসছ না দেখে মেমসাহেব খুব চিন্তা করছিল, রাত সাড়ে দশটায় গুপ্তা মেমসাহেবকে ফোন করে জানল তুমি সেখানেও নেই। ফোন ছেড়ে রাত দশটা বত্রিশ মিনিটে আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরুলো।

ওর মুখে দশটা বত্রিশ শুনেও আমার হাসির মেজাজ নয়।—কোথায় গেলে...রামদেও মাহাতোর ডেরায় ?

অ্যানজেলা সভয়ে মাথা নাড়ল। তাই।

—বার বার খুঁচিয়ে জিগ্যেস করতে হবে ? সে কি বলল ?

এবারে ওর জিভ আর ঠোঁট গড়গড় করে ছুটল।—প্রথমে ও বুঝতেই পারেনি অন্ধকারে হেডলাইট জ্বেলে জঙ্গলের রাস্তা ধরে মা কোথায় চলেছে। পরে বুঝতে পেরে ভয়ে কাঠ। রামদেও মাহাতো অত রাতেও জেগেছিল, তার বাষছালে বসে নেশায় ঢুলছিল। আর তার পাশের সেই মস্ত দানো-কুমড়োটা কটমট করে অ্যানজেলার দিকেই চেয়ে ছিল। বাল্‌ব-এর লাল আলো দানো-কুমড়োর চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। অত নেশার মধ্যেও রামদেও মাহাতো মেমসাহেবকে দেখে খুশি। মা তাকে



জিগ্যেস করল জেরির সঙ্গে তার মেয়ে এসেছিল কিনা। রামদেও জানালো ছে রোজ আগে এসেছিল। দু'জনে আজ দুপুরে বেরিয়ে এখনো ফেরেনি শুনে সে তক্ষুনি খড়ি নিয়ে মেঝেতে আঁকিবুকি করল আর বিড়বিড় করে কি আওড়াতে লাগল। অ্যানজেলার ধারণা কোনো প্রেত আত্মাকে খবর নিতে পাঠালো। একটু বাদে বলল, ঘাবড়াও মাত্ মেমসাব, দোনো বহুত দিলখুশমে হ্যায়, কালতক জরুর লোটেংগে। আব দোনোকে সাদি ভি জল্‌দি হো জায়গা। মেয়েকে নিয়ে জেরি উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিমের কোন্ দিকে আছে তা-ও নাকি সে বলে দিয়েছে। ফেরার সময় মেমসাহেব অ্যানজেলাকে বলেছে এখানে আসা হয়েছিল কেউ যেন না জানে।

আমি নতুন করে আবার রাগে জ্বলতে জ্বলতে নিজের ঘরের বিছানায় এসে পড়লাম। ওই লোকটাই জেরিকে আরো উসকে দিয়েছিল মনে পড়ল, ওর কান-মাথা টেনে নিয়ে নাকি বলেছিল, আওরত্ বিলকুল তৈরি, উল্লুকা পাঠ্‌ঠে কি দাওয়াই জানে না।

রাগ এমনই চণ্ডাল যে সেই মুহূর্তে ঠিক করে ফেললাম বিয়ে বাতিল করব। দেখি কেমন গুণে বলে বিয়ে জল্‌দি হয়ে যাবে। রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিস দেওয়া হয়েছে তো বয়েই গেল। সেটাই জেরির একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি ঠিক করে নিয়ে পরের ভাবনা পরের জন্য রেখে ছিলাম। কারণ ঘুমে দু'চোখ বুজে আসছে।

ঘুম ভাঙল বিকেল পাঁচটায়। আর এমনি মজার কাণ্ড চোখ খুলে হঠাৎ ঠাওর করতে পারলাম না আমি কোথায়। চোখ খুলেই মনে হয়েছিল গোরুমহিষানির সেই ডাক বাংলোর বিছানায় পড়ে আছি, আর একটা মানুষ আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে।

তক্ষুনি ভুল ভাঙল। উঠে বসলাম। ভারী ঝরঝরে লাগছে। সমস্ত গা-মাথা অদ্ভুত হালকা লাগছে। রাতে ঘুম বরাবরই ভালো হয়। কিন্তু এ-যেন একেবারে নতুন কিছু কাণ্ড ঘটে গেছে আমার মধ্যে। একেবারে ভিন্নগোছের কিছু।...সেই তেরো-চোদ্দ থেকে এই বাইশ বছর বয়েস পর্যন্ত কি একটা বাষ্প জমাট বেঁধে বসেছিল। তার অস্তিত্বের যন্ত্রণা প্রথম টের পেয়েছিলাম। পাঁচ মাস আগে লাইসেন্স পেয়ে জামসেদপুর থেকে ফেরার দিন। গাড়িতে...দুপুরে। আর আজ মনে হচ্ছে সেই জমাট-বাঁধা বাষ্প নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। ভিতরটা এমনি হালকা যেন প্রজাপতির মতো বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারি।

অ্যানজেলা চায়ের পট রেডি রেখেছিল। মিনিট দশেকের মধ্যে পোশাক বদলে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ সোজা হেঁটে রাস্তাটা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে গোটা-কতক সাইকেল রিকশ সেখানে দাঁড়িয়েই থাকে। রিকশঅলারা সকলেই আমাকে বা ম-কে চেনে।...মনে হল রিকশয় চলেছি ভালোই হল। গাড়িতে হলে হুস করে পৌঁছে যেতাম। ভিতরটা ধীর স্থির করে তোলার মতো একটু সময় দরকার।...ঘুমোবার আগে রাগের মাথায় ঠিক করেছিলাম, বিয়ে ভেঙে দেব—ভেঙে দিলে ওই শয়তান আর

তার পয়গম্বর ওস্তাদের মুখে চাবুক মারা হবে। এখনো রাগ যায়নি কিন্তু হাসিও পাচ্ছে। একই সঙ্গে মনের-তলায় যে সত্যটা উঁকিঝুঁকি দিল সেটাও অস্বীকার করার চেষ্টা।...লোকটাকে যদি বাতিলই করব তো কাল এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল কি করে? সে-রকম ইচ্ছে করলে ওকে কি আমি লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দিতে পারতাম না?...ওই লম্পট বারবার আমাকে যে দরিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেখান থেকে ফেরার ইচ্ছেও খুব হয়েছিল কি?

...থাক বাবা, নিজের ভেতর দেখে আর কাজ নেই। কিন্তু বাতিল না করলেও ওই শয়তানকে যে এরপর লাগামের মুখে রাখতে হবে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

জাদুচক জায়গাটা কলকাতা যাবার পথে বা কলকাতা থেকে ফেরার পথে একটা ছোট্ট ব্যবসার এলাকা হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অল-ফাউণ্ড স্টল গোছের দুটো স্টেশনারি দোকান আছে, তার পাশেই ভালো সাজসরঞ্জামের রেস্তরাঁও আছে একটা, দু'তিনটে পান-বিড়ি-সিগারেট সোডা-লিমনেডের দোকানও আছে; দাবাইখানা ডিসপেনসারি আছে আর গরিব বা অল্প পয়সার লোকেদের জন্য টিনের চালা-ঘরের চা-কেক-বিস্কুট মামলেট বিক্রির দোকানও আছে। সব দোকানের ফিরিস্তি দেওয়ার দরকার নেই, যেতে আসতে গত দু'তিন মাস ধরে ওই চালা ঘরের চা-বিসকুট কেকের দোকানটার দিকে আমার চোখ পড়ে। দোকানটার দিকে ঠিক নয়, দোকানের বাইরে পাতা বেঞ্চিগুলোর দিকে।

...সেই বেঞ্চির কোনো একটাতে বসে এক ছোকরা একের পর এক সিনেমার চটকদার হিন্দী গান গেয়ে যায়। ঢ্যাঙা, রোগা, কালোর ওপর বেশ মিষ্টি মুখ। পরনে খাকি ট্রাউজারের পায়ের দিকে দুটো ফেঁসে গিয়ে সুতো বেরিয়ে আছে, গায়ে এই দু'আড়াই মাস ধরে একটাই ছিটের রঙিন মোটা গেঞ্জি দেখছি বোধহয়। প্রথম দিকে হাতে একটা ঘড়ি দেখে ছিলাম মনে পড়ে। এখন নেই। বেচে খেয়েছে মনে হয়। ছেলেটার গানের বেশ সুরেলা গলা, চটুল গানই বেশি গায়। আর এক দঙ্গল রক-বাজ ছেলে তালে তালে হাত-তালি দিয়ে বা বেঞ্চিতে তবলা বাজিয়ে চটুল গানের আসর জমাতে চেষ্টা করে। আমাকে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে-আসতে দেখিলে ওই শ্রোতাদের আরো উৎসাহ বাড়ে, আরো জোরে হাত-তালি দেয় আর টেবিল বাজায়। আর গায়কটিও হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে সুরেলা গলা একটু চড়িয়ে দেয়। রাগ করা বোকামি, আমিও হাসি মুখেই ওদের দিকে তাকাই, গান শুনে যাই-আসি। আমার দোকান থেকে পাঁচ সাত মিনিটের হাঁটা পথ, অনেক সময় পায়ে হেঁটেই এদিকে হয়তো কিছু কেনা কাটা করতে আসি। তখনই ওদের গান হাত-তালি আর বেঞ্চি বাজানো পঞ্চমে ওঠে।

কিছুদিন হল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছি। গাড়িতে আমাকে যেতে আসতে দেখলে মাঝপথে ছেলেটার গান থেমে যায়। চেয়ে-চেয়ে দেখে। আর হেঁটে কিছু কেনা-কাটা করতে এলেও তাই। গান থামিয়ে আমাকে দেখে। অন্য ছেলেগুলোর বাড়তি উৎসাহ



সত্ত্বেও ওই ছেলেটা গলায় কুলুপ এঁটে যেন গান থামিয়ে দেয়। আরো আশ্চর্য, গত পনের দিনে গাড়িতে যেতে আসতে কম করে তিন দিন ওকে আমাদের বাংলোর সামনে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। চাউনি দেখে মনে হয়েছে আমারই সন্ধানে সে এদিকে এসেছে। ভ্রু কুঁচকে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছি। ওর গানের শ্রোতাদের অসভ্য আর লোভী মনে হয়েছে, কিন্তু এই ছেলেটাকে তাও মনে হয়নি। কিন্তু বাড়ির কাছে ওকে ঘুরঘুর করতে দেখে হাসিই পেয়ে গেছে।...শেষে এই ছেলেও কি আমার প্রেমে পড়ে গেল নাকি!

আজ সাইকেল রিকশায় চলেছি, জাদুচকেও ঢুকে গেছি। আর আধ-মাইলটা পথ ভাঙলে আমার দোকান। রাস্তার পাশে দেখি ওই ছেলেটা দাঁড়িয়ে, আমার দিকেই চেয়ে আছে। কিন্তু যত কাছে আসছি চাউনিটা ঠিক প্রেমিকের চাউনির মতো লাগছে না। কি রকম তা-ও ঠিক বলতে পারব না। ও-রকম দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমিও চোখ ফেরালাম না, ভুরুর মাঝে একটু ভাঁজও পড়ল বোধহয়।

—মেমসাব! একটা হাত তুলে ও আমাকেই ডেকে উঠল। ডাকটা কানে কি-রকম করুণ ঠেকল।

পাশ কাটিয়ে গিয়েও সাইকেল রিকশঅলাটাকে থামতে বললাম। ছেলেটা পিছন থেকে ছুটে এলো। ছেলেটা বলছি কারণ বছর তেইশ-চব্বিশ বয়েস মনে হল। কাছে এসে দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, গুড় আফটারনুন মেমসাব—দয়া করে পাঁচ মিনিটের জন্য আমার কিছু কথা শুনবে?

আমি রিকশয় বসে ভুরু কুঁচকেই চেয়ে ছিলাম। একটু দূর থেকে কালো মুখ যত মিষ্টি দেখায় এখন ততটা লাগছে না। মুখ বেজায় শুকনো আর চোখদুটোও গর্তে। সুরেলা গলার স্বরে মিনতি। কিন্তু হিন্দী গান যেমন নির্ভুল গায় তার এই হিন্দী বলাটা কেমন ভাঙা-ভাঙা আর নির্ভুলও নয়। শুনলেই বোঝা যায় এখানকার লোক নয়।

রিকশ থেকে নামলাম। কিছু সন্দেহ হতে আরজি শোনার আগেই হিন্দীতে জিগ্যেস করলাম, কি নাম তোমার?

—বৃন্দাবন আইচ।

—বাংগালী?

তক্ষুনি একটু হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই।

আমার বাঙালীর ভাবপ্রবণতা যাবে কোথায়। রুক্ষ গলায় আর পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলাম, বাঙালী তো ওই বাবিশ হিন্দী গানগুলো গাও কেন, সুন্দর বাংলা গান গাইতে পারো না?

গর্তের চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ও আমার দিকে খানিক চেয়ে রইল, তারপর উচ্ছ্বাসে আর বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল।—মিস লিলি...মানে আপনি বাঙালী?

—লিলি রয়। তোমার থেকে খাঁটি বাঙালী কিনা জানি না। চাউনি দেখে মনে হল এখনো নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর দুচোখে আর গলায়

আশার জোয়ার উপছে উঠল যেন। —আপনি বাঙালী তাহলে বাঙালী হওয়ার অপরাধে আপনার দোকানে আমার কাজ হবে না কেন ? একটা কাজ না হলে যে আমি মরে যাব—শুধু বাঙালী বলে আপনার দোকানেও কেন আমার কাজ হবে না মিস লিলি ?

থমকালাম একটু।—বাঙালী বলে কাজ হবে না কে বললে ?

ও একটু ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, জেরি সাহেব...।

শুনেই ছলাৎ করে মাথায় রক্ত উঠল। জেরির এমন মাতব্বরি ! ওদিকে রিকশঅলাটা ঘণ্টি বাজিয়ে তাড়া দিল। ওকে ভাড়া গুণে দিয়ে বিদায় করলাম।...ছেলেটাকে তাহলে কোনো কাজের আশাতেই আমাদের বাংলোর কাছে ক'দিন ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে। সাহস করে বাংলোয় ঢুকতে পারেনি, বা গাড়ি থামিয়ে ডাকতে পারেনি।

ডাকলাম, এসো। ও আমার পাশে পাশে চলল।

ঠিক আজকের দিনেই জেরির নামটা না করলে আর জেরি অমন দুঃসাহসের কথা বলেছে না শুনলে শুধু গানের গলা মিষ্টি বলেই আমি এতটা সদয় হতাম কিনা সন্দেহ।

—জেরিকে তুমি কি কাজের জন্য বলেছিলে ?

বৃন্দাবন জবাব দিল, আমি শুনেছিলাম ক্যাশমেমো লেখা আর হিসেব-টিসেব রাখার জন্য আপনাদের একজন লোক দরকার—

—কার কাছে শুনেছিলে ? আমি তুমি করেই বলছি।

—দোকানের ওই বুড়ো-মতো ভদ্রলোকের মুখে। উনি জানিয়েছিলেন একজন ভালো লোক পেলেই আপনারা তাকে ছেড়ে দেবেন।

সত্যি কথাই। ওই বুড়ো ক্যাশিয়ার প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলে নিজেই কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছে। খাটুনিও খুব—সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সজাগ থাকতে হয়। বললাম, ও-কাজের জন্য কিছু লেখা-পড়া জানা দরকার, তুমি কতদূর পড়াশুনা করেছ ?

—হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছিলাম।

এতটা ভাবিনি।—কোথা থেকে ? কোন্ ডিভিশনে ?

—সেকেণ্ড ডিভিশনে, কলকাতা থেকে...

—কোন্ ইয়ারে ?

বলল। আমার থেকে দুবছর আগে। তাহলে বয়েস ঠিকই আঁচ করেছি।...হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ, সুন্দর গানের গলা, ছেলেটার এই হাল কেন ? জিগ্যেস করলাম, কলকাতা কবে ছেড়েছ ?

—পাশ করার দু'মাসের মধ্যে।

—আর পড়লে না বা গান শিখলে না কেন ?

—দুটোতেই পয়সা লাগে। দাদা আর খেতেই দিতে চাইলে না।

—সেই থেকে বসেই আছ ?



এবারের জবাবে একটু দ্বিধা লক্ষ্য করলাম। না ;...জামসেদপুরে একটা কাজ জুটিয়েছিলাম।

—কি কাজ ?

—একটা লোহার কারখানায়, দিনে দশ ঘণ্টা খেটে আটটাকা হিসেবে সপ্তাহে ছ'দিনের বেতন পেতাম।

—সেখানকার সার্টিফিকেট আছে ?

বৃন্দাবন শুকনো মুখে মাথা নাড়ল, নেই।

—নেই কেন, তুমি কাজ ছেড়ে এসেছ না ওরা ছাড়িয়ে দিয়েছে ?

এবারে জবাব নেই। নিরুত্তর।

—ঠিক ঠিক জবাব না দিলে আমার কাছে সুবিধে হবে না।

—আমি পালিয়ে এসেছি।

এবারে ঘুরে তাকালাম।—পালিয়ে এসেছ !...কেন ?

—কারখানার বিহারী ফোরম্যান গুণ্ডা গোছের লোক, আর সেখানে দশ বিশ জন হুকুমের গোলামও আছে তার।...আমাকে পেলে তারা গায়ের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে মেরে ফেলত।

কড়া ইণ্টারভিউ নিতে গিয়ে আমিই হকচকিয়ে গেলাম।—মেরে ফেলত ! কেন ? তুমি ওই ফোরম্যানের কি করেছিলে ?

—লোকটা কেবল আমার কাজের গলদ বার করত, আর যাতা গালাগাল করত।...কারখানার ভিতরেই আমার গালে ভীষণ একটা চড় মেরেছিল আর বলেছিল বাংগালী কুত্তে কাঁহাকা...ওর সাগরেদরা তখন আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছিল।

শুনে আমারই শ্বাস রুদ্ধ।—তারপর ?

তারপর ওই ফোরম্যানকে একলা রাস্তায় ধরেছিলাম। বাঙালী কুকুরের দুটো ঘুঁষিতে ওর নাকের হাড় আর কয়েকটা দাঁত ভেঙে গেছল বোধহয়...। এই শুনে পাছে আমি ভড়কে যাই সেই ভয়ে ব্যস্ত হয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, আসলে আমি খুব ঠাণ্ডা মানুষ বুঝলেন, কাজের ভুলে চড় খেয়েও হয়তো কিছু বলতাম না, কিন্তু বাংগালী কুত্তে শুনে মাথার কি-রকম গণ্ডগোল হয়ে গেল।

আমি হেসে ফেলে বললাম, ওই শুনে মাথার গণ্ডগোল না হলে আমিও তোমাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতাম। পরের মুহূর্তেই ভূরু কোঁচকাতে হল আবার। সামনেই বেঞ্চি পাতা চালা ঘরের সেই চায়ের দোকানটা—কয়েকটা বখাটে ছেলে বেঞ্চিতে বসে আছে। আমার পাশে বৃন্দাবনকে দেখে তারা এমন কি দোকানের মালিকও হাঁ করে চেয়ে আছে। একটু মেজাজের সুরে বললাম, তুমি ভালো লোক জানব কি করে, ওই অসভ্য ছেলেগুলোর সঙ্গে মেশো, যত-সব বাজে গান শুনে ওরা মজা পায় আর ফুর্তি করে—

ওর মুখ থেকে আশার বাতিটা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দেওয়া হল যেন। চোখে আর গলার স্বরে দ্বিগুণ আকৃতি, আমাকে দয়া করে চাকরিটা দিয়ে দেখুন মিস লিলি, তারপর আপনার যাতায়াতের সময় যদি এতটুকু বেচাল দেখি তো ওদের দাঁত ভেঙে দেব।

পারলে যেন তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ওদের দুই একজনের দাঁত ভেঙে আমাকে দেখায়। হাসি চেপে ঝাঁঝালো গলায় বললাম, ফোরম্যানের দাঁত ভেঙে বুঝি ও ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে গেছ ?...যাক, ওরা এমন কিছু অসভ্যতা করে না, তুমিই বরং বেছে বেছে বাজে হিন্দী গান গেয়ে ওদের মজা পেতে দাও। বৃন্দাবন অসহায় মুখ করে বলল, কি করব বলুন ? মজা পায় বলেই ওরা রোজ আমাকে চা-বিস্কুট খাওয়ায়—আর বাংলা গান ওরা বোঝেও না। আমি গান গাইলে দোকানে ভিড় হয় আর বিক্রী বেশি হয় বলে দোকানের মালিকও রাতে আমাকে রুটি-টুটি খেতে দেয়, ওর জোড়া বেঞ্চিতে শুতেও দেয়—

আকাশের নিচে ওই বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটায় শুনেও ভেতরটা খচখচ করতে লাগল। মেয়েটা যদি আমি খুব গবেট না হই তাহলে ঠিক জানি একটা সাচ্চা লোক পেয়েছি।

এতক্ষণ মনে ছিল না, পেট্রল পাম্পের আঙিনায় পা দিয়ে অফিস ঘরের সামনের কাচের দেওয়ালের ও-ধারে—জেরির হাসিমুখ দেখেই ভেতরটা রাগে চিড়বিড় করে উঠল। চাউনি দেখে মনে হল গত রাতের মজা এখনো রয়ে সয়ে উপভোগ করছে। দাপটের সঙ্গে মালিকের মেয়ে নয়—মালিকের মতোই বৃন্দাবনকে নিয়ে অফিস ঘরে ঢুকলাম। সঙ্গে দেখা অথচ অচেনা মুখ দেখে মা মুখ তুলে তাকালো।

—মা এর নাম বৃন্দাবন, এ আজকের থেকেই এখানে কাজে লাগবে। ঘুরে দাঁড়ালাম।—ক্যাসিয়ার বাবু, আজ থেকেই একে সব কাজ শিখিয়ে দাও, কাল-পরশু দু'দিনেই সব শিখে নিলে তোমার ছুটি, পাওনা ছাড়াও মা তোমাকে এক মাসের মাইনে আগাম দিয়ে দেবে—কিন্তু শুধু বসে বসে ক্যাশ মেলানো আর ক্যাশ হ্যাণ্ডেল করলেই চলবে না, ক্যাশমেমো কাটতে হবে, দরকার পড়লে উঠে গিয়ে কাস্টমারের গাড়িতে তেল ভরেও দিতে হবে—বুঝলে ? তারপর কেমন কাজ করো দেখে মাইনের কথা—

শেষেরটুকু বৃন্দাবনের উদ্দেশে। সে সবিনয়ে মাথা নাড়ল।

সোজা না তাকিয়েও টের পাচ্ছি জেরি একবার বৃন্দাবনকে দেখছে আর একবার আমাকে। আর হাসি তো পুরনো ব্যামোর মতো ঠোঁটে লেগেই আছে।...সমস্ত রাত ধরে ওই হাসির চূড়ান্ত দেখেছি কাল। কিন্তু আসতে না আসতে মেয়ের এই অফিসি মেজাজ দেখে মা অবাক একটু। এবারে মুখ খুলল।—একে তুই কোথায় পেলি, এর কোয়ালিফিকেশন কি ?

—রাস্তায় পেলাম। মেন্ কোয়ালিফিকেশন ও বাঙালী। বলেই জেরির মুখের ওপর দু'চোখের ঝাপটা মারলাম একটা।

মায়ের মুখখানা এমন হল যেন আমার মাথা ঠিক আছে কিনা ভেবে পাচ্ছে না। আবার চোখাচোখি হতে শুধু বলল,, বংগালি !



তার উচ্চারণ ধরে আরো জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ—বং-গা-লি ! আমার দোকানের কোনো লোক কোন্ সাহসে বলে এখানে কোনো বাঙালীর চাকরি হবে না—এমন বলার অথরিটি তুমি কাউকে দিয়েছ ?

বলেই জেরির মুখের ওপর আর এক ঝলক আগুন ছিটোলাম। মায়ের তাইতেই বুঝে নেওয়ার কথা আসামী কে। তার ভেবাচাকা খাওয়া মুখ। দশদিন বাদে যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি সাধারণ দু'জন কর্মচারীর সামনে এ-ভাবে তাকে হেয় বা অপদস্থ করা উচিত নয়- এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। কিন্তু ওই হাসি-মাখা মজা-ছোঁয়া মুখটা থেঁতলেই দিতে ইচ্ছে করছে, জ্ঞান-গম্যির কথা আলাদা।

মা এবার বৃন্দাবনের বিড়ম্বিত মূর্তিখানা ভালো করে দেখে নিল। বৃন্দাবন ভয়ে ভয়ে একবার জেরির দিকে তাকাচ্ছে, একবার মায়ের দিকে। মায়ের হাবভাব তেমন অনুকূল লাগছে না ওর। এবারেও মা আমাকেই জিগ্যেস করল, ও লেখাপড়া জানে ?

জবাব দিলাম, ও হায়ার-সেকেণ্ডারি পাশ—।

—সার্টিফিকেট দেখেছিস ?

বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি আগ বাড়িয়ে আমাকে বলল, সার্টিফিকেট ওই চায়ের দোকানে আমার সুটকেসে আছে—নিয়ে আসব ?

শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু মা সন্দিগ্ধ।—সার্টিফিকেট চায়ের দোকানের সুটকেসে কেন ?

মায়ের এত খুঁতখুঁতুনি বিরক্তিকর।—ও-সব কথা পরে শুনবে, সার্টিফিকেট এক্ষুনি এনে দেখাতে হবে কিনা তাই বলো।

এবারে মা ছেলেটাকে চিনতে পেরেছে। গম্ভীর।—ওকে ওই চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে গান করতে দেখি না ?

—হ্যাঁ, গান শুনতে শুনতে কাজ করলে আমার মেজাজ ভালো থাকে বলে ওকে ধরে এনেছি। বৃন্দাবন, বাইরে গিয়ে তুমি কিভাবে ওরা পেট্রল ডিজেল দিচ্ছে দেখো। কাল সার্টিফিকেট এনে মা-কে দেখিও।

বৃন্দাবন আপাতত মা আর জেরির সামনে থেকে সরে বাঁচল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ক্যাশিয়ারও বিদায় নিল। তার দশটা-ছ'টা ডিউটি। তার কাজ তখন জেরি বা আমি করি। আজ আমিই তার জায়গা নিলাম। এবার মা ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, হুট্ করে একটা বাঙালি ছেলেকে এনে বসিয়ে দিলি, কি ব্যাপার ?

আমার ঝাঁঝালো উত্তর, বাঙালি কি দোষ করেছে, আর জেরিই বা তাকে এ-কথা বলার কে ?

রাগ দেখে জেরি মজা পাচ্ছে। জানান দিল, মাদারই ও-কথা বলেছে, এই ছেলেটার কথাই আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলাম।

দোষ নেই বুঝলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিতরে রাগ। মা-কে বললাম, বাজে চিন্তা

কোরো না, আমার বিশ্বাস ওই বৃন্দাবনই এখানকার সব থেকে ভালো আর নির্ভরযোগ্য লোক হবে।

গণ্ডারের চামড়ায় এই খোঁচাও এতটুকু বিঁধল মনে হল না। তক্ষুনি আক্কেল দেবার মতো অন্য কথা মনে এলো। বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ দশদিন বাদে বিয়ে দিতে হলে তোমাকে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে পড়তে হবে —নোটিস দিলে বিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, ক্যানসেল করে আবার সময় নিয়ে নোটিস দিলেই হবে।

জেরি বরাবরই খুব আস্তে আর মোলায়েম গলায় কথা বলে। অম্লানবদনে স্যুর দিল, তাড়ার কি আছে, বিয়ে হয়ে গেছে ধরে নিলেই হল।

আমার দু'চোখে আগুন ঠিকরলো। আমার ছেলেমানুষি দেখে মায়ের ঠোঁটে হাসির ছোঁয়া।

হালকা মৃদু শিস দিতে দিতে জেরি অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। সামনের আঙিনা ছাড়িয়ে রাস্তার অন্ধকারে মিশে গেল। যাবার আগে কোনদিনই কিছু বলে যায় না, আর হাঁটাচলার ভঙ্গিও বরাবরই এই রকমই। তাছাড়া সন্ধ্যার পর দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে না বেরুলে ও চলেই যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে এ-সবকিছুই আমার চোখে ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটি।

মা আমার দিকেই চেয়ে অল্প অল্প হাসছিল। চোখাচোখি হতে বলল, দু'দিন বাদে বিয়ে, অত রাগারাগি কুরিস কেন।

—তুমি ওকে বড় বেশি আস্কারা দিয়েছ, না বলেকয়ে ও এভাবে চলে যায় কেন ?

মা রসিকতাও জানে। ঠোঁটের হাসি খুব স্পষ্ট না হলেও মজা পাচ্ছে বোঝা যায়।—চলে গেলে এত রাগ হয় যখন তুইও সঙ্গে গেলি না কেন।

মায়ের মুখেও এক ঝলক চোখের আগুন ছিটিয়ে কাজে মন দিতে চেষ্টা করলাম। মন বসছে না। ভিতরের রাগ নিজের দিকেই ঘুরছে।...মায়ের রসিকতার মধ্যে সত্যের হুল আছেই। জেরি রুবিনের মিটিমিটি হাসি, চাউনি, টিমে তালের কথা, পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করা, পাশাপাশি বসে গাড়ি হাঁকানো—সব কিছুর মধ্যে একটা লোভাতুর স্পর্শ অনুভব করি সেটাই খাঁটি সত্য। বিচার করতে হলে কাল সমস্ত রাত ধরে যা করেছে সে-রকম নীতিবতী হলে ওকে জেলে পাঠানো উচিত। সেই বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল স্পর্শ এখনো হাড়ে মাংসে লেগে আছে।

...অথচ রাতের বিছানায় মনে হয়েছে রাগের মাথায় মা-কে বিয়ে আরো পিছিয়ে দিতে বলেছিলাম, কিন্তু দশটা দিনই বেশ লম্বা মনে হচ্ছে।

তার পরদিন থেকেও দিনে রাগ আর ঝগড়া। রাতে প্রতীক্ষা।

পরের কটা দিন মা রীতিমতো ব্যস্ত। বাংলো সাজানো-গোছানো, কিছু আসবাবপত্র কেনা, ডাক্তার অরুণলাল আর প্রসাদগুপ্তা মালা গুপ্তার সঙ্গে পরামর্শ করে পার্টির ব্যবস্থা করা, কার্ড ছাপানো—এক কথায় নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। মা তাই জেরির সামনেই আমাকে বলেছিল ওর সঙ্গে জামসেদপুর গিয়ে পছন্দমতো পোশাক-আশাক



কিনে নিয়ে আসতে। শোনামাত্র ওর দু'চোখ লুব্ধ হতে দেখেছি। সাহস করে এ ক'দিন জেরিকে নিজের গাড়িতে পর্যন্ত ডাকিনি। আমি জানি এ মওকা পেলে ও আবারও আমার সব প্রতিরোধ চুরমার করে দেবে। মুখ ঝামটা দিয়ে ওকে বাতিল করেছি, মা-কেই টেনে নিয়ে গেছি। কিন্তু ওই শয়তানকে নেবার লোভ কত কষ্টে ঠেকিয়েছি নিজেই জানি।

বিয়ের তিন-চারদিন আগে থেকে মা-কে বেশ গম্ভীর গম্ভীর দেখছি। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বলে মন খারাপ হতে পারে। কিন্তু দূরে তো কোথাও যাচ্ছি না, লিলি কটেজ মানে মায়ের ওই বাংলোতেই থাকছি আমরা। বলতে ভুলে গেছি আমাদের বাংলোর নাম লিলি কটেজ।

বিয়ের দু'দিন আগে ছোট্ট একটু ধাক্কা খেলাম। আর সেটা সদ্য যাকে চাকরি দিয়েছি সেই বৃন্দাবনের কাছ থেকেই। প্রথমে ধৃষ্টতা মনে হয়েছিল কিন্তু পরে দোষ ধরার বদলে একটু মায়াই হয়েছিল।

দোকানের অফিস ঘরে সেদিনও সন্ধ্যার পরে শুধু ও আর আমি ছিলাম। জেরি সকালের দিকে কখনো সখনো এক আধবার আসে, এক দেড় ঘণ্টা থেকে চলে যায়। এ দু'দিন আর আসবেই না বলে গেছে। বৃন্দাবন কাজ করছে, কিন্তু মুখখানা শুকনো শুকনো লাগছে। থেকে থেকে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ভক্তের মন নাকি কেবল ঈশ্বর বোঝে। কিন্তু এই কটা দিনের মধ্যে ছেলেটা আমার কত ভক্ত হয়ে পড়েছে সেটা আমিও অনুভব করতে পারি। ওকে পেয়ে এই ক'টা দিন মনের সাধে বাংলা কথা বলছি, গল্প করছি। অনেক সময় কাজ থাকে না, চুপচাপ বসে থাকতে হয়। বললেই ও তখন ভারী দরদ দিয়ে বাংলা গান শোনায়। আগেই সাবধান করে রেখেছিলাম, মাকে দেখলেই থেমে যাবে। কিন্তু মায়ের বাস্ততায় এ-রকম ব্যাঘাত ঘটেনি। আরো সুবিধে, ঘরের সামনে আর দু'পাশে কাচের দেয়াল, দরজাতেও কাচ বসানো—বাইরের কাজের ছোকরা দুটো বা মনবাহাদুরের কানে কিছুই যায় না। অপলকে চোখে আমার দিকে চেয়ে গাইতে গাইতে ও বিভোর হয়ে যায়। আর আমার দুঃখই হয়, সুযোগ সুবিধে পেলে ও নাম করা শিল্পী হয়ে উঠত।

এই সন্ধ্যায় ওর শুকনো মুখ আর হাবভাব দেখে মনে হল আমার বিয়ে বলেই ও বোধহয় বিষণ্ণ একটু। তখন এখানে আর একজনের প্রতাপ বাড়বে ভাবছে হয়তো। তাছাড়া ভক্তরা তাদের দেবীর বিয়ে পছন্দ করে কিনা কে জানে। আর মনে হল কিছু বলি-বলি করেও সাহস করে বলে উঠতে পারছে না। এই ক'দিনের মধ্যেই ও মায়ের মুখে বিনড়া আর তাই থেকে আমার মুখে বৃন্দা হয়ে গেছে। সুযোগ দেবার জন্যই জিগ্যেস করল, বৃন্দা, কি ভাবছ অত ?

ও সচকিত একটু।—না...একটা কথা বলব মিস লিলি ?

গম্ভীর রসিকতায় একটা আঙুল তুলে বললাম, একটার বেশি নয়। সাহস পেয়ে চেয়ারসুদ্ধ আমার দিকে ঘুরে বসল।—পরশু জেরি সাহেবের সঙ্গে আপনার বিয়ে ?

সাত আট দিনের মধ্যে এই ছেলে আমার প্রেমেই পড়ে গেল নাকি রে বাবা ! হালকা হেসে তাকালাম।—সবাই তো তাই বলছে, কেন তোমার আপত্তি আছে ?

—ইয়ে, তা না...আমার একটু চিন্তা হচ্ছে...আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু শুনলে আপনি না রেগে যান।

আমি উৎসুক।—এবারে না শুনলে রেগে যাব—কেন চিন্তা হচ্ছে ?

—আপনাকে জেরি সাহেবের কতগুলো খারাপ অভ্যাস দূর করতে হবে...খুব জুয়া খেলে, খুব ড্রিংক করে, আর সিগারেটের সঙ্গেও কি নেশার জিনিস মিশিয়ে খায়—

ড্রিংক একটু আধটু করে আমি জানি, খুব কড়া সিগারেটের উৎকট গন্ধও এক-একসময় পাই। এনিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। জামসেদপুরে কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সখ করে নিজেও একটু আধটু ড্রিংক করেছি। মাঝে বোতল থেকেও কখনো সখনো চেখে দেখেছি। দুই একদিন সিগারেটও টেনেছি। দুটো জিনিসই বিচ্ছিরি লাগে তাই সখ গেছে। আমার মা রোজ গুণে পাঁচ ছটা সিগারেটও খায়। আর জেরি তো মায়ের সামনেই সিগারেট টানে।

আমার চাউনি রুষ্ট হয়ে উঠল।—খুব জুয়া খেলে, খুব ড্রিংক করে আর সিগারেটে নেশার জিনিস মিশিয়ে খায় এ-সব খোঁজখবর তুমি কার কাছ থেকে জোগাড় করলে আর কেনই বা করলে ?

বৃন্দাবন ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, নিজে দেখেছি...

এবার আমার উষ্ণ জেরায় পড়ে ওকে কবুল করতে হল কি দেখেছে আর কি করে দেখেছে।...জেরি সাহেব সদয় হলে চাকরি হতে পারে জেনে ও কিছুদিন তার পিছনে ঘুরছিল। জেরি সাহেব দিলের মানুষ, ওকে তার আড্ডায় নিয়ে গিয়ে গান-টান শুনেছে, সকলে মিলে আনন্দ করেছে। জুয়া খেলতে আর নেশা করতে তখন দেখেছে। চাকরির আশায় একমাত্র সম্বল ঘড়িটা বেচে দিয়ে বৃন্দাবন জেরি সাহেবকে ভালো রেস্তরাঁয় খাইয়েছে। জেরি সাহেব সেদিনও ওকে তার জুয়ার আর নেশার আসরে নিয়ে গেছল। বেশি নেশা করে জেরি সাহেব সেদিন ওর কাছ থেকে ঘড়ি-বিক্রীর বাকি টাকা ধার নিয়ে জুয়া খেলেছিল আর হেরেছিল। কিন্তু দু'দিন পরেই ওকে জানিয়েছে এ-দোকানে কোনো বাঙালির চাকরি হবে না। আমার মুখে রাগের আঁচ দেখে বৃন্দাবন সামাল দিতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, পেটের দায়ে ওকে এ-কাজ করতে হয়েছিল। আর বলেছে, এখানকার লোকে জেরি সাহেবের নামে যা-ই রটাক, এতদিন মেলামেশা করে মিস লিলি যখন তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে নিশ্চয় ভালো লোক। কিন্তু তার জুয়া খেলা আর নেশা করা ছাড়ানো দরকার বলেই মিস লিলিকে তার দুশ্চিন্তার কথা না জানিয়ে পারছে না।

শুনতে ভালো লাগেনি, কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা খুব একটা হয়নি। পুরুষ মানুষের এ-সব ত্রুটি বড় কিছু চরিত্র দোষ ভাবি না। আর জেরি যে বেপরোয়া মানুষ, ঝোঁক চাপলে অনেক কিছু করে বা করতে পারে সেটা আমি ছেড়ে মা-ও জানে। ও অত



বেপরোয়া না হলে শুধু চেহারার জোরে আমার মন পেত কিনা সন্দেহ। কিন্তু বৃন্দাবন ছেলেটার ওপর আমার রাগ গিয়ে মায়াই হয়েছে। বেচারার ঘড়ি বিক্রীর টাকায় জেরি রেস্তোরাঁয় খেয়েছে আর জুয়া খেলেছে সে-জন্য সুযোগ পেলেই আমি তাকে ঠুকব। কিন্তু তা বলে রাগের মাথায় কিছু বলব না বা করব না। তাতে ভবিষ্যতে এই ছেলেটার ক্ষতির সম্ভাবনা।

সকালে বিয়ে হয়ে গেল। সঙ্গে আর একটা গাড়িতে কেবল প্রসাদ গুপ্তা আর তার স্ত্রী ছিল। জামসেদপুর থেকে ফেরার সময় মা-ও তাদের গাড়িতে চলে গেল। এই গাড়ি জেরি চালাচ্ছে। আমি পাশে। জেরি এক-একবার আয়েসী চোখে তাকাচ্ছে, আর হাসছে মিটিমিটি। এক সময় বাঁ হাতটা আমার কাঁধে তুলে দিল। আমি এক ঝটকায় ওটা নামিয়ে দিলাম।

—এখনো অনুমতি নিতে হবে ?

—এখন আরো বেশি অনুমতি নিতে হবে।

—তাহলে সেই গাছটার নিচে আজ আর গাড়ি থামাব না বলছ ?

—থামালে ধাক্কা মেরে তোমাকে গাড়ি থেকে বার করে দেব।

খানিক বাদে ওই হাত আবার আমার কাঁধে। তারপর পিঠ ঘষ্টে সেটা বাঁ-দিকের কাঁধে। আঙুলের চাপে মাঝের ফারাক একটু ঘন করার চেষ্টা।—আমি থট্-রিডিং জানি...কি ভাবছ বলে দেব ?

জবাব না দিয়ে তাকালাম শুধু।

হাসছে।—ভাবছ...রাতের এখনো অনেক দেরি।

হাতে একটা থামচি বসিয়ে দিয়ে আবার ওটা কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেললাম। সকোপে বললাম, রাতে তোমাকে আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে ঘরের দরজা বন্ধ করব।

হাসছে।—যদি পারো...বেট হয়ে যাক।

সন্ধ্যা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত পার্টি। বাংলোর পিছনের জমিটা ঢেকে সেখানে আয়োজন করা হয়েছে। অতিথিরা সন্ধ্যার পর থেকেই আসতে শুরু করেছে। মৌভাণ্ডার কপার করপোরেশন আর রাখা মোসাবাণীর পদস্থ অফিসারদের সস্ত্রীক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তেল নেওয়ার সুবাদে আমি ভদ্রলোকদের অনেকের মুখ চিনি এই পর্যন্ত। ভদ্রমহিলাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই মালা গুপ্তার ভাব দেখলাম। তারা উপহার নিয়ে এসেছে, হাসিমুখে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এরই মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, জেরি রুবিনকে কেউ বিশেষ আমল দিচ্ছে না, হেসে তার সঙ্গে কেউ দুটো কথাও কইছে না। জেরির আমন্ত্রিত জনা পঁচিশ বন্ধু-বান্ধবীর মুখ এই প্রথম দেখলাম। বাঙালি অবাঙালি দুই-ই আছে। জাদুচকের বড় রেস্তরাঁর মালিককেও তাদের মধ্যে দেখা গেল। জেরি তাদের নিয়েই খুশিতে মেতে আছে। মায়ের গণ্যমান্য আমন্ত্রিতরা তাদের খুব সদয় চোখে লক্ষ্য করছে না। আর থেকে থেকে আমাকেও কেমন যেন অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখছে।

আমার আমন্ত্রিত শুধু একজন। বৃন্দাবন। সে মা-কে সাহায্য করতে ব্যস্ত। কলকাতায় দাদুর বাড়িতে থাকতে আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে অনেকবারই গেছি, সে হৈ-চৈ, উচ্ছল আনন্দ ভোলবার নয়। কিন্তু এ যেন রামগড়ুরের ছানারা সব এসেছে। জোড়ায় জোড়ায় এসে অভিনন্দন জানিয়ে আর উপহার দিয়ে যা-ও একটু-আধটু হাসছে তা-ও যেন কলের হাসি। তারপর ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই টুকটাক কথাবার্তা কইছে, আর থেকে থেকে আমার দিকে অনুকম্পার চোখে তাকাচ্ছে।

লক্ষ্য মালা গুপ্তাও করেছে। আগে জেরির প্রতি তারই সব থেকে নির্লিপ্ত ভাব দেখেছি। একফাঁকে কাছে এসে কানে কানে বলল, হাবভাব দেখো সকলের—যেন হাত-পা বেঁধে তোমাকে একেবারে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আসলে সক্কলেই ওরা জেরিকে খুব ভালো চেনে কিন্তু—

ভালো লাগছে না। আসলে মালা গুপ্তাও সহানুভূতি দেখালো, না ঘুরিয়ে শোনালো কিছু বোঝা গেল না।

ডাক্তার অরুণলাল সন্ধ্যা থেকে মায়ের সঙ্গে অতিথিদের তদ্বির তদারকে ব্যস্ত ছিল। অতিথিরা সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে লক্ষ্য করছিলাম। ডিনারে বসার আগে ধীরস্থির সৌম্য মানুষটা আমার দিকে এগিয়ে এলো। ঠোঁটে হাসি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সব থেকে দামী উপহার সে-ই বার করল। হাতে পরার বেশ মোটা সোনার চেন একটা। দেখলেই বোঝা যায় কম করে তিন সাড়ে তিন ভরি ওজন হবে। ওটা সামনে ঝুলিয়ে অনুমতি চাইল, পরিয়ে দিতে পারি?

আমি হেসেই হাত বাড়িয়ে দিলাম। একদিকে আঙটা লাগানো আছে, অন্যদিকে মাপ-মতো পরাবার কয়েকটা খাঁজকাটা। অরুণলাল দু'হাতে চেনটার দু'মাথা ধরে আমার হাতে পরাবার আগেই মালা গুপ্তা ছদ্ম বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে তুলে পাশে হাজির।—এ কি কাণ্ড ডাক্তার, সোনার হলেও ওটা শেকলই—জেরির বদলে আজকের দিনে তুমি ওটা ওর হাতে পরাচ্ছ!

ডাক্তার হাসি মুখেই চেনটা আমার হাতে আটকে দিল। সে ব্যাচিলর মানুষ, তাকে নিয়ে রসিক মেয়েদের একটু ঠাট্টা করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমি পাল্টা রসিকতা করতে ছাড়লাম না। এই টিকলিতে ডাক্তার অরুণলালের সঙ্গেই মালা গুপ্তার সব থেকে বেশি ভাব এ এখানকার কারো বোধহয় জানতে বাকি নেই। তার পাবলিসিটির জোরে এখানে তো বটেই, ঘাটশীলা রাঙা মোসাবাণীতেও ডাক্তারটি প্রিয়জন হয়ে উঠছে। মালা গুপ্তা নিজের গাড়িতে তাকে ঘাটশীলার ক্লাবে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, কারো কারো বাড়িও নিয়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে যাবার জন্য ও-দিক থেকে পেসেন্টের গাড়ি আসে, গাড়িতে পৌঁছেও দেয়। দোকানে বসে লক্ষ্য করেছি। প্রসাদ গুপ্তা এখানে না থাকলে তার গাড়িতেও ডাক্তারকে রোগী দেখতে যেতে দেখেছি। আর সন্ধ্যার চেম্বার আওয়ারস্-এর পর রাতে ভদ্রলোক গুপ্তাদের বাংলোয় গল্প করতে যায় সুযোগ পেয়ে অ্যানজেলা এ-খবরও আমার কানে তুলে দিয়েছে। এক



রাতে মায়ের জন্য তাকে দরকার হতে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, অ্যানজেলা এসে বলেছিল, ঘড়িতে এখন আটটা সতের...ডাক্তার সাহেবকে চেম্বারে পাবে না ছোট মেমসাহেব—গুপ্তা সাহেবের বাংলোয় ফোন করলে পাবে। তাই পেয়েছিলাম। আমি আগ্রহ দেখালে কালো মুখ জটিল করে হয়তো আরো কিছু সমাচার শোনাতে পারত। সঙ্গীসাথী পরিবৃত অ্যানজেলার দুপুরের জটলায় কিছু রসালো রটনা স্বাভাবিক ভেবে আগ্রহ দেখাইনি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ব্যাচেলর ভদ্রলোক দেশের পরিচিত শুভার্থিনীর বাংলোয় গল্প করতে যেতেই পারে। মায়ের মুখে শুনেছি নিজের বলতে এই ডাক্তারের খুব আদরের একটা পোষা কুকুর আছে। মেয়ে কুকুর, নাম বেবি। ডাক্তারের হাতে খায়, তার সঙ্গেই শোয়, ঘুমোয়। দেখা হলেই মা সস্নেহে জিগ্যেস করে, লাল, তোমার বেবির খবর কি? অরুণলাল মায়ের কাছে শুধু লাল হয়ে গেছে।

মালা গুপ্তার এই রসিকতা শুনে ডাক্তার হাসল শুধু। কিন্তু আমিও হেসে প্রায় মালা গুপ্তার মতো ঢং করেই বললাম, এই শেকলের ওপর যদি আমার থেকে তোমার বেশি দাবি থাকে তো বলে খুলে দিই।

সুশ্রী মুখখানা যতটা সম্ভব কুঁচকে মালা গুপ্তা বলল, নাঃ, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিসে আমার লোভ নেই।

সাদা অর্থে আমার হাত থেকে গেলে ওটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা সরে যেতে মোটা চেনটার দিকে চেয়ে কিরকম খটকা লাগল। অত সলিড সোনার নতুন চেন ঝকঝক করার কথা। কিন্তু তা মোটেই নয়। অনেকদিনের ব্যবহারের গয়না যেমন দেখতে হয়, তেমনি। রং-পালিশ করা হলেও এতে নতুনের চেকনাই দেখা যেত।...এত সোনার গয়না নতুন হলে তার সঙ্গে তেমনি সুন্দর বাক্স থাকার কথা। নেই।...অরুণলাল এটা পকেট থেকে বার করেছে। না, এ-চেন নতুন কখনোই নয়। মালা গুপ্তার রসিকতার দ্বিতীয় কোনো অর্থ আছে কিনা ভাবতে গিয়ে মনে হল সে সাদা অর্থেই ও-কথা বলেছে।...এ চেন ডাক্তারের মায়ের হবে। অনেক মা-ই ছেলের বউয়ের জন্য গয়না রেখে যায়। তার থেকেই এটা হয়তো তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরনো হলেও সোনা সোনাই। মানুষটাকে উদার বলতে হবে।

ডাক্তার আর প্রসাদ গুপ্তার সুব্যবস্থায় রাত ন'টার মধ্যেই পার্টি শেষ। মালা আর প্রসাদ গুপ্তা, আমি আর জেরি, অরুণলাল আর মা বাংলোর সামনের বারান্দায় এসে বসেছি। অরুণলালের চোখের ইশারায় মায়ের মুখখানা লক্ষ্য করলাম। জেরির দিকে চেয়ে আছে। গণ্ডীর আর মুখ বেশ লাল। ভাবলাম ক্লান্তিতে আর উত্তেজনায় প্রেসার চড়েছে। জিগ্যেস করলাম, মা তোমার শরীর খারাপ লাগছে?

কিছু ভাবছিল বোধহয়। আমার দিকে ফিরল। শরীর নিয়ে মা একটু বেশি সচেতন।—কেন, খারাপ দেখছিস?

সকলের অলক্ষ্যে আমার দিকে চেয়ে ডাক্তারের ভ্রূকুটি। অর্থাৎ জিগ্যেস করা ঠিক হয়নি। কিন্তু আমার ভুলের জের প্রসাদ গুপ্তা আরো টেনে বাড়ালো। সে বলে বসল,

বেশ লাল দেখছি, ডাক্তার—আজ তুমি তোমার প্রেসার মাপার যন্ত্র আনোনি নিশ্চয় ?

মায়ের চোখেমুখে উদ্বেগ। ডাক্তারের দিকে তাকালো। বিরক্তি চেপে অরুণলাল বলল, ওঁকে আপনারা মিথ্যে ভাবান কেন, আজকের দিনে প্রেসার একটু-আধটু কার না বেড়েছে—ও কিছু না, সী ইজ টায়ারড্—নার্থিং এল্‌স। নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠল, মায়ের কাছে গিয়ে বলল, উঠুন, ঘুমের ওষুধ কি আছে দেখি—কিচ্ছু ভাববেন না, ইউ আর পারফেক্টলি অলরাইট।

হাত ধরে মা-কে তার ঘরে নিয়ে গেল। আমাকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে মাল্য গুপ্ত জেরির দিকে তাকালো।—কিগো জেরি সাহেব, অমন চনমন করছ কেন—আমরা রাত বারোটার আগে উঠছি না।

ভাবলাম এই মেয়ে এতদিন জেরিকে মানুষের মধ্যে গণ্য করত না, আমার সঙ্গে বিয়ে হবার ফলে ওকে পদস্থ ভাবছে এখন। স্ত্রীর রসিকতার বড় সমঝদার প্রসাদ গুপ্তা। সে হা-হা শব্দে হেসে উঠল। কিন্তু জেরির জবাব শুনে আমারই মুখ লাল। ও টিপটিপ হেসে খুব নরম গলায় বলল, কেন মিথ্যে নিজেই কষ্ট পাবে, যত রাতই হোক আজকের রাতে ওই ভদ্রলোক কি তোমাকেও ছাড়বে।

এই বেপরোয়া রসিকতায় ওই ভদ্রলোক অর্থাৎ প্রসাদ গুপ্তা বিড়ম্বিত মুখে স্ত্রীর দিকে তাকালো। মাল্য গুপ্তা বলে উঠল, অসভ্য কোথাকারের !

নিশ্চিন্ত হয়ে প্রসাদ গুপ্তা হেসে সায় দিল, দিস্ ইজ ট্রু মাচ্ !

পনের বিশ মিনিটের মধ্যে তারা বিদায় নিল। ডাক্তারকেও নিয়ে গেল—তাকে তার কোয়ারটার্স-এ নামিয়ে দিয়ে যাবে।

জামাটামগুলো না বদলানো পর্যন্ত ভালো লাগছিল না। ঘরে এসে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে গরুমহিষাণির ডাকবাংলোর সেই রাতটা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরল। আমি সেদিনের মতোই নিষ্পন্দ খানিকক্ষণ।...কিন্তু সেই স্মৃতির ধাক্কায় তলায় তলায় লোলুপ প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার তাড়না গত দশদিন আমাকে জ্বালিয়েছে। হঠাৎ মনে হল, এই রাতটাই প্রতিশোধের একমাত্র সময়। নিজের ওপর প্রতিশোধ, আর যে-লোকটা বাসনার সমস্ত নখ-দাঁত মেলে থাবা চাটছে তার ওপর প্রতিশোধ। মনে হল এই রাতের প্রত্যাখানের ওপরেই ভবিষ্যতের সুখ-শান্তি নির্ভর করছে। নিজের প্রত্যয় ফিরে পাব। ওই লোকও সত্তার জোর দেখে আত্মস্থ হবে। শুধুই বাসনার অতলে টেনে নিয়ে যাবার মতো ঠুনকো সহচরী ভাববে না।

বেশ ঠাণ্ডা, তবু ঠাণ্ডা জলেই ভালো করে চান করলাম। অটুট সংকল্প নিয়েই বেরিয়ে এলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দেওয়া হয়েছে। পোশাক বলতে জেরির পরনে একটা পা-জামা শুধু, গায়ে কিছু নেই। খাটে হেলান দিয়ে বসে কটু-গন্ধের কড়া সিগারেট টানছে। আমাকে দেখেই ঠোঁটে টিপটিপ হাসি। চোখ দুটো খুশিতে চিকচিক করছে। সিগারেটটা পাশের টেবিলের অ্যাশ ট্রেতে গুঁজল।



সিগারেটের অমন কড়া কটু-গন্ধ নাকে আসতে বৃন্দাবনের সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল। গম্ভীর চোখে তাকালাম, সিগারেটে অমন গন্ধ কেন ? কি সিগারেট ওটা ?

—আমার নিজের তৈরি নিজের ব্র্যাণ্ডের সিগারেট...।

—ওতে নেশার কিছু মিশিয়েছ ?

হাসতে হাসতে উঠে কাছে এলো, আজকের রাতে অন্য কোনো নেশার দরকার আছে ?

বলল বটে, কিন্তু বেশ উগ্র গন্ধ নাকে এলো। আমার হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে জেরি সোনার চেনটা ভালো করে দেখল।—বাঃ, সুন্দর তো, কে দিল তোমার মা ?

আমার সংকল্প স্থির তাই হাত টেনে নেওয়া দরকার মনে করলাম না।—ডাক্তার অরুণলাল দিয়েছে।

—বলো কি ! চোখেমুখে প্রগলভ বিস্ময়। —এ জিনিস তোমার মা-কে না দিয়ে সে তোমাকে দিতে গেল !

ইতর রসিকতা শুনে হাত টেনে নিয়ে ওকে ধাক্কা মেরে সরালাম।—তার মানে ?

—আ-হা, মুখ ফসকে কি বলে ফেললাম। আরো এগিয়ে এসে আবার হাত টেনে নিতে চেষ্টা করল।

—এগোবে না, ওইখানে দাঁড়াও !

থমকে দাঁড়ালো।—কি ব্যাপার, সত্যি ঘাড় ধাক্কা দেবে নাকি ?

—দেব না, যদি তুমি আমার কথার কোনরকম নড়চড় না করো।

—কি কথা ?

—ওই বিছানায় উঠে আজ তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না, আমাকে ছোঁবে না, দু'জনের মাঝখানে বালিশ থাকবে সেটাও সরাবে না। সে চেষ্টা করলে হয় তোমাকে এদিকের কোণের ঘরে একলা রাত কাটাতে হবে না-হয় আমাকে।

—ও বা-বা ! কেন, আজকের রাতটা কি ?

বলতে পারতাম, আমি আজ খুব ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। কিন্তু মিথ্যের রাস্তায় গেলাম না। বললাম, এই রাতটা আমি নিজের মধ্যে থাকব, আজ তোমার বিছানা অন্য ঘরেই করতে বলতাম, বলিনি কারণ বড় খাট, আমাকে কোনরকম ডিসটার্ব না করলে তুমি একপাশে শুয়ে থাকতে পারো।

চেয়ে আছে। এখন শুধু চোখ দুটো হাসছে।—ও, কে...ডান ! কিন্তু কথা দিচ্ছ তোমার নিজের কথার এতটুকু খেলাপ হবে না, পরে আবার কিছু তোমার মাথায় ঢুকবে না—কিচ্ছু বলবে না ?

ও আমাকে এমনি ঠুনকো ভাবছে দেখে রাগ হচ্ছে।—সে দেখতে পাবে, আমি তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করছি না।

—ভেরি গুড। বলেই চোখের পলকে দু'হাতের হ্যাঁচকা টানে আমাকে বুকে টেনে

নিল। ক্ষিপ্র দস্যুর মতো ওর দাঁত-মুখ দুই ঠোঁটের ওপর চড়াও হল, আসুরিক শক্তিতে আগলে রেখে অন্য হাতে জামার বোতামগুলো পটাপট টেনে ছিঁড়ল। সেই হ্যাঁচকাটানে জামারও খানিকটা ছিঁড়ে গেল। আমি রাগে রক্তবর্ণ, কিন্তু দম ফেলার বা কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না। ওর দু'হাতের দশ আঙুলও একই সঙ্গে নির্মম হয়ে উঠছে। প্রাণপণ যুঝে ওকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছি, রাগে মাথার ভিতরটা দাউদাউ জ্বলছে।

মুখের ওপর জোরে দুই ঠোঁট ঘষতে ঘষতে অদ্ভুত নরম গলায় টেনে টেনে বলল, কথা দিয়ে কথার খেলাপ করতে চাইছ কেন, বলেছ বিছানায় উঠে তোমাকে স্পর্শ করব না, ছোঁব না—এর বাইরে তোমার আর কোনো শর্ত ছিল না, আই অ্যাম এ ম্যান...ডোন্ট অলওয়েজ নিড এ বেড্...ডোন্ট রেজিস্ট অর ইউ উইল বি হার্ট, এটা বিছানা নয়...আমি কোনো শর্ত ভাঙছি না...

ও যে এতবড় শয়তান ধারণা ছিল না। নিজের বোকামির ফাঁদে পড়েছি। অসহায় বোধ করছি।...ও যা করছে হাত দুটো দিয়ে আর মুখ দিয়ে তা কুৎসিত। কুৎসিত! কিন্তু তাই করেই শরীরটার মধ্যে যেন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, সেই আগুন সর্বাঙ্গে ছড়াচ্ছে, মাথায় উঠছে। পলকে পলকে ও আমাকে গ্রাসের আওতায় নিয়ে চলেছে। আর বিড় বিড় করে কথা বলছে।—ডার্লিং...ডার্লিং...রাগ করো না...নিষেধ ভাঙার আনন্দ কাকে বলে দেখো...নিষেধ যত...তা ভাঙার আনন্দও ততো...ঈশ্বরের নিষেধও ভাঙার জন্য না হলে আদম-ঈভ গাছের ফল খেত না—লেট্স গো টু হেল্...লেট্ আস্ গো টু হেভেন...

হ্যাঁ, আমিই ওকে বিছানায় ঠেলে নিয়ে এসেছি। ও শয়তানের হাসি হেসেছে।—তুমি নিজেই তোমার শর্ত ভাঙছ, আমি না।

## ॥ ৬ ॥

ওই প্রথম রাতের সঙ্কল্প রক্ষা হলে কি হত জানি না। হয়নি বলেই কেউ যেন অদৃশ্য থেকে কলকাঠি ঘুরিয়ে আমাকে স্নায়ুর দাস করে ফেলছে। সেই থেকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে আমার অনেক সঙ্কল্প রসাতলে গেছে। নিজেই আমি অনেকই শর্ত ভেঙেছি। অনেক প্রতিজ্ঞা ভুলেছি। দিনে আমার এক সত্তা, যে-সত্তা এই লোকের ওপর নির্মম কঠিন এমনকি নিষ্ঠুরও হতে পারে। হয়ও। কিন্তু রাতে এই আমারই ভিন্ন সত্তা। এই মানুষেরই ভোগের তাণ্ডবে নিঃশেষে হারিয়ে না যেতে পারা পর্যন্ত যার শান্তি নেই, যন্ত্রণার উপশম নেই। দিনে ঝগড়া, শাসন। রাতে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য বিচারশূন্য প্রতীক্ষা।

...জেরি রুবিন কি জাদু জানে?

গোড়ায় গোড়ায় নিজের চরিত্রের ওপর সন্দেহের ছায়া পড়ত। ও যা করে এক কথায় তা ব্যভিচার। যা বলে তা অশালীন। কিন্তু আমি তা বরদাস্ত করি কি করে? যে-কোনো সুস্থ বিবেকের মেয়ের তো ঘৃণায় কুঁকড়ে যাবার কথা, অমন পুরুষকে লাথি



মেরে জীবন থেকে বিদায় দেবার কথা। আমিও ধাক্কা খেয়ে বিমুখ হতে চেয়েছি, বিদ্রোহের চাবুকে ওকে জর্জরিত করতে চেয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি কেন?...পারি না কেন? খালি পায়ে শক্ত কাঁকরের ওপর দিয়ে হেঁটে নরম বাগিচায় পৌঁছনোর মতো এই স্থূল উপকরণের পথ ধরেই ভোগের স্বর্গে পৌঁছনোর প্রতিশ্রুতি দেখি কেন?

...জাদু জানে জেরি রুবিন?

...চরিত্রের ওপর সন্দেহের ছায়াটা নিজের থেকে সরিয়ে ওর ওপর এনে ফেলতে চেয়েছি। বিষের সঙ্গে অমৃত ঘুঁটলে তা-ও বিষাক্ত হবে। বিষের সংস্রবে সবই বিষ। জেরি এত সব জানে কি করে? এত সব পারে কি করে? সন্দেহের কাঁটা তক্ষুনি খচ-খচ করে ভিতরে চলে গেছে। দু'হাতে মুঠো করে ওর চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা বুকের ওপর থেকে টেনে তুলেছি। দু'আঙুল ফারাকে চোখে চোখ।—আমি তোমার জীবনে কত নম্বর মেয়ে?

মুখের হাসি সেই রকমই মিষ্টি, কচি, নিঃশব্দ।—হঠাৎ এ-কথা?

—চালাকি কোরো না! সোজা কথার সোজা জবাব দাও!

ও নিঃশব্দে হেসেই চলেছে।—কেন জিগ্যেস করছ বুঝলাম। নিজেকে অনায়াসে এক নম্বর ধরে নিয়েই তুমি এই রাতের আনন্দ সাগরে সাঁতার কাটো, খাবি খাও, ভোগ-বিশারদ হবার জন্য আমার নম্বর গুণে অনুশীলনের দরকার হয় না...তোমার কাছে যখন আসি ভোগের রকমারী আত্মাদের সঙ্গে নিয়ে আসি, তারা তাদের সব গুণ নিয়ে আমার ওপর ভর করে—রামদেও মাহাতোর কাছে প্রথমেই আমি এই পাঠ নিয়েছিলাম! তার ভুড়ুর জোরে আমি কিউপিড আর আমার মাহাত্ম্যে তুমি ভেনাস!

কোনো কোনো মুহূর্তে অসম্ভব কথা শুনলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবু লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ের বিশ্বাসযোগ্য কথা আদৌ নয়। ঝাঁঝ দেখিয়ে বলেছি, আমার সঙ্গে ভাঁওতাবাজী হচ্ছে?

—বাঃ, ভাঁওতাবাজী কেন—আচ্ছা এই একটা বছরের কথাই ধরো, তুমি আসার আগে পর্যন্ত এক তোমার মা-কে ছাড়া আর মেয়ে কোথায় পেলাম! সব ছেড়ে শুধু তার ব্যবসা নিয়েই তো হাবুডুবু খেলাম...বাট সী ইজ্ রিয়েলি লাভলি! তোমার সন্দেহ সত্যি হতেও পারত। তার বয়েস আর দশটা বছরও কম হলে তোমার বদলে আমি তাকেই নিতাম।

চুলের মুঠি ধরে মাথা কয়েকবার জোরেই ঝাঁকালাম।—ফের আমার মা-কে নিয়ে কথা?

ম্যায়ের সম্পর্কে আগেও দুই একটা অশালীন রসের উক্তি শুনেছি।

—বাঃ! তোমার মা বলে কি সে মেয়ে নয় নাকি, বেচারা রবার্ট গারল্যাণ্ড, শেষের দিকে তোমার মা-কে নিয়ে অত মাতামাতি করল বলেই আর সহ্য হল না, চৌষট্টি পঁয়ষট্টির মধ্যেই কবরে সেঁধিয়ে গেল।

এক হাতের চুল ছেড়ে মাথায় খুব জোরেই একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল্লাম।—মিথ্যেবাদী! মরার আগে ওই বুড়োর সত্তর বাহাত্তর বছর বয়েস হয়েছিল! নিঃশব্দ হাসিতে সমস্ত মুখ ভরাট।—তোমার মা বলেছে বুঝি?...বরাবরই জানি রবার্ট গারল্যাণ্ড চালাক মানুষ, কিন্তু আরো চালাক হলে আশি-বিরাশি বলত...বেশিদিন ঝামেলা পোহাতে হবে না ভেবে তোমার মা তাহলে ঢের আগে তার কাছে ধরা দিত।

রাগের মাথায় জেরির ওপর এলোপাথারি কিল-চড় চালিয়েছি। মা-কে নিয়ে ভিতরে আমার কিছু অজানা সংশয় আর দুর্বলতা ছিলই। তাই বরদাস্ত করতে পারিনি। মার নয়, জেরিকে যেন আরো বেপরোয়া লম্পট হবার ছাড়পত্র দিলাম।

বিয়ের পরদিনই জেরিকে সাবধান করেছিলাম, ছেলেপুলে চাই না, কখনো চাইব কিনা তা-ও জানি না।

জেরি তক্ষুনি সায় দিয়েছে সে-ও চায় না। নিজেই হেসে বলেছে তার ছেলে হওয়া মানেই একটা শয়তানের বাচ্চা আসা, আর তার ভোগ মাটি। আর বলেছে, গোরুমহিষাণির সেই রাতে আর বিয়ের রাতে কিছু গড়বড় হয়ে গেছে কিনা জানে না, হলেও সামাল দেবার ওষুধ তার জানা আছে। আর ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা মনের কোণে ঠাঁই দেওয়ারও দরকার নেই, দুনিয়ার পুরুষগুলি যদি ভুড়ুর দাওয়াই জানত আর মানত, তাহলে পৃথিবীর লোক বাড়ছে লোক বাড়ছে রব উঠত না, ব্যভিচার শব্দটাও ডিকশনারি থেকে উবে যেত।

খুব বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু মাসের পর মাস নিরাপদেই কাটছে।

বিয়ের পর থেকেই মা-কে বেশ গম্ভীর দেখছি। জামাইয়ের সঙ্গেও কথাবার্তা বেশি বলে না। দিন পনের যেতে আমাকে একলা পেয়ে জিগ্যেস করল, কি রে কি-রকম বুঝছিস?

—কি ব্যাপারে?

—ওই জেরির কথা বলছিলাম...আমাকে কাল ওর মাসের খরচের টাকা বাড়িয়ে দিতে বলছিল। তোকে কিছু বলেনি?

—না তো! শুনে রীতিমতো বিরক্ত আমি।—এখানে খায় থাকে, তার খরচ আগের থেকে বেশি হবে কেন?

—কি জানি, সে না-হয় দেড় হাজার থেকে দু'হাজার করে দেব। কিন্তু তোর সঙ্গে ব্যবহার কি-রকম...কি বুঝছিস?

—নতুন করে বোঝাবুঝির কি আছে, তাছাড়া তুমি তো তাকে আমারও ঢের আগে থেকে দেখছ!

মা চুপ মেরে গেল। তার ভাবনার মুখ আমি চিনি। বেশি ভাবা মানেই ব্লাড প্রেসার চড়ানো। বললাম, তুমি ঠিক-ঠিক কি ভাবছ আমাকে খোলাখুলি বলে ফেলো তো, বিয়ের ক'দিন আগে থেকেই তোমাকে চিন্তিত দেখছি, আর বিয়ের পরেও তেমন খুশি দেখছি না—কি অত ভাবছ?



—না, থাক...

—থাকবে কেন, মায়ের দুর্বল জায়গাটিতে ঘা দিলাম, ভেবে ভেবে ব্লাডপ্রেসার বাড়ানোর ইচ্ছে? তার থেকে মনে যা আছে বলে ফেলো তাতে তোমার উপকার ছাড়া অপকার কিছু হবে না।

—তুই জেরিকে কিছু বলবি না তো?

ভিতরে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল একটু।— তোমার ক্ষতি হবে বুঝলে বলব না।

—আমার আর কি হবে, তোকে নিয়েই ভাবনা।

ভাবনার কারণ শুনলাম।...ব্যবসার ব্যাপারে আর রবার্ট গারল্যাণ্ডের অসুখের সময় জেরি রুবিন মা-কে যত সাহায্য করেছে তেমন আর কেউ করেনি। কোনো কিছু করার গোঁ চাপলে ও নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়। —"এই যে পরশু তোর মোটর পার্টস বিক্রীর দোকান খোলা হয়ে গেল, তাইতেই তো দেখলি ইচ্ছে করলে ও কি করতে পারে।" একটু বেপরোয়া আর খরচে জেনেও এই গুণের জন্যেই মা আর রবার্ট গারল্যাণ্ড ওকে বিশ্বাস করত, ভালোবাসত। পাঁচজনের পাঁচ রকম কথা কানে এলেও কান দিত না। এমন চেহারা আর বুদ্ধিমান ছেলে সাধারণ দশজনের মতো হবে না জানা কথাই। পেট্রল আর ডিজেল পাম্পিং স্টেশন করার পারমিট পেতে মা আর রবার্ট গারল্যাণ্ড পরামর্শ করে জেরিকে দু'আনার শেয়ার দিতে চেয়েছিল। জেরি হেসে বলেছে, মাদারের জিনিসে ছেলের ষোলো আনা দাবী, সে দু'আনার অংশীদার হতে যাবে কেন—অত ঝামেলার দরকার নেই, তার খরচ চলে গেলেই হল—সবটাই মাদারের নামে থাক।

এ-কথা শুনে মা আর রবার্ট গারল্যাণ্ড দারুণ খুশি হয়েছিল, মায়ের স্নেহ তার ওপর উপছে উঠেছিল। কিন্তু ও-ছেলে কখন কি করছে না করছে মা জানবে কি করে। তার ওপর তো আর স্পাই রাখা হয়নি। আর এত বিশ্বাস যার ওপরে পরের কথায় কান দিয়ে তাকে অবিশ্বাসই বা করতে যাবে কেন। জেরির মতো ছেলেকে হিংসে অনেকেই করতে পারে। কিন্তু মায়ের খটকা বাধল মেয়ের বিয়ের সময়। যারাই শোনে জেরি রুবিনের সঙ্গে বিয়ে তারাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মৌভাণ্ডারের দু'জন উঁচুদরের কর্তব্যক্তি তো বিয়ের নেমন্তন্ন নিলেই না। সোজা বলে দিলে এ-বিয়েতে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কোথা থেকে ভূতের মতো চেহারার একটা ছোকরাকে ধরে এনে ভুতুরে তাজ্জব কাণ্ডকারখানা দেখিয়ে বাড়ির বউদের বশ করেছে, ভূত-ভবিষ্যৎ বলে ভাগ্যের পথ খুলে দেবার লোভ দেখিয়ে একজনের চার হাজার একজনের পাঁচ হাজার টাকা খসিয়েছে, আর তাদের একজনের মেয়েকেও জেরি রুবিন সর্বনাশের রাস্তায় টেনে নিয়ে যাবার মতলবে ছিল। ওই দুই অফিসার আরো বলেছে, ঘাটশীলা আর মৌভাণ্ডারের কম করে পাঁচ ছ'টা মেয়ের সঙ্গে জেরি রুবিনের অ্যাফেয়ার ছিল—এমন ছেলের হাতে মিসেস মার্থা রয় মেয়ে দিচ্ছে দিক, কিন্তু ও-ছেলের সংশ্রবে তারা আর নেই।

মায়ের মাথায় তখন আগুন জ্বলেছিল, শেষ মুহূর্তেও বিয়ে নাকচ করে দেবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু মালা গুপ্তার ক্লাবের অল্প-বয়সী ছেলেমেয়েদের মুখে অন্য কথা।

তাদের বেশির ভাগই জেরির ভক্ত। মালা গুপ্তার সাহায্যে খোঁজ নিতে তাদের বেশির ভাগ একবাক্যে জেরির প্রশংসা করেছে। বলেছে জামাইয়ের মতো জামাই আনছে মিসেস মাথুর রয়। অনেকের তো গা চড়চড় করবেই, ও-ছেলেকে গেঁথে তোলার জন্য তারাই যে-যার মেয়েকে এগিয়ে দিয়েছিল—জেরির দোষ কি, এমন হলে মজা পাবে না তো কি! আর মালা গুপ্তাও মা-কে আশ্বাস দিয়েছিল, বলেছিল জেরি রুবিনকে সে এতদিন পাত্তা দেয়নি কারণ তার সম্বন্ধে নানাজনে ভালো-মন্দ পাঁচ রকম কথা বলত, ভূত-প্রেত ভূতুড়ে বিশ্বাস করে এমন লোক তার ঘরে আড্ডা দিতে আসে—এই কারণে। মিসেস রয় এই ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছে জেনে সে-ও মৌভাণ্ডার ঘাটশীলায় জেরি রুবিনের খোঁজ খবর নিয়েছে, সকলেই প্রশংসা করেছে। ছেলেটা বেপরোয়া আর তার মধ্যে কিছু রাখা-ঢাকা নেই বলে এদের সকলের প্রিয়পাত্র সে। এখানকার লোকও জেরির সম্পর্কে খারাপ কিছু বলে না। মিসেস্ রয় যা শুনেছে তার বেশির ভাগই গুজব আর হিংসের কথা।

...এই দো-টানার মধ্যে পড়ে মা মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখন তার দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

আমার কাছে খোলাখুলি সব বলতে পেরে মা একটু হালকা হয়েছে। আমিও মা-কে সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছি। এমনও বলেছি, জেরি ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারি এমন চিন্তা স্বপ্নেও এখন আমার মাথায় আসে না—তুমি কি-ছু ভেব না, এখন থেকে ওর সব দায় আমার।

...একটা কথা মনে পড়তে মায়ের দিকে চেয়ে আমার হাসিই পেয়ে গেছিল। ও-শয়তান বলেছিল, বয়েস আর দশটা বছর কম হলে আমার বদলে ও মাকেই নিত। আর, রবার্ট গারল্যাণ্ড আর মায়ের সম্পর্কে আমার সংশয়ের পর্দা জেরি এত সহজে ছিঁড়ে দিয়েছিল যে তারপরে মায়ের ওপরেও আমার কিছুমাত্র রাগ হয়নি। জেরি ছাড়া এত বড় ব্যাপারটাকেও এমন অনায়াসে তুচ্ছ করতে আর কে পারে? তা না হলে আমিও সংকোচে পড়তাম।

জেরির এমনিতেও গণ্ডারের চামড়া সেটা পরশু পাম্পিং স্টেশনের লাগোয়া মোটর পার্টস-এর দোকান খুলে বসার সময়ই টের পেয়েছি। জেরির উৎসাহে ব্যবস্থাপত্র অনেক আগে থেকেই করা ছিল। কতবার এ জন্যে ও কলকাতায় আর জামসেদপুরে ছোটাছুটি করেছে। এই দোকান খোলা উপলক্ষেই ওই দিন বৃন্দাবনকে আমি একটা দামী হাতঘড়ি প্রেজেন্ট করেছি। বেচারা কি করে তার ঘড়ি খুইয়েছে ভুলিনি। ঘড়ি পেয়ে বৃন্দাবন খুশিতে ডগমগ। কিন্তু তারপরেই ভয়ে কাঁটা।

ঘড়িটা দিয়ে আড়চোখে একবার জেরির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বৃন্দাবনকে বলেছিলাম, কাউকে রেস্তরাঁয় খাওয়াবার জন্য আর নেশা-করা বা জুয়া খেলার জন্য আবার যদি এই ঘড়ি বেচে দাও তাহলে আমি তোমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বার করে দেব মনে থাকে যেন।



বৃন্দাবন সভয়ে জেরির দিকে না তাকালে ও ঠিক বুঝত কিনা সন্দেহ। বোঝার পর এক-গাল হাসি। বলল, বিপাকে পড়লে আমার কয়েক শ' টাকা পাওয়ার সোরস্ অন্তত মজুত থাকল।

...মায়ের সঙ্গে ওই কথা-বার্তার পর সেই রাতেই আমি ওকে ধরে ছিলাম। —তুমি মা-কে তোমার অ্যালাওয়েন্স (জামাই হবার পর মাইনে বলতে আপত্তি) বাড়াতে বলেছ?

—হ্যাঁ। তোমার মা এক নম্বরের কেপ্পন, মাত্র পাঁচশ টাকা বাড়াবে বলেছে। ...এরপর গাড়ি সার্ভিসিং-এর প্ল্যান্ট চটপট বসাতে পারলে আর একদফা বাড়াতে বলব। এ-ও পরের এক্সটেনশন প্ল্যানে আছে। আর তার প্রাথমিক তোড়জোড়ও শিগগীরই শুরু হবে। তা বলে এ-রকম কথা কে শুনতে চায়। ঝাঁঝিয়ে উঠলাম। —খাওয়া-থাকার খরচ নেই অত টাকা কেন দরকার হয় তোমার?

—তোমরা তোমাদের বিজনেস্ বাড়াচ্ছ, আমিও আমার ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট বাড়াচ্ছি।

—তোমার বিজনেস্ তো জুয়া খেলা আর নেশা করা।

—এটাও আমার বিজনেস বাড়ানোর একটা দিক।

টাকার জন্য আমি বা মা কেউ মাথা ঘামাই না। পার্টস-এর দোকান খুলে বসার পর আরো লাভের মুখ দেখতে বেশি দেরি হবে না এরই মধ্যে বুঝতে পারছি। মৌভাণ্ডার আর রাখা-মোসাবাণী গাড়িওলারা খদ্দের হয়ে বসেছে—এইসঙ্গে তারা মেরামতির ইউনিটও খুলে বসতে পরামর্শ দিয়েছে। সেটাও আমার মাথায় আছে, ভালো কয়েকজন টেকনিসিয়ান পেলে মাসখানেকের মধ্যে এ-ও শুরু করে দেওয়া যায়। মায়ের অন্য দুশ্চিন্তাটাই আমার মাথায় বেশি ঘুরপাক খাচ্ছিল।

টাকার প্রসঙ্গ বাতিল করে ঘুরিয়ে জিগ্যেস করলাম, বিয়ের সময় তোমার নেমন্তন্নের যে ছেলে-মেয়েরা এসেছিল তারা কারা?

—এখানকার দু'চারজন ছিল, বাকি সব মৌভাণ্ডার আর রাখা মোসাবাণীর। জামসেদপুর থেকেও জনা দুই এসেছিল।

—আর মায়ের নেমন্তন্নে সস্ত্রীক যে-সব অফিসাররা এসেছিল তাদের তুমি চেন না?

—আমি চিনি না বিশ-তিরিশ মাইলের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি! সব্বাইকে চিনি—কেন?

—তারা কেউ তো তোমাকে পাত্তাই দিলে না দেখলাম।

—হুঁঃ! আমি পাত্তা দিলাম না বলো, ওদের একটাও পুরুষ মানুষ নাকি—সব মেয়েছেলের হদ্দ, আমার কাছে ঘেঁষার সাহস ওদেরই নেই।

অবিশ্বাস হয়নি। আরো বাজিয়ে দেখার লোভ হয়েছে।—কিন্তু সকলের ধারণা তুমি একটা হতচ্ছাড়া শয়তান, মৌভাণ্ডারের দু'জন অফিসার তো মা-কে সাফ বলে দিয়েছিল তোমার সংস্রবে আসবে না, তুমি এক ভুড়ু-নবিশকে নিয়ে গিয়ে ভাঁওতাবাজী করে

চার-পাঁচ হাজার টাকা করে যক দিয়েছ—আর তাদের একজনের মেয়েকেও পথে বসাবার মতলব করেছিলে।

নির্জলা প্রশংসা শুনলে যেমন হয় তেমনি খুশিতে ভরাট মুখ। —ও...বুঝেছি কারা। কিন্তু তারা যে এক একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর জেনারেল ম্যানেজার হয়ে বসতে চেয়েছিল সে-খবর তোমার মা শুনেছে? এমন মওকা পেলে দেওকী নারাঙ মাথায় কাঁঠাল ভাঙবে না এত বোকা নাকি সে?

রামদেও মাহাতোর নাম না করে তার শত্রুর নাম করল এটা খেয়াল করেছি। জিগ্যেস করলাম, সে তোমাকে টাকার ভাগ দেয়নি?

অম্লানবদনে জবাব দিল, তা তো দিতেই হবে, আমার মেহনতের ফী আছে না!

একটু রুড়া গলায় বললাম, তাহলে তুমিও জানো এ-সব ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়—জেনেও লোক ঠকাচ্ছ?

হেসে সাদাসাপটা জবাব জবাব দিল, ঠকার জন্য যারা গলা বাড়িয়ে দেয় তারাই ঠকে। সাধ্যের মধ্যে হলে অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু কেউ যদি পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে চায় তাকে মাটিতে আছড়ে পড়তে হবে না—যে যা চায় তা-ই পারলে ওরা নিজেরাই এক-একজন প্রাইম মিনিস্টার হয়ে বসত।

খাসা যুক্তি।—আর একটা মেয়েকে যে ভুলিয়ে ভালিয়ে পথে বসাতে গেছলে? তুমি যে হাড়-বজ্জাত আমি তা-ও অবিশ্বাস করব?

এতটুকু অপ্রতিভ হতে দেখলাম না। উল্টে ভারী মজার কথা যেন। জবাবও তেমনি।—আমি সত্যি ভোলাতে চাইলে তার কি দশা হত সেটা সব থেকে ভালো তুমিই তো আঁচ করতে পারো। তার বাবার ভগ্যি যে মেয়ে মনের দুঃখে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেনি।

এমন মানুষের সঙ্গে তর্কে আর কত যুঝতে পারি। উল্টে মনে মনে তারিফ করেছি, মরদ বটে একখানা!

কিন্তু পরের সাত-আট মাসের মধ্যে একটু একটু করে আমার মোহ ভাঙতে লাগল। রাতের মোহ নয়, সেটা বাড়ছে বই কমছে না। বাস্তব মোহে ঘা পড়ছে। আসল মানুষটা যেন একটু একটু করে খুব অনায়াসে খোলস থেকে বেড়িয়ে আসছে। নেশা বাড়ছে, জুয়া খেলা বাড়ছে, স্তাবকের সংখ্যা বাড়ছে। —সেই সঙ্গে বাড়ছে টাকার চাহিদা। মা আমার থেকে পাঁচগুণ তিক্ত-বিরক্ত। সার্ভিসিং আর মেরামতির গ্যারাজ খুলে বসার সময়ও জামাই প্রচুর পরিশ্রম করেছে। লাভও অনেক বেশি হচ্ছে। ব্যবসার প্রতি মায়ামমতা থাকলে মাসের টাকা বাড়াতে আপত্তি নেই। নিজেই প্রস্তাব দিয়েছে, টাকা বাড়াও মাদার, ভালো করে হাত খোলো—এ-টাকায় চলছে না।

দু'দফায় পাঁচশ পাঁচশ করে আরো হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। মায়ের হাবভাব দেখে মনে হয়েছে আমার সুখশান্তির মুখ চেয়েই জামাইয়ের বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমার ধারণা জামাইয়ের সর্বদা হাসি মুখ দেখা গেলেও মা ইদানীং তাকে একটু ভয়



করেই চলে। তা না হলে এক-এক দফায় বড়জোর আড়াইশ করে বাড়াতো—একবারে পাঁচশ করে কখনোই উঠত না। এ-জন্যে আমিই বরং মা-কে বকেছি আর জেরিকে গালাগাল করেছি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মাসে তিন হাজার টাকাতেও জেরির চলছে না। এদিকে ব্যবসা দেখা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে। তার সাফ কথা, শাশুড়ী বউয়ের সঙ্গে সে দোকানে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারবে না। তাতে তার প্রেসটিজ হানি। সে শুধু অ্যাডভাইসার হিসেবে থাকবে, আর নতুন কোনো প্ল্যান হলে তাতে সাহায্য করবে। নতুন প্ল্যানের আর প্রশ্নই নেই। তার অ্যাডভাইসের জন্যও কেউ বসে নেই। ঘরের খেয়েদেয়ে নিজের মনে থাকলেও আমাদের মা-মেয়ের আপত্তি ছিল না। ইদানীং তার প্রেত আর বিমোহন চর্চার অনুশীলন বাড়ছে সেটা আমার পছন্দ তো নয়ই—মায়েরও পছন্দ নয়, ভয়ে। জুয়ায় মেতে আছে। নেশায় মেতে আছে। জুয়া খেলে জেতার থেকে হারেই বেশি নিশ্চয়, নইলে মাস গেলে তিন হাজার টাকা কিসে লাগে?

কেউ সেধে দেয়নি, পাশের অর্থাৎ কোণের ঘরটা নিজের খাস দখলে নিয়ে নিয়েছে। আমার বা মায়ের কাছে কেউ এলে বাংলোর সামনের বারান্দায় বসে—ও-ঘরে এক আমি ছাড়া কারো ঢোকার হুকুম নেই। সেখানে তাঁর বন্ধু-বান্ধব আসে। ভক্তরা আসে। প্ল্যানচেটে আত্মা আনার মহড়া চলে। অলৌকিক বিষয়ের চর্চা হয়। এ-ব্যাপারে কোনো বই-পত্রের বিজ্ঞাপন দেখলে বা খবর পেলে জেরি কেনার অর্ডার পাঠিয়ে দেয়, টাকা পাঠিয়ে নয়, ভি পি তে পাঠানোর হুকুম। খালাস করতে হয় আমাকে বা মা-কে। ও-ঘরে নেশার চর্চাও চলে। তার বইও পেলেই সংগ্রহ করে। নানা রকমের গাছ-গাছড়া শেকড় বাকড় আনে, নানারকমের আরকের শিশিও মজুত, ঘরে একটা স্টোভ আর ছোটবড় কয়েকটা সসপ্যান রয়েছে। দরজা বন্ধ করে কি মাথামুণ্ডু বানায় ও-ই জানে। জিগ্যেস করলে বলে এ-সব বড় স্কেলে করতে পারলে তোমার ব্যবসা থেকে কম রোজগার হত না।

বন্ধু আর ভক্তদের নিয়ে নেশার অনুশীলনও ও-ঘরে হতই যদি না এ-ব্যাপারেও আমি শুরু থেকে মারমুখি হয়ে উঠতাম। একদিন একজনকে মত্ত অবস্থায় বেরুতে দেখেই আমি কুরুক্ষেত্র করে বসেছিলাম। তাইতেই ভক্তদের সঙ্গে ও নিজেও একটু সমঝেছে। ততদিনে বুঝে গেছি ওরা গুড়ের ভাষা বোঝে না, মুগুরের ভাষা কিছুটা বোঝে। পরেও জেরিকে সাবধান করেছি, আর কোনদিন এ বাড়িতে এতটুকু বেচাল দেখলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যাবে। তখন মিটিমিটি হেসে বলেছে, এক্সপেরিমেন্ট চালাতে গিয়ে লোকটার অমন বেসামাল দশা হয়েছিল কিন্তু তোমার তখনকার মূর্তি দেখে আর কেউ এরপরে আমার এক্সপেরিমেন্টও সাহায্য করতে আসবে না—আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললে যা-হোক।

...রাতের শয্যায় শোধ নিয়েছে। হেসেছে আর কানে মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে বলেছে, সম্পর্ক ঘোচাতে পারবে? কোনদিন পারবে?

মুখে কিছু বলিনি, স্বীকারও করিনি। কিন্তু হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি এই একজনকে

না পেলে আমার জীবন কত নিষ্ফল হয়ে যেত। যা: , ও-ঘরে নেশার আড্ডা আর বসেনি। মায়ের অভিযোগ, শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরতে পারলে জেরির জুয়ার নেশা নেশার নেশা আর ভুড়ুর নেশা আমি বন্ধ করতে পারি। সে-ভাবে চেষ্টা করলে পারতাম কিনা জানি না। কিন্তু যে-মানুষ আর পাঁচজনের মতো নয়—এত বদ গুণ নিয়েও যে লোকটা এত তাজা এত সুন্দর এত সম্পূর্ণ তার থেকে এগুলো ছেঁটে দিলে সে কেমন দাঁড়াবে ? এ-সবই তার চরিত্রের অঙ্গ মনে হত আমার।

কিন্তু তা বলে দিনে দিনে জেরি এত বেড়ে যাবে ভাবিনি। যখন তখন মিটিমিটি হেসে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত পাতে। কিছু টাকা দরকার। কিছু বলতে একশ দেড়শ দু'শ। রাগ করি, আবার দিই-ও। কখনো তেড়ে আসি, এক পয়সাও হবে না, আমরা টাকার কল খুলে বসেছি—কেমন ?

ও সোজা তখন মায়ের কাছে চলে যায়। —মাদার, কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ল যে, তোমার মেয়ে তাড়িয়ে দিল তাই তোমার কাছে আসতে হল।

মা-ও দাবড়ানি দিতেই চেষ্টা করে, বলে দেবে না। জেরি আরো হাসে, বলে যত দেরি করবে ততো তোমারই সময় নষ্ট মাদার—জেরি চাইলে তুমি না দিয়ে পারো !

আমি জানি মা ইদানীং ওকে ভয়ই করে। ভুড়ুর ভয় না' আমার কাছে রবার্ট গারল্যাণ্ডের প্রসঙ্গ ফাঁস করে দেবার ভয় জানি না। টাকা নিয়ে ও বিদায় হলে মা আমার কাছে এসে রাগে গজগজ করে। আমারও পাল্টা রাগ হয়।—দাও কেন, দূর করে দিতে পারো না—তোমার অত ভয়টা কিসের ?

মা তক্ষুনি মিইয়ে যায়। মুখে বলে, আমি আবার ভয় কাকে করতে যাব, কার পরোয়া করি ?

টাকা হাতে পেলেই জেরি লাটসাহেব। ভক্তদের নিয়ে রেস্তরাঁয় খাবে, জুয়ার আড্ডায় যাবে, নেশা তো আছেই। ওর মতো লোকের টাকার দরকারের শেষ কোথায় ! আমাদের কড়াকড়ির ফলে ও অন্য রাস্তা ধরল। মেশার গুণ তো সক্কলের সঙ্গে। ধার পাবে না কেন ? ধার নিয়ে চিরকুট লিখে দেয়, হঠাৎ দরকারে এই লোকের কাছ থেকে এতটাকা নিয়েছি মাদার—দিয়ে দিও।

মা রাগে ফেটে পড়ে আবার মান-সম্মান বজায় রাখার জন্য দিয়েও দেয়। এ-ও চলতেই থাকল। মায়ের টাকা দেওয়া হলে আমি সেই সব লোককে সমঝে দিই, ফের টাকা ধার দিলে আর এখান থেকে তা ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মশা যেমন নতুন রক্ত খোঁজে জেরিও তেমনি ধার দেবার নতুন লোক খুঁজে বার করে। এমন কি এই এলাকা ছেড়ে ঘাটশীলা মৌভাণ্ডারের লোক এসেও জেরির চিরকুট দেখিয়ে ধারের টাকা ফেরত চায়। লজ্জায় অপমানে আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল। কিন্তু জেরির কানে তুলো, পিঠে কুলো। মুখের চাবুকে ওকে সংযত করতে চেষ্টা করি, সাবধান করি, ভয় দেখাই। কিন্তু সবই একতরফা। ও হাসে। বলে, টাকা জিনিসটাই তো মানুষের



দরকার মেটাবার জন্য—জানোয়ারের তো টাকার দরকার হয় না। আমার মেজাজ খুব বেশি বিগড়েছে দেখলে তক্ষুনি ঘটা করে ক্ষমা চায়—নিজেকে শোধরাতে চেষ্টা করবে বলে।…আর রাতের অপেক্ষায় থাকে, ও খুব ভালো করে জানে কখন ওর সব অপরাধ আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

এর সঙ্গে গাড়ি নিয়ে উৎপাত। যখন-তখন ওর গাড়ি চাই। চাই মানে চেয়ে নেওয়া নয়। ওটা যেন ওর সম্পত্তি। বাংলোয় বসে আছি, হঠাৎ টের পেলাম জেরি গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছে। নেমে এসে বাধা দেওয়ার আগেই হাওয়া। হাত তুলে জানান দিয়ে যায় ফিরল বলে। কিন্তু ওর ফেরার আশায় বসে থাকলে সব কাজ পণ্ড। বলা কওয়া নেই, দোকানে এসেও গাড়ি নিয়ে যায়, আমি বা মা অফিস ঘরে কাজে ব্যস্ত, কাচের দেওয়ালের এদিক থেকে এক সময় দেখি গাড়ি নেই। মায়ের নির্বাক রক্তচক্ষু দেখতে হয়। জেরিকে শাসন করব কি, ওরই পাল্টা ক্ষোভ।—এত কেপ্পন কেন তোমার মা, আর একটা গাড়ি কিনলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।

অসহ্য হয়ে উঠতে আমার কথাতেই মা গাড়ি বেচে দিয়েছিল। গাড়ি বদলে আমার হয়েছে মোটর ফিট্ করা সাইকেল, মায়ের হয়েছে সাইকেল রিকশ। জেরি গাড়ি বেচার জবাব দিয়েছে আমাদের ঘাড়ে দামী মোটর সাইকেল কিনে। এখন নবাবের মতো ওই মোটর সাইকেল নিয়ে সর্বত্র চষে বেড়ায়। শব্দ শুনেই লোকে বুঝতে পারে মোটরবাইকে কে চলল।

এখানে শেষ হলেও কথা ছিল। টাকা-টাকা করে এরপর দুটো ঘটনা ঘটল যার ফলে মা ভীত ত্রস্ত। আমার আর মায়ের অনুপস্থিতিতে জেরি হঠাৎ একদিন হানা দিয়ে বৃন্দার ক্যাশ থেকে টাকা তুলে নিয়ে যেতে মা বৃন্দাবনের ওপরেই ক্ষিপ্ত। আমিও। বৃন্দাকে শাসিয়েছি, আমাদের হুকুম ছাড়া টাকা দিলে সে-টাকা তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে। দরকার হলে মন বাহাদুরকে অফিস ঘরের দরজায় বসিয়ে রাখবে—আমরা দুজন ছাড়া ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেবে না।

বেচারা বৃন্দা। এই নির্দেশের ফলে সাত দিন পরে তার মাথা ফেটে রক্তাক্ত দশা। জেরি এসে টাকা চাইতে ও টেবিলের ক্যাশের ড্রয়ার আঁকড়ে বসে ছিল। জেরি তখন ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসেছে একটু। তারপর আচমকা ধাক্কায় ওকে বসা-আস্থায় চেয়ারসুদ্ধ মাটিতে উল্টে ফেলে দিয়েছে। তারপর ড্রয়ার খুলে টাকার গোছা নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেছে।

…সেই প্রথম ওকে ডিভোর্স করব বলে শাসিয়েছি। জেরি হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছে। বলেছে, নেশার ঝোঁকে এ-রকম করে ফেলেছে, আর কক্ষনো করবে না। যত নেশাই করুক নেশার ঝোঁকে ও কিছু করে না বলেই আমার বিশ্বাস। তবু আশা করেছি। আর নিরুপায় হয়ে নিজেই মনবাহাদুরকে কাঁচের দরজার সামনে তার বন্দুক নিয়ে বসতে হুকুম করেছি। আমি মা আর বৃন্দা ছাড়া বা আমাদের তিনজনের কারো অনুমতি ছাড়া কেউ এ-ঘরে ঢুকবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

মাস দেড় দুই ভালোই চলল, তারপর আবার একদিন আরো মারাত্মক ব্যাপার। সকালের দিকে আমি তখন দোকানে। মা স্নানে ঢুকেছিল। জেরি আগেই জানতো স্নানের সময় মা আলমারির চাবি কোথায় রাখে। আলমারিতে তখন পর্যন্ত প্রায়ই অনেক ক্যাশ টাকা থাকত। মজবুত আলমারি, ভিতরে লকার। জেরি নিঃশব্দে এসে আলমারি খুলল। লকারের চাবি ভিতরেই থাকে। খুলে গুণে দু'হাজার টাকা বার করে নিল।

ঘুরে দেখে দোর গোড়ায় অ্যানজেলা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। জেরি ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, মুচকি হেসে বলল, আমি এক্ষুনি তোমাকে ডাকতাম, মেমসাহেবকে বলে দিও তার আলমারি থেকে দু'হাজার টাকা নিলাম···খুব দরকার···আর এ-ও বলে দিও ছোট মেমসায়েবের কানে কথাটা যায় এ আমার একেবারে ইচ্ছে নয়—মনে থাকবে ?

ভয়ে কাঠ অ্যানজেলা পুতুলের মতো মাথা নেড়েছে।

দোকানে আসতে প্রথমেই মায়ের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখ চোখে পড়েছে। চেয়ার টেনে বসার পরেও কাঁপছে মনে হল। বৃদ্ধা পর্যন্ত হাঁ করে মা-কেই দেখছে। তক্ষুনি ইশারায় ওকে বাইরে যেতে বললাম। তারপর জিগ্যেস করলাম, কি হয়েছে ?

কি হয়েছে বলল। আমার মুখ দেখেই নিজের চেয়ারটা টেনে আমার চেয়ারের সঙ্গে লাগিয়ে মা বলল, বোকার মতো রাগ করিস না, শোন— তোকে কিছু বলেছি ভুলেও ওকে বুঝতে দিস না, শুধু জেনে রাখ ও ডেনজারাস ছেলে— আসার সময় আমি ডাক্তার অরুণলালের সঙ্গে কথা বলে এসেছি, জামসেদপুর থেকে তার ওখানে উকিল এনে আমাদের যা করার খুব চুপচাপ করতে হবে। ডাক্তার সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।

অর্থাৎ এরপর ডিভোর্স ছাড়া মা আর কিছু ভাবছেই না। টাকা নিয়ে ও-ভাবে শাসিয়েছে শুনেই আমার মাথায় আগুন। পরের কথা শুনে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। ওই ডাক্তারের চালচলন আচার-ব্যবহার এখনো খুব ভদ্র, খুব বিনীত। কিন্তু তাকে আর মালা গুপ্তাকে নিয়ে এই ছোট জায়গায় দস্তুরমতো কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে। অ্যানজেলার মুখ থেকেই মা কিছু শুনে থাকবে। কিন্তু মায়ের ধারণা, ডাক্তারের মতো মানুষ হয় না—ওই মেয়েটাই তার কাজ-কর্ম পণ্ড করার রাস্তায় এগোচ্ছে। আর একদিন হেসে হেসে জেরি আমাকেই বলেছিল, মিসেস গুপ্তার হিম্মত আছে, অমন চৌকস ডাক্তারকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। আমি চেঁচিয়েই বলে উঠলাম, কেন তুমি সাতসকালে ওই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে ছুটলে ? আমার ভাবনা না ভেবে তাকে মালা গুপ্তার ডিভোর্স নিয়ে ভাবতে বলো !

কাচের দেয়াল বা দরজা না থাকলে আমার গলা শুনে বাইরের লোকও চমকে উঠত বোধহয়। মা দুশ্চিন্তায় অস্থির, তার ওপর আমার এই মেজাজ দেখে হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর বিড়বিড় করে বলল, এর পরেও তুই ডিভোর্সে রাজি নোস তাহলে ?



মায়ের গলা শুনেই আমার মাথা ঠাণ্ডা একটু। জবাব দিলাম, ডিভোর্স ছেড়ে আমি এখন ওর মাথা কাটতেও রাজি ! তুমি অত ভয় করো বলেই ও এত বেড়েছে—যা করার নিজেদের বাংলোয় বসেই করব—কেন তুমি সাত তাড়াতাড়ি ওই ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলে ?

শুনে মায়ের মুখ ভয়ে আরো সাদা। —তোকেই দেখছি না বলা ভালো ছিল। ডাক্তারের কাছে কি অবস্থায় গেছি তোর ধারণা আছে ? তার ওষুধ খেয়ে তবে একটু চাঙা হতে পেরেছি— ব্লাড-প্রেসার এখন দু'শ বাই একশ— বুঝলি ? ডাক্তার জিগ্যেস করবে না কেন হঠাৎ এ-রকম হল ? কারণ না জেনে সে আন্দাজে চিকিৎসা করবে ?

জেরিকে ডিভোর্সই করব ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু ডিভোর্স যাকে করব তার টিকির দেখা নেই। একে একে চারদিন কেটে গেল সে নিপাত্তা। আর তার মধ্যে আমার ভেতরের রাগ কমে আসছে বলেই নিজের ওপর দুর্জয় রাগ। ওই শূন্য শয্যা কেন আমার বুকের বাতাস পর্যন্ত টেনে নিচ্ছে ? এর পরেও ওই লোককে নিয়ে কি করে আমি ঘর করব ?

মা ভয়ে ভয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসে। আমার তাতেও বিরক্তি। —বলেছি তো এবারে ভালো হাতেই বিহিত করব আমি, কেন তুমি অত ভাবো।

ভয়ে আর ভাবনায় মায়ের ব্লাড-প্রেসার চড়েই আছে। মুখ সর্বদা লাল। সেই সন্ধ্যায় অরুণলালকে ফোন করলাম মা-কে এসে দেখে যেতে। মা-কে দেখে ডাক্তার নিজের ব্যাগ থেকেই ওষুধ বার করে দিল। মা-কে অভয় দিয়ে বাইরে এসে সে আমাকে বলল, আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।

আমি মনে মনে বিরক্ত। ঠিক জানি জেরির প্রসঙ্গ তুলবে। কারণ তার জন্যেই মায়ের এই হাল। বললাম, আমি এখন দোকানে যাব আপনি চেম্বারে যান তো গাড়িতে বসে কথা হতে পারে।

গেট ছাড়িয়ে খানিকটা এগোতে অরুণলাল বলল, এখানেই পাঁচ মিনিট থামান গাড়িটা, আমি এখন চেম্বারে যাচ্ছি না, প্রসাদ গুপ্তার বাংলোয় যাব।

শুনে মেজাজ আরো খিচড়ে গেল। আজ সকালেই মা বলছিল প্রসাদ গুপ্তা টুরে বেরিয়েছে। ···এই লোক এখন অনধিকার চর্চার দিকে এগোলে আমার জবাবও মোলায়েম হবে না। গাড়ি থামিয়ে তার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত।

হাত-ব্যাগ খুলে ডাক্তার অরুণলাল একটা ছোট মোটা খাম বার করে বলল, মিসেস গুপ্তা এই দু'হাজার টাকা আপনাকে দিতে বলেছেন, আপনি আপনার মা-কে দিয়ে দেবেন—

আমি হতবাক কয়েক মুহূর্ত। —কেন—এ কিসের টাকা ?

—আপনার স্বামী জেরি রুবিন মাসখানেক আগে বিশেষ কি দরকার বলে মিসেস গুপ্তার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন। টাকা ফেরত না পেয়ে মিসেস গুপ্তা রাগের মাথায় তাঁকে শাসিয়েছিলেন, ওমুক দিনের মধ্যে টাকা না পেলে তিনি আপনার কাছে আর

আপনার মায়ের কাছে আসবেন। তাইতে জেরি রুবিন ওই কাণ্ড করে বসেছেন···মানে, আপনার মায়ের আলমারি খুলে ওই দু'হাজার টাকা নিয়েছেন। এই থেকে আপনাদের মধ্যে এতবড় একটা গণ্ডগোল হতে যাচ্ছে জেনে মিসেস গুপ্তা লজ্জা পেয়ে টাকাটা আমার হাত দিয়ে ফেরত দিচ্ছেন, বলেছেন, জেরি সাহেব যখন পারেন তখন তাঁর টাকা ফেরত দিলেই হবে।

শুনে আমি তাজ্জব ? —আমাদের মধ্যে বড় গণ্ডগোল হতে যাচ্ছে মালা গুপ্তা জানলেন কি করে ?

—জেরি মিসেস গুপ্তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন জানতাম—···পরের ব্যাপারটা আমার কাছ থেকেই শুনেছেন। শুনে খুব লজ্জাও পেয়েছেন, আর বলেছেন, রাগের মাথায় হঠাৎ অত খারাপ ব্যবহার না করলে জেরি এ-রকম একটা কাণ্ড করত না। মিসেস গুপ্তা বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন, তাঁর জন্য আপনাদের মধ্যে এতবড় একটা মনোমালিন্য যেন না ঘটে।

এ-রকম হতে পারে কল্পনা করিনি। গুম হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। বললাম, মায়ের তো আপনার ওপরেই এখন সব থেকে বেশি আস্থা··· আপনি কি বলেন ?

—আমিও তাই বলি, এবারের মতো ভদ্রলোককে আপনারা ক্ষমা করে নিন। এখানে এত গণ্যমান্য আপনারা, এত ছোট জায়গায় ডিভোর্স মানেই একটা বিচ্ছিরি সোরগোলের ব্যাপার···ওই বাংলোতেই আপনারা না-হয় কিছু দিন আলাদা করে রেখে দেখুন··· শেষপর্যন্ত ও-রাস্তা তো আছেই, তার আগে যতটা সম্ভব চেষ্টা করে দেখুন।

অথৈ জলে ডুবতে ডুবতে আমিই যেন কূল পেলাম। —আপনার আর মিনিট দশেক সময় হবে ?

—তা কেন হবে না, কেন ?

জবাব না দিয়ে দ্রুত গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার লিলি কটেজের দিকে ছুটলাম। ডাক্তার আমার উদ্দেশ্য বুঝেছে। আর কিছু জিগ্যেস করল না। মানুষটা যে সত্যি ভদ্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাকে আবার মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললাম, আপনার যা বক্তব্য সব মা-কেই বলুন।

ডাক্তার আগে আর একদফা মায়ের পাল্‌স দেখে নিল। হেসে বলল, এই তো এরই মধ্যে বেশ ইমপ্রুভ করেছে। তাকে নিয়ে আবার ফিরতে দেখে আর আমার ওই কথা শুনে মায়ের পাল্‌স্ অন্তত ইমপ্রুভ করার কথা নয়।

আমাকে যা বলেছে ডাক্তার তার পুনরাবৃত্তি করল। খুব নরম করে নিজের মতামতও ব্যক্ত করল। আর আমাদের একান্ত শুভার্থী হিসেবে একই অনুরোধ জানালো।

মা পাথরের মতো স্তব্ধ। অনেকক্ষণ বাদে আমাকে একবার দৃষ্টিবানে বিদ্ধ করে ডাক্তারকে বলল, ওই দু'হাজার টাকা মালাকে ফেরত দিয়ে বোলো, আর ধার দিয়ে সে-যেন আমাদের ক্ষতি না করে।



ডাক্তার চলে গেল। আমিও নিঃশব্দে মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। জেরির ওপর এই মুহূর্তে দারুণ রাগ। কিন্তু ডাক্তারের প্রতি তেমনি কৃতজ্ঞ।

জেরির সঙ্গে চূড়ান্ত ফয়সলার অভিনয়ই করেছি। প্রায় একটা সপ্তাহ তার সঙ্গে কথা বলিনি। আমার ঘরে তাকে ঢুকতেও দিইনি। ওই কোণের ঘরে থেকেছে। মুখ দেখে অন্তত মনে হয়েছে বেশ ঘাবড়েছে। কিন্তু ওর মুখের ওপরেও আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। তারপর শেষবারের মতো আলটিমেটাম দিয়েছি। ও অম্লান বদনে শুনেছে। অম্লান বদনে যা বলেছি তাতেই সায় দিয়েছে। তারপরেও আমি তাকে ঘরে ডাকিনি। কিন্তু আমার ঘরে আসার প্রশস্ত সময় কবে বা কখন মুখের দিকে চেয়ে ও-শয়তান নিজেই তা টের পেয়েছে।

কিন্তু মা আর কোনো বাধা শোনেনি। নিজেই নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। মা যখন ধরে নিয়েছিল ডিভোর্স আমাদের হবেই, তখন সান্ত্বনা দেবার ধরন দেখেই তার প্রত্যাশা বুঝেছিলাম। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার কয়েক বলেছিল, অত বেশি ভাবিস কেন, ভুল আমাদের মা-মেয়ের দুজনারই হয়েছে—তা বলে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল ভাবার কি আছে।·ওর·থেকে ঢের-ঢের ভদ্র আর শিক্ষিত ছেলে আমার হাতের মুঠোয় আছে, তুই নিশ্চিন্ত থাক, ঈশ্বর যা করে সব মঙ্গলের জন্য।

মায়ের হাতের মুঠোয় কে আছে, আর তার কি আশা আমি খুব ভালো করেই জানি। মা ভাবছিল তার হাতের মুঠোর ভদ্র আর শিক্ষিত ছেলে ডাক্তার অরুণলাল। মালা গুপ্তার সঙ্গে তার ব্যাপার-স্যাপার জানার পরেও মায়ের ওই কথা শুনেও আমার গা জ্বলেছে।

আমাকে কিছু না বলে পিছনের জমিতে মা আলাদা বাংলো তোলার ব্যবস্থা করেছে। এ ব্যাপারেও বার বার ঘটিশীলায় গিয়ে লোক ডেকে কাজ শুরু করিয়েছে। বাংলো হয়ে যাবার পর সেখানে সরে গেছে। তারপর রিখুকে এনে আনজেলাকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছে। আমি বাধা দিইনি। বিশ্বাস যাকে আর করতেই পারবে না, তার জন্যে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থেকে শরীর মাটি করে লাভ কি। এর পরেও অরুণলাল প্রায় নৈমিত্তিক এসে তাকে দেখে যায়। মায়ের অত বয়েস না হলে এ-নিয়েও কথা উঠত। জেরির কাছে বয়সের দামও নেই। ও সুযোগ পেলেই হেসে হেসে বলে, প্রেমের আবার বয়েস কিছু আছে নাকি—প্রেম চির অন্ধ।

রাগ করে লাভ নেই, পাল্টা ঝাঁঝে বলি, মালা গুপ্তা তাহলে ওই ডাক্তারের কাঁধের ওপর মাথা থাকতে দেবে ?

জেরি মজা পেয়ে হাসে। বলে, মালা গুপ্তা একখানা মেয়ে বটে, দুনিয়ার কোনো মেয়ে নিজের স্বামীকে এমন অন্ধকারে রাখতে পেরেছে কিনা জানি না, প্রসাদ গুপ্তা অন্ধকারের সমুদ্রে মনের আনন্দে সাঁতরে চলেছে।

মা যতই নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে আলাদা হয়ে সরে যাক, তলায় তলায় আমার জন্য দুর্ভাবনা আছেই। নিজেই আমাকে ডেকে জানিয়েছে, জেরির ড্রু-ইং এবার থেকে মাসে চার হাজার করে দিলাম—ওকে বলে দিস, এ-ই শেষ! এর পরেও ফের বাড়াবাড়ি করলে তোর সঙ্গেও আর আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

সমস্ত ব্যবসা আমার নামে হলেও সব-কিছুর আসল মালিক মা-ই বটে। কিন্তু মা মালিকানার জোরে এ-কথা বলেনি। আমার দুর্বলতা বুঝতে মায়ের বাকি নেই। তাই ক্ষোভ। এই দুর্বলতা তার বিচার বুদ্ধির অগম্য। তার ধারণা সব জেনে শুনেই আমি ঘরে জান্ত হায়না নিয়ে বাস করছি।

মা আলাদা বাংলোয় সরে যাবার পর একে একে তিনটে বছর মোটামুটি নিরুপদ্রবে কেটেছে। তবু তার ভয় ঘোচেনি। সর্বদাই অনাগত বিপদের আশংকা। ব্লাড-প্রেসার চড়েই থাকে। অ্যানজেলাকে আমার ওপর সজাগ চোখ রাজতে বলে। রিখুকেও কিছু বলে নিশ্চয়। এ-লোকটা মুখ খোলার মানুষ নয়। কিন্তু অ্যানজেলার সঙ্গে রিখুর আলোচনা হয়। আলোচনা বলতে ও-ই ঠোঁট সেলাই-করা লোকটাকে বকে-বকে খুঁচিয়ে তার পেট থেকে কথা টেনে বার করতে চেষ্টা করে। রিখু নাকি ওকে বলেছে মেমসায়েব আর ছোট মেমসায়েবের ক্ষেতির চেষ্টা যে করবে ও তার লাশ ফেলে দেবেই— মারাংবুরু নিজে এসে দাঁড়ালেও ওর লাঠির হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। মারাংবুরু ওদের সর্বশক্তিমান দেবতা যে সব থেকে উঁচু পাথড়ের চূড়ায় বাস করে।

অ্যানজেলা আমার দিকে চোখ রাখে ঠিকই, কিন্তু জেরির ভয়ে ও নিজেই সর্বদা কাঁটা হয়ে আছে। মানুষ শত্রু হলে অ্যানজেলার বুকের পাটা দশ হাত। কিন্তু প্রেত আত্মা আর জিন যাদের সহায়, ডাকিনী যোগিনীরা যাদের হুকুমের দাসী— রক্তমাংসের মানুষ হয়ে সে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় কি করে? জেরি সাহেবকেও ও এখন এই শক্তির অধিকারী মনে করে। তা না হলে মেমসাহেবের এত ভয় এত দুশ্চিন্তা কেন? মা ডাক্তারকে পর্যন্ত বলেছে, জামাই যে-করেই হোক তার মেয়েকে বশ করেছে, গুণ করেছে, তা না হলে জেরিকে ও কিছুতে ছাড়ছে না কেন, ছাড়তে পারছে না কেন? আলাদা বাংলোয় সরে যাবার আগে মায়ের এ-সব কথা অ্যানজেলা নিজের কানে শুনেছে। ডাক্তার সাহেব অবশ্য হেসে মা-কে অভয় দিয়েছে, বলেছে এ-সবে সে একটুও বিশ্বাস করে না। কিন্তু মায়ের কি তাতে ভয় গেছে? অ্যানজেলাকে নিয়ে কি মা এই সেদিনও রামদেও মাহাতোর ডেরায় যায়নি? মেয়ের ভয় আর নিজের ভয়ের কথা তাকে খোলাখুলি বলেনি? শুনে রামদেও মাহাতোর নাকি দু' চোখ আগুনের গোলার মতো হয়েছিল। রাগে দাঁত কড়মড় করেছে, আর মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলেছে, মায়ের সাহেব জামাই এখন আরো সব সাহেব আর মেমসাহেবদের নিয়ে তার দুশমন দেওকীনারাঙের দলে ভিড়েছে, তার সঙ্গে দোস্তি করেছে। দেওকী নারাঙ খোদ শয়তানের বাচ্চা—লোকের ভালো করতে জানে না, দুশমনি ছাড়া আর কিছু জানে না। রামদেও মাহাতো কারো



নসিব খারাপ করতে চায় না, কিন্তু তার আপনা আদমীর যে ক্ষতি করতে আসবে সে তাকে জাহান্নমকা ফটক দেখায়ে ছাড়বে, আগ্ লাগিয়ে সব পুড়িয়ে মারবে। নিজের বুক ঠুকে বলেছে, তুম ডরো মাত্ মেমসাব— রামদেও মাহ্তো আভিতক জিন্দা হ্যায়!

এত বড় অভয় পেয়েও মা নাকি ভয়ে সাদা হয়ে ঘরে ফিরেছে। ইদানীং হিপি মেয়েপুরুষদের সঙ্গে জেরির গলায় গলায় ভাব এ তল্লাটের সকলেই লক্ষ্য করেছে। তাদের নিয়ে ও দেওকী নারাঙের দলে গিয়ে ভিড়েছে শুনেই হয়তো মা ভয়ে সিঁটিয়ে গেছল। ভয় ভাঙানোর জন্যেই সোজা মায়ের ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। রাগ করেই বলেছিলাম, কেন তুমি রামদেও মাহাতোর কাছে যাও, আর কেনই বা এ-সব বুজরুকিতে বিশ্বাস করো?

মা রেগে গেছল। —অ্যানজেলা বলেছে?

—বেশ করেছে বলেছে। তোমার ভয় দেখে অত সাহসী মেয়েটা পর্যন্ত ভয়ে অস্থির। তুমি যত ভয় পাবে ওদের ততো সুবিধে বুঝতে পারছ না? এই তিন বছরে জেরি তোমার বা আমার কোনো ক্ষতি করতে পেরেছে? ভয় পেয়ে তুমি নিজের শরীরটাই শুধু মাটি করছ!

খানিক চুপ করে থেকে মা যা বলেছিল তা অবশ্য এই সব অলৌকিক বিদ্যাবিশারদদের আর এক দিক। —তুকতাক ঝাড়ফুঁকে তোর আমার কোনো ক্ষতি হবে না এটা বুঝি— কিন্তু এই সব লোক নিজেদের পোষা শয়তান লেলিয়ে দিয়ে লোকের সর্বনাশ করে অলৌকিক ক্ষমতা জাহির করে সে-খবর রাখিস?

...জেরির সঙ্গে রামদেও মাহাতোর ডেরায় যেদিন গেছলাম, টিপ্পনী কেটে সেদিন জেরিও ওই রামদেওকেই এ-কথা বলেছিল মনে পড়ল। তবু জোর দিয়েই বলেছিলাম, রথী মহারথীরাও তো গণ্ডায় গণ্ডায় গুণ্ডা বদমাস পোষে কাগজে দেখো না, আমাদের সঙ্গে এ-সব ভয়ের কি সম্পর্ক!

মা রেগে গিয়ে বলেছে, তুই তো কিছুর সঙ্গেই কিছুর সম্পর্ক দেখিস না, ওই হিপিগুলোর সঙ্গে জেরি এত মেশে কেন, ওরা কে কি মতলবে আছে কেউ বলতে পারে?

যুক্তি তর্কে মা-কে কিছু বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। মা ভাবে জেরি তার মেয়েকে গুণ করেছে, বশ করেছে। কোন্ জাদুতে বশ করেছে তা যদি মুখের ওপর বলে দিতে পারতাম!

...মা জানে না, সে আলাদা বাংলোতে সরে যেতে জেরির প্রতি আমার আচরণ আরো কত কঠোর হয়ে উঠেছে। মনের দিক থেকে দুজনে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করছি। আমার মগজে দিন রাত ব্যবসা আর লাভ লোকসানের হিসেব। আর ওর মগজে কেবল ভুড়ু নেশা আর জুয়া। আমি ও নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। আমার হিসেবের মধ্যে ও স্বার্থের হাত বাড়াতে চাইলেই আমি ক্ষিপ্ত হয়ে সে-হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাই। তখনই শুধু যা ঠোকাঠুকি লাগে। যতই ভুড়ুর গবেষণা করুক, নেশার

গবেষণায় মেতে উঠুক আর জুয়ায় ডুবে থাক— চোখ বুজে তো আর থাকে না। এতগুলো ব্যবসায় লাভের পরিমাণ কি হারে বেড়ে চলেছে ঠিক আঁচ করতে পারে। ব্যবসা নিয়ে ওর সঙ্গে একটি কথাও হয় না, মুখে কলুপ এঁটে থাকি। ও কিছু জিগ্যেস করলেও বিরক্তিতে ফেটে পড়ি। এই থেকে ও লাভের অঙ্কটা আরো বড় ছাড়া ছোট করে দেখে না। তাছাড়া নেশা আর জুয়া খেলা যে-ভাবে চলেছে—ওর অভাব ঘুচবে কি করে ? অলৌকিক বিদ্যার খেল্ দেখিয়ে আর যা-ই পারুক, টাকা বানাতে পারে না। ছ'মাস অন্তর অন্তর জেরি টাকা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েই চলেছে। আমরা যেন মহা অবিচার করে চলেছি তার ওপর। হিসেবের কাগজ-পত্র দেখাই না, ব্যাঙ্কের পাশবই দেখাই না, ইনকামট্যাক্সও নিজেরাই করছি—ও ধরেই নিয়েছে লাভের লেখাজোখা নেই তাই সব-কিছু গোপন। লাভ বাড়ছে অথচ ও তার ভাগ পাচ্ছে না এ কেমন কথা। আমার সাদা সাপটা জবাব, যা পাচ্ছ তাই বেশি। আমাদের এত পরিশ্রমের টাকা থেকে মাসে চার হাজার করে জলে যাচ্ছে ভাবলেই গা জ্বলে আমার।

ঘাবড়ে গিয়ে মা দুই একবার টাকা বাড়াতে চেয়েছে। তার ভয় কোনো যুক্তির পথ ধরে চলে না। ভাবে দিলে জামাই ঠাণ্ডা থাকবে। কিন্তু আমিই ক্ষিপ্ত হয়ে বাধা দিয়েছি। মা-কে সাবধান করেছি, আমাকে না জানিয়ে ওকে এক পয়সা বেশি দিলে মা হয়ে তুমি আমারই সব থেকে বেশি ক্ষতি করবে জেনো। আর জেরির ওষুধ আমার ঠাণ্ডা মেজাজ। এখন আমার ঘরেও টেলিফোন আছে একটা। আর ছোট নোট খাতায় কিছু ইমপরট্যান্ট লোকের নাম-ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা আছে। এতে জামসেদপুরের এক নাম-করা উকিলেরও নাম-ধাম ফোন নম্বর লেখা আছে। আমার মুখ থেকেই জেরি প্রথম জেনেছে, ওই নামী উকিলের সঙ্গে আলোচনা করে ডিভোর্সের ব্যাপারে আমি অনেকটাই এগিয়ে গেছলাম। একবার আমাকে গোপন করে মা-কে প্রায় হুমকি দিয়েই টাকা বাড়ানোর কথা বলেছে শুনে খুব ঠাণ্ডা মুখে ওকে বলেছি, টাকা আরো তাহলে তোমার চাই-ই—কেমন ? জবাবের অপেক্ষা না করে নোট বই খুলে জামসেদপুর চাইতেই ও এগিয়ে এসে দেখেছে কাকে ফোন করছি। হাত দিয়ে চেপে লাইন কেটে দিয়েছে। তেমনি ঠাণ্ডা চোখে ওকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি। বলেছি, আর কোনদিন এতটুকু বাড়াবাড়ি করলে তুমি আমাকে কোন্ রাস্তায় যেতে বাধ্য করবে খুব ভালো করে জেনে রেখো !

এরপরে থেকে আমার এই ঠাণ্ডা মূর্তি আর ঘরে এসে রিসিভার তোলাই ওর ওষুধ।

মা সরে যাবার ছ'মাসের মধ্যে জেরির রাতের শয্যাও তার ওই কোণের ঘরে ঠেলে দিয়েছি। বদ নেশার মাত্রা বেড়েই চলেছিল। ঘরে ঢুকলে দুর্গন্ধ পেতাম। রাগ করেই একদিন ওর বালিশ-টালিশ ও-ঘরে ছুঁড়ে দিয়ে এসেছি। বলেছি ও-সব বাজে নেশা করে এলে আমার ঘরে ঠাঁই নেই। মা এ-খবরও অ্যান্‌জেলার মুখে শুনে থাকবে। এটা বিচ্ছেদের সূচনা ভেবে মনে মনে হয়তো খুশিও হয়েছিল।

এরপর থেকে ওই সব বাজে নেশা আর খুব বেশি নেশা করে এলে জেরি আমার



ঘরে ঢোকেই না। তাছাড়া রাত দশটার পরে এলেও দেখে আমার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। ওর নেশারও কামাই নেই, ঘড়ির সময়ের সঙ্গেও যোগ নেই। কিন্তু কখনো খুব-চেনা সেই তৃষ্ণার অনুভূতিটা যখন দু'পায়ের দিক থেকে হাঁটু বেয়ে তলপেট কোমর বেয়ে বুকের দিকে মুখের দিকে উঠতে থাকে— তিমির তৃষ্ণার ওই অনুভূতিটা চেষ্টা করেও পিষে নির্মূল করে ফেলতে পারি না, তখন ও বাড়ি ছেড়ে বেরুবার আগেই চলে আসি। জেরিকে বলারও তেমন দরকার হয় না, আমার সেই মুখের দিকে তাকালেই ও বুঝতে পারে। সেদিন আর কোনরকম বাজে নেশা অন্তত করে না। সেদিন ও মাথা উঁচিয়ে রাজার মতো আমার ঘরে আসে।

অ্যান্‌জেলা দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে। আমারও পরিবর্তন দেখে। মা-ও নিশ্চয় যা শোনার ওর মুখ থেকেই শোনে। আর তার পরেও ভাবে কি করে জেরি রুবিন তার মেয়েকে গুণ করেনি, বশ করেনি !

## ॥ ৭ ॥

সাতাশ বছর বয়েসটা জীবনের সব থেকে পয়মন্ত বছর ভেবেছিলাম। ছাব্বিশ ছাড়িয়ে সাতাশে পা দেবার দিনেই জাদুঘোড়ার অ্যাটমিক মিনারাল প্রোজেক্টের গাড়ি আর স্টেশনওয়াগনের যাবতীয় কাজ লিলি গ্যারাজ আর লিলি সার্ভিসিং স্টেশন পেয়েছে। তার সাত দিনের মধ্যে লিলি ট্রান্সপোর্টের দুটো লরির একটা কপার করপোরেশান সম্বৎসরের জন্য বুক করেছে। এই সময়েই আমি একটা নতুন গাড়ি কিনেছি। আর গাড়ি না থাকা ভালো দেখায় না। অত ব্লাডপ্রেসার নিয়ে সাইকেল রিকশয় চেপে মা নানা জায়গার কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ আর সদ্ভাব রক্ষার কাজ আগের মতো পেরে উঠছিল না। তাছাড়া ব্যবসা যত বড় হচ্ছে সবদিকে চোখ রাখার দায়িত্বও ততো বাড়ছে। তার সর্বদাই খেদ, জামাই অমানুষ না হলে ভাবনা ছিল না। ওই একজনের কাছে মা চরম ঠকাই ঠকেছে ভাবে।

মায়ের কাছ থেকে পাবলিক রিলেশনের ভার নিয়ে দেখলাম গাড়ি ছাড়া আর চলে না। তেমন প্রেসটিজও থাকে না। গাড়ি কিনেই জেরিকে শাসিয়ে রেখেছি, ওতে হাত দেওয়া মনেই বরাবরকার মতো আমাকে হাতছাড়া করা। হাত না দেবার আরো কারণ ওই মোটরবাইক তার ভারী প্রিয়। নিজেই ওটা খুব যত্ন করে ধোয় ঝাড়ে মোছে তেল লাগায়। লোকের চোখে জেরি রুবিন আর তার মোটরবাইক অবিচ্ছিন্ন। রাস্তা কাঁপিয়ে ওটা ছুটিয়ে নিয়ে চলে যখন, লোকে সন্ত্রস্ত হয় পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়, ওই উল্কা বেগের সঙ্গে ওর চরিত্রের মিল দেখে।

নতুন গাড়ি হাঁকিয়ে চলার রোমাঞ্চ আমারও কম নয়। নিজেই ড্রাইভ করি। এই বয়সের ভর-ভরতি মেয়েকে সম্প্রতি হাসিমুখে ব্যবসা নিয়ে মেতে থাকতে দেখলে নানা প্রতিষ্ঠানের ছোট বড় অফিসাররাও অখুশি হয় না। সকলেরই হাসি মুখ দেখি, সদয়

অভ্যর্থনা আর আশ্বাস পাই। ঘনিষ্ঠজনের মতো তারা মায়ের স্বাস্থ্যের খবর নেয়। কেউ কেউ জেরির খবরও জিগ্যেস করে আমার মুখভাব নিরীক্ষণ করে। এ-রকম পরিপূর্ণ এক মেয়ের পারিবারিক জীবন কতটা বরবাদ হয়ে গেল বুঝতে চেষ্টা করে।

সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারলে ব্যবসার সুবিধে হবে মনে হলে হাসি গিলে মুখখানা যতটা সম্ভব মলিন করে ফেলি। প্রায় সকলেরই ধারণা এমন মেয়েটা একেবারে অমানুষের হাতে পড়েছে। মোসাবাণীর অভিজাত ক্লাব—যেখানে মালা গুপ্তা বিশেষ একজন—দরকার বুঝে সেখানেও মাথা গলিয়েছি। পদস্থ ভদ্রলোকের ঘরণীরা আমার অসামাজিকতা দেখলে টাকার দেমাক ভাববে। আমি আসাতে মালা গুপ্তা বাইরে অন্তত খুব খুশি। গাড়িতে লিফ্‌ট্ দেবার কল্যাণে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমার খুব খাতির হয়ে গেল। আভাসে ইংগীতে তারা মালা গুপ্তা আর ডাক্তার অরুণলালের প্রেম-প্রীতির ব্যাপারটা কেমন চলছে জানতে চায়। আমি হাসি। বলি জানি না। এই থেকেই বুঝতে পারি আড়ালে আবার তারা মালা গুপ্তার কাছেও জানতে চায় জেরির সঙ্গে আমার ঘরের দিন কেমন কাটছে।

অরুণলাল সপ্তাহে দুই একদিন ক্লাবে আসে। সময়ের অভাবে আমিও তাই। আমাকে দেখলে বেচারা কেমন একটু সংকুচিত হয়ে পড়ে। সে মালা গুপ্তার গাড়িতে আসে তার গাড়িতেই ফেরে। মালা গুপ্তা কারো বক্র কটাক্ষের ধার ধারে না। কিন্তু এখানে এলে ওই ডাক্তার আরো গম্ভীর অথচ অমায়িক। কিন্তু ইদানীং হঠাৎ এক আধ দিন দেখা যাচ্ছে ডাক্তার এসেছে, মালা গুপ্তা আসেনি। ডাক্তার সেদিন আমার সঙ্গে আমার গাড়িতেই ফেরে। মায়ের কল্যাণে তার সঙ্গে মেলামেশাটা আরো সহজ হয়ে গেছে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে টিকলিতে ফিরবে বলল আমি ঠাট্টা করে বসেছিলাম, সেটা কারো বিরাগের কারণ হবে না তো?

সামান্য হাসতে চেষ্টা করে মাথা নেড়ে ছিল, হবে না। সেই দিন ভদ্রলোককে কেমন বিষণ্ণ মনে হয়েছিল আমার। ফেরার সময় আমার পাশে বসেই এসেছে, কিন্তু মনে হয়েছে খুব কাছে নেই।

মায়ের সঙ্গে ডাক্তার আর মালা গুপ্তাকে নিয়ে কথা উঠলে মা সর্বদা মালা গুপ্তার দোষ দেখে। বলে একটা মেয়ে নির্লজ্জের মতো ছেলেটার সঙ্গে লেপটে থাকতে চাইলে ও কি করবে, গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে? তার ওপর দেশের চেনা-জানা মস্ত বড়লোকের মেয়ে। ...কত সময় লাল যখন চেম্বারে, তখনো ওই মেয়ে বাংলোয় এসে ওর ঘর দখল করে বসে থাকে জানিস্?

মা জানে কি করে আমি আর তা জিগ্যেস করি না। অসুখ অসুখ ভাবটা যখন ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়ায় তখন তার যষ্ঠি একমাত্র কোনো নির্ভরযোগ্য ডাক্তার। মায়ের তাই হয়েছে। তার মতে লালের মতো ঠাণ্ডা ভদ্র গুণের ছেলে আর হয় না। মা এখনো জেরির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ আশা করে এই একজনের এত গুণ গায় কিনা জানি না।

মনের আনন্দেই দিন কাটছে আমার। এরমধ্যে হঠাৎই এক অশান্তির সূচনা।



অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় সেটা। শীতের কামড় কিছু আগেই শুরু হয়েছে এবার।

সকালের চায়ের পর্ব শেষ হতেই মুখ কাঁচুমাচু করে জেরি বলল, কিছু টাকার খুব দরকার।

গত চার রাত আমার ঘরে আমার শয্যায় ওর ঠাঁই হয়েছে। এই শীতের মৌসুমে বেশিরভাগ সময় ও নেশায় টইটম্বর হয়ে থাকে। জুয়ায়ও সব থেকে বেশি হারে এই সময়েই। অনেক রাতে ফেরেই না। দলবল নিয়ে দেওকী নারাঙের আড্ডায় রাত কাটায়। হৈ-হল্লা করে, নেশা করে, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মহড়া দেয়। এরই মধ্যে চারদিন পর পর আমি দোকান থেকে বিকেলের মধ্যে ফিরেছি। কিছু বলতে হয়নি, মুখ দেখে যা বোঝার বুঝেছে। তখনো ওর মুখের হাসি সেই গোড়ার দিনগুলোর মতোই অদ্ভুত কাঁচা আর সুন্দর। দু'দিন বিকেলে আর বেরোয়নি। বারান্দার সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে কখনো গুণ গুণ করেছে, কখনো শিস দিয়েছে। ও মন দিয়ে শিস দিতে থাকলে এখনো আমি কাজ ভুলে সুরের জালে আটকে যাই। কিন্তু সেই মন সচরাচর আর দেখি না। অনেক দিন বাদে এই দু'দিন আবার শুনলাম। ...আর চারদিন বিকেল সন্ধ্যা বা রাত্রিতে নেশা করেইনি। গত রাতেও বলেছিলাম, ইচ্ছে করলেই তো তুমি পারো তবু কেন এ-সব ছেড়ে দাও না।

মুখের দিকে চেয়েও নিঃশব্দে যেমন হাসে তেমনি হেসেছিল। বলেছিল, ইচ্ছে করলেই তো তুমি আমাকে বেশ ছেড়ে থাকতে পারো, তবু কেন একেবারে ছেড়ে দিতে পারো না।

আমার মেজাজ পত্র এখন খুব ভালো ধরে নিয়েই ওরও এখন টাকার খুব দরকার। কড়া করে জবাব দিলাম, হবে না, টাকা নেই।

জেরি আবার বলল, সত্যি খুব দরকার, এটা ঠিক নিজের জন্য চাইছি না, এই প্রথম আমরা একটা জিনিস করতে যাচ্ছি...এর জন্য টাকা চাইলে দেব না বলাও ঠিক নয়...মিসেস গুপ্তাও এক হাজার টাকা দেবে বলেছে... তোমার কাছ থেকে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা না পেলেই নয়।

পাঁচ হাজার শুনেই আমার মাথা গরম। কিন্তু কি ব্যাপার, মালা গুপ্তা হাজার টাকা দেবে শুনে তা-ও শোনার ইচ্ছে।—নিজের জন্য চাইছ না, তাহলে এত টাকা দিয়ে কি হবে?

—এই অক্টোবরের শেষ দিনে আমরা হ্যালুইন নাইট' করব।

—হ্যালুইন নাইট! সেটা কি?

—প্রেত তত্ত্ব আর আণ্ডার-ওয়ারলড্ স্পিরিটে যারা বিশ্বাস করে তারা এও বিশ্বাস করে হ্যালুইনের রাতে সমস্ত অশরীরী আত্মারা পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশ্বাসীদের উৎসব করে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে হয়। অশরীরী আত্মাতো এসে তাদের ওপরেই ভর করে। 'হ্যালুইন নাইট' হল অল সেন্টেস্ ডে'র আগের রাত। যে আত্মারা মুক্ত হয়নি তাদের রাত। আমার গম্ভীর মনোযোগ দেখে জেরির উৎসাহ বাড়তে

থাকল। —অ্যামেরিকায় কত জায়গায় এই হ্যালুইন রাতের উৎসব হয় জানো না। হ্যালুইন শপ বসে যায় হাজার হাজার ডলারের হ্যালুইন ড্রেস, হ্যালুইন মাস্ক, হ্যালুইন ক্যাণ্ডল বিক্রি হয়—ওই পোশাক আর মাস্ক পরে নেচে নেচে রবতুলে প্রেত আত্মাদের ডাকতে হয়—ধরো কেউ ড্রাকুলা কেউ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কেউ বা কোনো পশুর আত্মা আনতে চায়—তাকে সেই রকম সাজসজ্জা করে মাসক পরে উপযুক্ত আত্মা আনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে—ভূত প্রেত পিশাচ ডাইনীর সাজ সরঞ্জাম না হলে সেই পরিবেশ হবে কি করে ? এক-একটা উৎসবে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়, হ্যালুইন রাতের নেমন্তন্ন কেউ তুচ্ছ করলে অমঙ্গল হয়—দেওকী নারাঙের অন্তত শতখানেক লোক আর আমারও বিশ তিরিশজন এতে পার্টিসিপেট করবে—এত লোকের ড্রেস সাজ-সরঞ্জাম আর খাওয়া দাওয়ার খরচ কম ?

আরো ঠাণ্ডা মুখ করে জিগ্যেস করলাম, পার্টিসিপেট যারা করবে তারা নেশা করবে না ?

—এই শীতে সমস্ত রাত ধরে উৎসব চলবে নেশা তো করতেই হবে, তাছাড়া নেশা ছাড়া প্রেত আত্মা ডাকার মতো অ্যাটমসফিয়ারই বা হবে কি করে ?

এবারে রাগে ফেটে পড়ার মুখ আমার। —টাকা খুব শস্তা না ? খোলামকুচি ? তোমাদের যত সব নোঙরা ন্যাস্টি ফুর্তিতে আমাকে টাকা ঢালতে হবে ? পাঁচ হাজার ছেড়ে পাঁচ টাকাও আমি দেব না এটা খুব ভালো করে জেনে রেখো।

জেরির উৎসাহ আর উদ্দীপনা এক ফুঁয়ে নিভে গেল। আমার দিকে থমকে চেয়ে রইল। তারপর ঠোঁটে হাসির ফাটল একটু, দু'চোখেও হাসির ছটা। ওর দিকে চেয়ে এই প্রথম হঠাৎ কি রকম অস্বস্তি বোধ করলাম। মনে হল ওই হাসির তলায় একটা ধারালো ছুরি চকচক করছে।

আমি টাকা না দিলেও দিন কয়েকের মধ্যে হ্যালুইন রাতের আয়োজন টের পেতে লাগলাম। টিকলিতে পোস্টার পড়েছে, পোস্টার পড়েছে ঘাটশীলা রাখা মোসাবানীতেও। ভূত প্রেত দৈত্য দানার ব্যাপারে এই বুদ্ধি-মুক্তির শতকেও লোকের আগ্রহ আর রোমাঞ্চ কম নয়। ফলে প্রচার মন্দ পেল না। এমন উৎসবের নামও আগে কেউ শোনেনি তাই অনেকেরই কৌতূহল, আমাকেই অনেকে জিগ্যেস করেছে ব্যাপারখানা কি ? আমি জানি না বলে এড়িয়ে গেছি। মনে মনে জানি জেরির হিপি-হিপিনীর দল ওর মাথায় এই উৎকট উৎসবের প্রেরণা জুগিয়েছে। জেরি রুবিন এর আসল পাণ্ডা, পরে এই নিয়ে আমাকেও হয়তো কেউ কেউ ঠাট্টা করবে। ভাবতেই বিরক্তি।

সেই দিন এসে গেল। টিকলির সাঁওতাল পল্লী থেকে সুবর্ন রেখার শ্মশান পর্যন্ত হ্যালুইন নাইটের ভেনু। মজা দেখতে দর্শকের ভিড় কম হবে না বোঝা যাচ্ছে। আমি আর মা দুজনেই নেমন্তন্নের চিঠি পেয়েছি। সকাল থেকে অ্যানজেলার চোখ মুখের ভাবই অন্যরকম। সেই সকালে উঠেই সন্ধ্যে থেকে ছুটি চেয়ে রেখেছে। আমি মাথা



নেড়েছি, হবে না। অ্যানজেলার কাঁদ-কাঁদ মুখ। ও আর রিখু সাঁওতাল পল্লীতে যাবে ঠিক করেছে, মেমসাহেব রিখুর ছুটি মঞ্জুর করেছে, আর খরচের জন্য পঁচিশটা টাকাও তাকে দিয়েছে—এখন ও নিজে ছুটি না পেলে যেন সর্বনাশ। রাগ করে বলেছি, যাও তাহলে—কোনো পেত্নী এসে যেন তোমার ঘাড় মটকায়।

দোকানে বেরুবার আগে মালা গুপ্তার ফোন। —হ্যালুইন নাইটে আসছ তো ?

—না !

—সে কি ! নেমন্তন্ন পেলে যে যেতে হয় শুনলাম...আর কিছু না হোক, একটা মজার ব্যাপার তো দেখা যাবে !

—তুমি মজা দেখগে যাও।

হাসি। —আমি তো যাবই...এ-সবে যে একটুও বিশ্বাস করে না, তোমাদের সেই ডাক্তার অরুণলালও যাবে।

হাসলাম আমিও। —তুমি টানলে তো যাবেই।

দোকানে এসে মা-কে বেশ গম্ভীর দেখলাম। এক-একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেও লক্ষ্য করলাম। কি একটা হিসেবের দিকে চোখ রেখে হঠাৎ বলল, বিনডা আজ সন্ধ্যে থেকে থাকছে না।—

পিত্তি জ্বলে গেল। —তাকেও ছুটি দিয়ে দিয়েছ ? দেখি কেমন থাকে না—কোথায় সে ?

—একটুতে রেগে যাস কেন, ছেলেমানুষ যেতে চাইছে যাক। ওকে একটু কাজে পাঠিয়েছি।

মায়ের অনুযোগ বৃন্দাকে আমি বড় বেশি প্রশ্রয় দিই, ওর সঙ্গে আমি মালিকের মতো মিশি না। সব কটা ব্যবসার ক্যাশ সে হ্যাণ্ডেল করে বলে তার মাইনে এখন মাসে হাজার টাকা—মায়ের মতে এ-ও আমি বেশি বেশি করছি। অথচ এই বেলায় ও কিনা আমি আসার আগে মায়ের কাছ থেকে ছুটির ব্যবস্থা করে রাখল !

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ একটা সন্দেহ মাথায় ঢুকল। আরো আগেই ঢোকা উচিত ছিল। —মা, হ্যালুইন নাইট করার জন্য জেরিকে তুমি টাকা দাওনি তো ?

যেন শুনতেই পায়নি, মন দিয়ে কাগজপত্র দেখছে।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম। রাগে আর বিরক্তিতে ফেটে পড়লাম আমি। —এদিকে তাকাও ! ...কত দিয়েছ, পাঁচ হাজার ?

শুকনো মুখে বিড়বিড় করে মা বলল, না ...সাত হাজার ...তাতেও ওর অনেক ধার হয়ে যাবে বলল।

এরপর আর রাগ করে করব কি। ওই পাজির এত সাহস যে আমার কাছে পাঁচ হাজার চেয়ে পেল না বলে মায়ের কাছ থেকে সাত হাজার আদায় করে আক্কেল দিলে। বললাম, খুব ভালো করলে, আমি দিইনি—আর আমাকেই লুকিয়ে তুমি দিলে—খুব ভালো করলে ! এখন রাতে যাও, ভূত-প্রেত-ডাইনীরা তোমার ভাগ্যখানাকে একেবারে

স্বর্গে টেনে তোলে কিনা দেখে এসো !

ঢোঁক গিলে মা বলল, তুই বড় খামখা রাগ করিস, এখন তো আর বাড়তি কোনো সময় কিছু দিই-ই না—ছেলে মানুষেরা এত বড় একটা ব্যাপার করতে যাচ্ছে, না হয় গেল কিছু টাকা—আমেরিকার নানা জায়গায় হ্যালুইন নাইটে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় তা তো জানিস না। ...ভাবছিলাম সন্ধ্যের দিকে না হয় দোকান বন্ধই করে দিই নতুন ব্যাপার সকলেই যেতে চাইবে...নেমন্তন্ন যখন করেছে, তোতে আমাতেও না হয় দশ পনের মিনিটের জন্য ঘুরে আসব।

মায়ের ব্লাডপ্রেসারের চিকিৎসা করব না মাথার। বললাম ঠিক আছে সক্কলকে নিয়ে তুমি যাও, আজ আমি সমস্ত রাত একলাই দোকান খুলে বসে থাকব। ভয় পেয়ে পেয়ে তুমি আমার হাড়-পিত্তি জ্বালিয়ে দিলে একেবারে—বুঝলে ? শীতের রাতে তুমি এই শরীর নিয়ে যাবার কথাও ভাবছ !

আমার ভয়েই মা যাওয়ার চিন্তা ছাড়ল বটে, কিন্তু এ-ও বুঝলাম তার ভিতরে ভেতরে একটু খুঁত খুঁতুনি থেকে গেল। কারণ হ্যালুইন নাইটের নেমন্তন্ন তুচ্ছ করতে হয় না শুনেছে।

অ্যানজেলা আর রিখু কত রাতে ফিরেছে টের পাইনি। পরদিন সকালে দেখি অ্যানজেলার থলথলে কালো মুখ এক রাতেই চুপসে গেছে। আর থেকে থেকে আমাকেও অদ্ভুত চোখে লক্ষ্য করছে। জ্যান্ত ভূত প্রেত দেখে ভয় পেয়েছে ? আমার রাগ পড়েনি বলেই কিছু জিগ্যেস করলাম না। একটু বাদে মা ঘরে এসে হাজির। তার সমস্ত মুখ কাগজের মতো সাদা। —শুনেছিস সব ?

—কি ?

—একটু আগে মালা ফোন করেছিল...দেওকী নারাঙের বজ্জাতি শুনেছিস ? অ্যানজেলা কিছু বলেনি ?

—বোসো। কি শুনব ? তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন ?

শুনলাম কেন। খুব জমজমাট উৎসব হয়েছে, লোকে খুব মজা পেয়েছে। জেরি আর হিপিদের অনেকের ওপর সত্যি আত্মা ভর করেছে এমন বিশ্বাসও কেউ কেউ করেছে। আবার কেউ বলছে নেশায় বে-হেড হয়েই তারা এক একজনকে ধরে ধরে ভবিষ্যত বলেছে। জেরি মেফিস্টোফিলিস সেজে খোদ শয়তানের আত্মাকেই ডেকেছিল। কিন্তু কেউ তারা কোনো লোকের মন্দ হবে বলেনি। সবারই সৌভাগ্যের ভবিষ্যদ্বানী করেছে। উৎসবের শেষের দিকে বন-ফায়ারের আইটেমও বাদ যায়নি। দেওকী নারাঙ বিরাট আগুনের কুণ্ড জ্বেলে তার মধ্যে এক একজনের চিহ্ন দেওয়া পাথর ফেলে দিতে বলেছে। এতে আয়ুর জোর জানা যাবে। আগুন নেভানো হলে যাদের চিহ্ন দেওয়া পাথর পাওয়া যাবে তাদের নির্বিঘ্ন দীর্ঘ পরমায়ু। যাদের নামের চিহ্ন দেওয়া পাথর পাওয়া যাবে না, ধরে নিতে হবে তাদের পাথর প্রেতআত্মারা সরিয়েছে। তার মানে ওই দিন থেকে এক বছরের মধ্যে তাদের অবধারিত মৃত্যু।



সকলকে পাথর ফেলতে দেওয়া হয়নি। যাদের কদর বেশি শুধু তাদের চিহ্ন দেওয়া পাথর ওই আগুনে পড়েছে। মিসেস মার্থা রয় উৎসবে এত টাকা দিয়েছে সেই খাতিরে দেওকী নারাঙ তার আর তার মেয়ে লিলির নামে চিহ্ন দেওয়া পাথর সেই আগুনে ফেলেছে। আর গুণীন রামদেও মাহাতোর সম্মানেও একখানা পাথর ফেলা হয়েছে।

...সেই একশ দেড়শ পাথরের মধ্যে মাত্র তিনটি চিহ্নিত পাথর উধাও। একটা মার্থা রয়ের, দ্বিতীয়টা লিলি রুবিনের, আর তৃতীয়টা রামদেও মাহাতোর। অনেক বলাবলি করছে, এই তিনজন হ্যালুইনের নেমন্তন্ন তুচ্ছ করেছে বলেই আত্মারা এই তিনজনের প্রতি ক্রুদ্ধ।

দেওকী নারাঙের বজ্জাতি বুঝেও মা দারুণ ঘাবড়েছে দেখে আমি বকাবকি শুরু করে দিলাম। কিন্তু মায়ের শরীর হঠাৎ এত খারাপ হল যে টেলিফোনে অরুণলালকে ডেকে আনলাম। মায়ের অবস্থা দেখে সে কড়া ডোজে ঘুমের ইনজেকশন চালিয়ে দিলে। বললে, ভালো ঘুমোতে পারলে নার্ভ ঠাণ্ডা হবে।

তাকে এগিয়ে দিতে এসে টিপ্পনীর সুরে জিগ্যেস করলাম, আপনার নামে বন্ ফায়ারে পাথর পড়েছিল ?

—মিসেস গুপ্তা তার স্বামীর নামে আর আমার নামে ফেলেছিল।

—স্বামীর বড় ভাগ্য...যাক, আপনারা তাহলে নিশ্চিন্ত।

অন্যমনস্কের মতো হাসল একটু। —ভাঁওতাবাজীর ব্যাপার, বুঝতেই তো পারছেন...।

--আমি খুব ভালোই বুঝছি, কিন্তু মা কেন এই সোজা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না ?

আবারও অন্যমনস্ক একটু। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ভাবনার কারণ আছে বলেই ঘাবড়াচ্ছেন। এটা যে ভাঁওতাবাজী উনিও জানেন...কিন্তু ভবিষ্যদ্বানী মিথ্যে নয় প্রমাণ করার জন্য দেওকী নারাঙ যে তৎপর হবে না তার গ্যারান্টি কোথায় ?

শুনে আমিও সচকিত। এদিক থেকে ব্যাপারটা একবারও চিন্তা করিনি। ফিরে আসার সময় হঠাৎ চোখের সামনে জেরির সেই মুখ আর সেই হাসি ভেসে উঠল। ওই হাসি আর ওই চাউনি ক্ষুর ছুরির ফলার মতো মনে হয়েছিল। আমার ভেতরটা ইস্পাত কঠিন হয়ে উঠেছে অনুভব করতে পারি।

দোকানে গিয়ে বৃন্দাকেও খুব গম্ভীর দেখলাম। আমাকে দেখলেই ওর মুখখানা খুশিতে ভরাট হয়ে ওঠে। আমি নিশ্চিত জানি ও আমার বাসনা শূন্য প্রেমিক। আমি হাঁ বললে হাঁ, না বললে না। আমার অমতে মায়ের হুকুমও মানে না বলে মা কত সময় ওকে বকা-বকি করে। আমি একসময় হেসেই বললাম, কি গো, তুমিও বনফায়ারের সুখবর শুনেছ নাকি ?

বৃন্দা বিড়বিড় করে বলল, শুনতে যাব কেন, নিজের চোখেই তো দেখলাম।

—তুমিও তাহলে আমার অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত ?

—তা না ...রামদেও মাহাতোর অনেক বয়েস হয়েছে, সে একটা বছর না-ও বাঁচতে

পারে... কিন্তু আপনার আর মেমসাহেবেরও পাথর হাওয়া হবে কেন ? অথচ নেই যে এটা ঠিক, আমিও আঁতি-পাতি করে খুঁজেছি।

হঠাৎ কি মনে হতে জিগ্যেস করলাম, তুমি কি কিছু নেশা-টেশা করেছিলে ?

শুনেই মুখ শুকালো। চুপ একেবারে।

—কি হল ? হ্যালুইন নাইটে নেশা করলে পুণ্যি শুনেছি...করেছিলে ?

—জেরি সাহেব জোর করে কি সব খাইয়ে দিয়েছিল।

বললাম, ওই জন্যেই তোমার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হয়েছে।

মনে হল বৃন্দা কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু সেই থেকে ডাক্তার অরুণলালের কথাই আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। দেওকী নারাঙ তার ভবিষ্যদ্বানী মিথ্যে নয় প্রমাণ করার জন্য তৎপর হবে না তার গ্যারান্টি কোথায় ? আর মনে হলেই জেরির সেই হাসি মুখের ছুরির ফলার মতো চাউনিও চোখে ভাসছে।

কিন্তু মায়ের সঙ্গেও আমি এ নিয়ে কোনরকম আলোচনা করিনি। মা সুস্থ হয়েছে বটে কিন্তু বেশ চুপচাপ। ডাক্তার অরুণলাল রোজই সকালে এসে একবার করে তাকে দেখে যায়। খুব ভদ্রভাবে যুক্তি দিয়েই মায়ের ভয় ভাবনা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। এদিকে জেরির দেখা মিলল ওই হ্যালুইন নাইটের পাঁচ দিন পরে। মুখে সেই কাঁচা মিষ্টি হাসি। তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য করে গেছি। কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি। আমি ইচ্ছে করেই বনফায়ারের পাথর দেবার কথা আগে জিজ্ঞেস করিনি। দুশ্চিন্তা দেখিয়ে ওই কথাটা তোলে কিনা সেই প্রতীক্ষা। কিন্তু মনে হয়েছে ও-ব্যাপারটা তার আর মাথাতেই নেই।

তাই আরো যাচাই করার জন্য আমিই বলেছি, আমার আর মায়ের দিন তো তাহলে এসেই গেল, প্রেতআত্মাদের ভবিষ্যদ্বানী ঠিক হলে এতবড় ব্যবসার তুমিই তো তাহলে মালিক।

ইংগীত প্রথমে বুঝতেই পারেনি মনে হল। তারপর সেই নিঃশব্দ হাসি। —তুমিও যেমন, দেওকা নারাঙ খুব ভালো করেই জানে তোমার মা রামদেও মাহাতোর ভক্ত—তাই তোমাকেও তাই ভাবে। এই রাগে সক্কলের পরমায়ু ঘুচিয়ে দিলে। তোমরা কি এ সব শুনে ঘাবড়েছ নাকি ?

ভিতরে ভিতরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম একটা। মুখে বললাম, এতদিন ধরে দেখার পরেও আমাকে কি খুব ঘাবড়াবার মেয়ে মনে হয় তোমার ?

জেরি হেসেই স্বীকার করল, তা অবশ্য মনে হয় না। ...কিন্তু মাদার বড্ড ঘাবড়েছে শুনলাম ?

আমার দু'চোখ আবার ওর মুখের ওপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ব্যতিক্রমের মধ্যে অত সুন্দর মুখেও অতিরিক্ত নেশা করা রাত-জাগার ছাপ পড়েছে। ফিরে জিগ্যেস করলাম,



পাঁচদিন বাদে এই তো ফিরলে—এমন সুখবরটা তোমাকে কে দিলে ? দেওকী নারাঙ শুণে বলেছে ?

হাসছে। —নাঃ, মাদারের ইয়ং লাভার বলেছে ...তোমাদের ডাক্তার অরুণলাল। তার বাংলোর পাশ দিয়ে আসছিলাম, দেখা হয়ে গেল। সে আবার তখন বারান্দায় বসে তার লাভারকে বুকে তুলে সোহাগ করছিল—

অরুণলাল ওকে এ-কথা বলেছে শুনে বিরক্ত হতে যাচ্ছিলাম, পরের কথায় কান গরম, বোকার মতো প্রথমেই মালা গুপ্তার কথা মনে হয়েছিল। দিনের বেলায় সক্কলের চোখের ওপর বাংলোর বারান্দায় বসে লাভারকে বুকে তুলে সোহাগ করছিল কি ! তারও কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে !

কিন্তু এই পাজি আমার মুখ দেখেই ভুল বুঝল। মুখের হাসি কান পর্যন্ত ছড়ালো। তেমনি হাসতে হাসতে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল। না না—নট মিসেস গুপ্তা—দ্যাট্ বীচ বেবি—হিজ্ রিয়েল লাভার। ডাক্তার তার ওই ভরা-যৌবনের মেয়ে কুকুরটাকে নিয়ে কতভাবে আদর করে যদি জানতে।

বেবি ডাক্তারের প্রিয় কুকুর সবাই জানে। বেশ সুন্দর ব্যাশ হাউণ্ড। কুকুরটাকে তার চেম্বারেও প্রায়ই দেখি। ...ক্লাবে একদিন মালা গুপ্তাও খুব হেসে হেসে গল্প করছিল, বেবির জন্য ডাক্তারের কোনো মেটই পছন্দ হচ্ছে না, ওর নিজের মতো একটা ভদ্র বিনয়ী মেট খুঁজছে বোধ হয়।

...শুনে মেয়েরা সকলেই হাসছিল। তির্যক চোখে কেউ কেউ মালা গুপ্তার মুখখানা দেখছিল। ভাবখানা এই, মেট হিসেব ডাক্তার কি-রকম ভদ্র আর বিনয়ী সেটা মালা গুপ্তার থেকে বেশি কে জানে।

আপাতত মালা গুপ্তার ওপরেই আমি ভীষণ বিরক্ত। মায়ের স্বাস্থ্যের খবর জেনেও সাত সকালে ফোন করে বন-ফায়ারে চিহ্ন-কাটা আমাদের নামের পাথর না পাওয়ার কথাটা সবিস্তারে জানিয়েছে। যেন আমাদের মা-মেয়ের জন্য কত উদ্‌বেগ তার। তক্ষুনি তাকে কাছে পেলে দু'কথা শোনাতাম। এখনো কোনো রসিকতার মুড নয় আমার। ওকে ডেকে ডাক্তার সায়েব ঘাবড়াবার কথা বলতে গেল কেন ভেবে পেলাম না। জিগ্যেস করলাম, ডাক্তার অরুণলাল তোমাকে কি বলেছে ?

—ডেকে কিছু সৎ উপদেশ দিয়েছে। বলেছে, আমার শাশুড়ী নার্ভাস টেনশনের মানুষ...তার নাম করে বন-ফায়ারে পাথর ফেলার সময় আমার বাধা দেওয়া উচিত ছিল, পরেও দেওকী নারাঙকে বলে ওই পাথর বার করা উচিত ছিল। এখন আমারই উচিত মাদারকে গিয়ে বলা এ-সব কিছু নয়—আর কারো বলার থেকে আমি বললে মাদার বেশি বল ভরসা পাবে। আর তার বেবিও ঘেউ ঘেউ করে আমাকে বার কয়েক ধমকালে।

ডাক্তারের ওপর বিরক্তি গেল। মায়ের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে সে যুক্তর কথাই বলেছে। শুনে জেরির মনোভাব বোঝার জন্য জিগ্যেস করলাম, তুমি কি

কারণে—মা কে বলবে যে সব ওই বাজে লোকটার ভাঁওতাবাজী ইচ্ছে করেই সে আমাদের নামের পাথর খুঁজে বার করেনি ?

—তা নয়...খুঁজেছি তো আমরাও, পাথর ফেলার আগেই কিছু একটা কারসাজি করে থাকতে পারে, বেশি নেশা-টেশার ঘোরে ধরতে পারিনি। ওর চেলারা অবশ্য বিশ্বাস করে প্রেতআত্মারাই পাথর সরিয়েছে। যাকগে, মাদারকে যা বলার আমি বলব, নেমন্তন্ন পেয়ে কত লোকই তো যায়নি, সে জন্যে সক্কলেরই পরমায়ু ধরে টান পড়বে নাকি ?

মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হল। এ শুনলেও মা একটু মনে জোর পাবে। কিন্তু জেরির প্রশ্রয়েই ওই অশিক্ষিত বাজে গুণীনের (ভুড়ু না হাতি) এত স্পর্ধা মনে হতেই আবার রাগ হয়ে গেল। যে-রকম ঠাণ্ডা গলা শুনলে আর ঠাণ্ডা চাউনি দেখলে ওর একটু টনক নড়ে সে-রকম করেই তাকালাম আর বললাম, আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা না পেয়ে মায়ের কাছ থেকে তুমি সাত হাজার আদায় করে নিয়ে গেছ ?

জেরি ফস করে বলে বসল, মাদারের এই একটা রোগ, নিজেই আমাকে সাবধান করলে মেয়ে যেন না জানে ওদিকে নিজেই বলে বসে থাকল। সাত হাজার না নিলে কি হত—আমার ধার আরো বাড়ত—এতেই দু'হাজার টাকার ওপর ধার হয়ে গেছে। ...এ টাকাটা দিতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে আমার অ্যালাওয়েন্স থেকেই আগাম দিয়ে দাও, পরে কেটে নিও।

আমি কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে আছি।

—এটা রাগের কথা কি হল ? যেমন হাসে তেমনি হাসছে।

—আমি তোমার অ্যালাওয়েন্স বন্ধ করে দেব।

—ও বাবা, থাক তাহলে, আগাম চাই না।

—আমি ঠাট্টা করছি না ! আমার গলা দিয়ে চোখ দিয়ে আগুনই ছুটছে। কিন্তু স্বর চড়ছে না, চোখেও পলক পড়ছে না। —খুব ভালো করে জেনে রাখো তোমাদের এ ইতরামো আমি আর সহ্য করব না ! তোমার আর একটু বাড়াবাড়ি দেখলে আমি বরাবরকার মতোই ফয়েসলা করব। আর তোমার ওই দেওকী নারাঙকে আজই জানিয়ে এসো সে যেন কোর্টে তার জাদুর খেলা দেখায়, মেন্টাল অ্যাগনির কারণ ঘটাচ্ছে বলে তার নামে আমি কেস আনব—থানায় খবর দিয়ে তোমাদের জুয়া আর ইতর নেশার আড্ডা আমি ভেঙে ছাড়ব !

জেরির ঠোঁটে হাসি। চোখে হাসি। কিন্তু আবার হঠাৎ আমি কি দেখলাম ! ওই হাসির তলায় আবার চকচকে ছুরির ফলা দেখলাম। নাকি এ আমারই কল্পনা ?

মা-কে নিয়েই মুশকিল। একটু সুস্থ হয়েই রামদেও মাহাতোর ডেরায় ছুটেছে। তার বদ্ধ বিশ্বাস পাথর না পাওয়ার পিছনে দেওকী নাবাঙের কিছু অঘটন ঘটানোর মতলব আছেই। অ্যানজেলার দোষ নেই, মা ডাকলে ও সঙ্গে না গিয়ে পারে কি করে। রামদেও মাহাতো নাকি রাগে কাঁপছিল। মাথার চুল ছিঁড়ে আগুনে ফেলেছে আর শত্রুর ধ্বংসের মন্ত্র আউড়েছে। রাগ হতেই পারে। কারণ পাথর না পাওয়ার তিনজনের মধ্যে ওর



নামও আছে। মা-কে সে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছে। বলেছে, মানুষের ভালো করতে করতে এখন সে বুড়ো হয়ে গেছে, সে মরতে ভয় পায় না। মেমসাহেব আর ছোট মেমসাহেবের জন্য তার জান কবুল। দেওকী নারাঙ এমন কি জেরিসাহেবও যদি তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসে তাহলে দুজনেই খতম হবে—তাদের একজনও জিন্দা থাকবে না।

মায়ের ওপরেই রাগ হয়ে গেছে। বলেছি, এবারে তুমি খুব নিশ্চিন্ত তো ? আর তোমার ব্লাডপ্রেসার চড়বে না বা অরুণলালকে ঘনঘন ডাকতে হবে না তো ?

কাজের চাপ তার ওপর এ-সব কারণের জন্য প্রায় দু' সপ্তাহ ঘাটশীলায় যেতে পারিনি। ক্লাবেও না। কিন্তু ততদিনে আমাদের নামের পাথর না পাওয়া এখানেও বেশ রটে গেছে দেখলাম। মালা গুপ্তা বলে থাকবে আর গুজবেরও ডানা আছে। এরপর দেখা হতে অনেকেই মায়ের আর আমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছে। কেউ কেউ দরদ দেখিয়ে বলেছে, এতদিন দেখা নেই কেন—ঘাবড়ে গেছ নাকি ? আজকের দিনে এ-সবেও কেউ বিশ্বাস করে ?

মেজাজ গরম করে দোকানে এসেছি। যাবার সময় মা-কে নিয়ে যাব কথা ছিল। এসে দেখি মায়ের মুখ আবার কাগজের মতো সাদা। বৃন্দাও পুতুলের মতো বসে আছে। মায়ের এ মূর্তি আমি চিনি। তাকালেই মানসিক ধকল বোঝা যায়। কিন্তু বৃন্দার কি হতে পারে ? কাজ ছেড়ে ও তো পাঁচ মিনিটও চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। বিভ্রান্ত মুখ, বিভ্রান্ত চাউনি।

ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ?

আত্মস্থ একটু। জবাব না দিয়ে মায়ের দিকে তাকালো।

ড্রয়ার খুলে মা একটা খাম বার করে নিঃশব্দে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। কিছু না বুঝে আগে খামটা উল্টেপাল্টে দেখলাম। ওপরে টাইপ করা মায়ের নাম, নিচে দোকানের ঠিকানা। ছাপ দেখলাম, জামসেদপুর থেকে এটা এসেছে। বিকেলের ডাকে এসে থাকবে।

খাম থেকে চিঠি বার করে আমিও হতভম্ব। পরিষ্কার বাংলায় লেখা ছোট চিঠি একটা। পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা।

'—সবিনয় নিবেদন, জেরি রুবিন সম্পর্কে সাবধান। তারজন্য আপনার এবং আপনার মেয়ের জীবন বিপন্ন। আপনারা দু'জন তার স্বার্থের প্রধান অন্তরায়। তার সংকল্প মারাত্মক। পত্রলেখক আপনাদের হিতৈষী। অবিশ্বাস করবেন না এবং যথাসম্ভব সাবধানে থাকবেন।—জনৈক শুভার্থী।'

দু'বার তিনবার চার বার পড়লাম চিঠিটা। তার মধ্যেই বুঝতে চেষ্টা করছি বাংলায় এমন চিঠি কে লিখতে পারে। যে লিখেছে সে খুব ভালো করেই জানে মা বাংলা লিখতে বা পড়তে জানে না। আমি জানি। তাই এমন চিঠি মায়ের হাত থেকে আমার হাতে যাবে এটাই উদ্দেশ্য। তাহলে মা-কে না লিখে সোজা আমাকে লিখল না কেন ?

বৃন্দার দিকে তাকালাম।—এ চিঠি তুমি মা-কে পড়ে দিয়েছ ?

ও মাথা নাড়ল, তাই।

ইচ্ছে করল ওর গালে কষে একটা চড় বসিয়ে দিই। মায়ের শরীরের খবর রাখো না ? পড়ে এ-সব ছাইপাঁশ, তাঁর মাথায় ঢোকানোর আগে বুদ্ধি করে আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারলে না ?

বকুনিটা বাংলায় হলেও মায়ের বুঝতে বাকি থাকল না। বিড়বিড় করে বলল, আমি জানতে চাইলে ও আমাকে মিথ্যে বলবে ? ওর মুখ দেখেই বুঝেছিলাম চিঠিতে খারাপ কিছু আছে —তাই প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ ওর কাছ থেকে শুনে নিয়েছি।

চকিতে কি মনে হল আমার। বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কেউ জেরির সঙ্গে আমাদের শত্রুতাই চাইছে। কোনো শুভার্থী এমন চিঠি লিখতে পারে না। বৃন্দার দিকে তাকালাম।—কাগজ কলম নাও, এ চিঠির একটা কপি রাখা দরকার—আমি বলি তুমি লেখো।

আস্তে আস্তে বলে গেলাম। ও লিখতে লাগল। আমি চিঠি পড়তে পড়তে তীক্ষ্ন চোখে ওকেই লক্ষ্য করছি।···এই টিকলিতে একমাত্র বৃন্দা ছাড়া আর কেউ বাংলা লিখতে বা পড়তে জানে না। যদিও মনে হয় না, কারণ জামসেদপুরে ও গেল কখন যে সেখান থেকে এই চিঠি পোস্ট করবে। তবু যাচাই করে নেওয়া ভালো।

বাংলোয় এসে দুটো চিঠি ভালো করে মিলিয়ে নিলাম। হাতের লেখায় এতটুকু মিল তো নেই-ই। তাছাড়া বৃন্দার বিচ্ছিরি হাতের লেখার কপিতে চারটে বানান ভুল। 'স্বার্থ', 'হিতৈষী', 'মারাত্মক' আর 'শুভার্থী' বানান লিখেছে 'সার্থ', 'হিতৈষি', 'মারাত্যক' আর 'শুভার্থি'।

দুটো চিঠিই সামনে রেখে ভাবছি। বারান্দার সামনে সাইকেল রিকশ এসে দাঁড়ালো। রিকশ থেকে ডাক্তার অরুণলাল ব্যাগ হাতে নামল। তক্ষুনি বুঝলাম মা এরই মধ্যে ফোনে তাকে তলব করেছে। আমি আছি জানলে ডাক্তার আগে আমার সঙ্গে কথা বলে মায়ের উঠোন পেরিয়ে মা-কে দেখতে যায়। বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করল, এই রাতে আবার কি সাংঘাতিক ব্যাপার হল যে জোর তলব ?

আমি না বললেও মা বলবে। তাছাড়া পরামর্শের ব্যাপারে এই ভদ্রলোককে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তবু আগে সতর্ক করে নিলাম।—আপনার মুখ থেকে মালা গুপ্তা বা আর কেউ কিছু শুনবে না এটুকু বিশ্বাস করতে পারি বোধহয় ?

অরুণলাল শুনেই মর্মাহত। কয়েক পলক মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিল, মিসেস গুপ্তা আমার খুব শ্রদ্ধার পাত্রী নন, তবু বিশ্বাস না হলে বলবেন না।

আর দ্বিধা না রেখে উড়ো চিঠিটা দেখিয়ে ভিতরে কি আছে অক্ষর ধরে ধরে হিন্দীতে বললাম। এর সঙ্গে ইংরেজি থেকে হিন্দীতেই বেশি কথাবার্তা হয় আমার। মা বৃন্দার মারফৎ এটা আগেই পড়িয়ে নিয়েছে তা-ও বললাম।

চুপ খানিকক্ষণ। দ্বিতীয় চিঠিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কি ?



—এটা কপি। টিকলিতে বৃন্দাই একমাত্র লোক যে বাংলা লিখতে পড়তে জানে। হাতের লেখা যাচাই করার জন্য ওকে কপি করতে বলেছিলাম।

ডাক্তার খামটা তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল। আমি বললাম, এখানকার বা ঘাটশীলার যে-কোনো লোক ওটা জামসেদপুর থেকে পোস্ট করতে পারে—যে পাঠিয়েছে সে জামসেদপুরের লোক কক্ষনো নয়। কিন্তু মায়ের নামে লিখেছে···অথচ বাংলায় কেন ?

যে পাঠিয়েছে সে হয়তো ভেবেছে আপনার মা এটা আপনাকে দিয়ে পড়িয়ে নেবেন, বৃন্দা পড়ে দিতে পারে হয়তো তার মনে হয়নি।

ঠিক তাই। তাহলে সোজা আমাকে না লিখে মা-কে কেন ?

ডাক্তারও কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না।

মায়ের বদ্ধ ধারণা, আমাদের কোনো শুভার্থীই এই চিঠি পাঠিয়ে সাবধান করেছে। প্রাণের ভয় সকলেরই আছে, তাই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না গিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। তাঁর মতে চিঠিটা তক্ষুনি পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত।

আমার যুক্তি এবং বিশ্বাস, জেরির কোনো শত্রুর কাজ এটা। এ চিঠি পেলে আমরা তাকে সন্দেহ করব, অবিশ্বাস করব—এমনকি আগে থাকতে উইল করেও তাকে ব্যবসার মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে রাখতে পারি। রাখা-মোসাবানী থেকে টিকলির সাঁওতাল পল্লী পর্যন্ত তার শত্রুর অভাব নেই। আমার যুক্তি শুনে মা রাগে দিশেহারা। চেঁচিয়ে বলে উঠল, ও এখনো জেরিকে বিশ্বাস করতে চায়, এর পরেও ওই সাপকে নিয়ে ঘর করতে চায়—বুঝলে ?

ডাক্তার চুপ। গম্ভীর।

আমিও রেগে গিয়ে মা-কে বললাম, তাহলে তুমিও বোঝো, একটা উড়ো চিঠি পেয়েই তুমি যদি মাথা কাটতে চাও—জেরির কোনো শত্রু থাকলে সে এই সহজ রাস্তাটা নেবে না কেন ?

উত্তেজনায় মা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, জামসেদপুরের যে বাঙালি ছেলেটা তোকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে এই শয়তানি করেনি তো ?

মায়ের মাথায় সম্ভব অসম্ভব সব-কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে। বললাম, না, তার হাতের লেখা এখনো দেখলেই চিনতে পারব—তাছাড়া তাকে ছেড়ে আসার পাঁচ বছর পরে সে এই কাণ্ড করবে ?

—তাহলে আমরা যাতে ভয় পাই সে-জন্যে ও-ছোঁড়াই এ-কাজ করিয়েছে—আমার মত লোককেও এতবড় ভুলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল—জেরি রুবিনের অসাধ্য কিছু আছে ? নিজে বাংলা পড়তে পারে বলতেও পারে—কোনো বাঙালি বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়েছে। ও ধরেই নিয়েছে তুই ওকে ডিভোর্স করবি না—চিঠি দেখে ভয় পেয়ে আমি ওর টাকা বাড়িয়ে দেব।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মা তুমি আর কত মাথা খারাপ করবে ? এইসব আবোল-তাবোল বলার জন্য তুমি ডাক্তারকে ফোনে ডেকে পাঠিয়েছ ?

মা ধুপ করে চৌকিতে বসে পড়ল।—কেন, এ হতে পারে না ?

—না না পারে না ! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল দেবে ও এত বোকা নয় !

—ওকে বোকা কে বলেছে, ও সাপ ! তাহলে ধরে নিতে হবে, কোনো বন্ধুই আমাদের সাবধান করেছে। তাহলে এ-চিঠি নিয়ে এক্ষুনি থানায় যাওয়া উচিত। লাল, তুমি এমন চুপ মেরে আছ কেন ? কিছু বলছ না কেন ?

—বলছি। আপনি আগে শুয়ে পড়ুন।

মায়ের বাইরে রাগ। ভিতরে অসহায়। শুয়েই পড়ল।

—এবারে চোখ বুজুন। তারপর হাত-পা একেবারে ছেড়ে দিন।

মা রাগ করেই চোখ বুজল। হাত-পাও একটু শিথিল করল।

—এবারে ভাবুন, আপনি যা ভয় করছেন ঠিক তাই হল। কি হল বলুন ?

—জেরি আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলল।

—বেশ। তারপর কি হল ?

—এই ব্যবসা লুটেপুটে খাচ্ছে, খোলামকুচির মতো টাকা ওড়াচ্ছে !

—আপনি তো মরে গেছেন, এটা দেখছেন কি করে ?

মা রাগ করে চোখ মেলে তাকালো। কিন্তু মুখে হাসিও এসে গেল।—তুমি কি আমাকে পাগল পেয়েছ ?

আমি লক্ষ্য করছি, এটুকুতেই মায়ের টান-ধরা স্নায়ু একটু শিথিল হয়েছে। ডাক্তারের সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের প্রশংসা আগেও শোনা ছিল।

ডাক্তারও হাসছে অল্প অল্প।—আচ্ছা, এবারে বলুন, জেরি রুবিনের যদি আপনাদের বড় কিছু ক্ষতি করার মতলবই থাকে, তাহলে এই চিঠিটা পেয়ে উপকার হল না অপকার হল।

···উপকারই হল।

—কেন ?

—যতটা সম্ভব সাবধান হতে পারব।

—তাহলে আপনি এটা অপকারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? এ-রকম উত্তেজিত হয়ে পড়লে সাবধান কি করে হবেন ?··· আমার মতে এ-চিঠি থানায় নিয়ে গেলে উল্টে তাকেই বরং সাবধান হবার সুযোগ দেওয়া হবে, তার থেকে নিজেরাই একটু সতর্ক থাকুন। ব্যস, আজ আর এ নিয়ে কোনো কথা নয়।

ডাক্তার এগিয়ে এসে মায়ের পালস্ দেখল, বুক পরীক্ষা করল, খাওয়ার পর ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এলো। তার সাইকেল রিকশা আমার বাংলোর সামনে। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি মনে হয় এ-চিঠির কোনো ইমপরট্যানস দেবার দরকার আছে ?



—দিলে ক্ষতি নেই। এ-চিঠি পাঠিয়ে কেউ যদি জেরি রুবিনের ক্ষতি করতে চেয়ে থাকে আপনার নিশ্চয় সেটাও কাম্য নয়। আবার এ-চিঠির মধ্যে যদি কিছুমাত্র সত্যি থেকে থাকে সেটা আপনার পক্ষেই সব থেকে আগে বোঝা সহজ···একটু ওয়াচ রাখলে কোনো ব্যতিক্রম আপনার চোখেই আগে ধরা পড়া স্বাভাবিক কারণ, আপনিই তাকে সব থেকে ভালো চেনেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে একটা চিন্তা মাথায় হঠাৎ মুগুরের মতো ঘা বসালো।···ব্যতিক্রম কিছু চোখে পড়েছে বইকি। একবার নয়, দু'দিন দু'বার চোখে পড়েছে। জেরির ঠোঁটের হাসি চিনি। চোখের হাসি চিনি। কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ অচেনা কিছু দেখেছি।···ওই হাসির তলায় চকচকে ছুরির ফলার মতো কিছু দেখেছি।···হ্যালুইন নাইটের জন্য পাঁচ হাজার টাকা চয়ে পায়নি—সেদিন দেখেছি।···অ্যালাওয়েন্স বন্ধ করে দেব, দেওকী নারাঙের নামে কেস করব, আর থানায় খবর দিয়ে ওদের জুয়া আর ইতর নেশার আড্ডা ভাঙব বলে শাসিয়েছিলাম—সেদিনও দেখেছি।

···ভুল নয়, কল্পনা নয়, মারাত্মক কিছু ব্যতিক্রমই আমার চোখে পড়েছে। চোখে পাতায় এক করতে পারছি না। একটা উষ্ণ স্রোত পা থেকে মাথায়, মাথা থেকে পায়ে ওঠা-নামা করছে। ডাক্তারের আরো একটা কথা মনে পড়ল। আমার আর মায়ের নামেতে পাথর খুঁজে না পাওয়ার প্রসঙ্গে বলেছিল, ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে নয় প্রমাণ করার জন্য দেওকী নারাঙ যে তৎপর হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়। এই তৎপরতার সঙ্গে জেরির যোগসাজস থাকাও অসম্ভব কিছু নয়। রাত বাড়ছে। কিন্তু মাথা থেকে ভাবনার জট ছাড়াতে পারছি না।

রাত কত জানি না। বিছানায় শুয়ে শুয়েই বিষম চমকে উঠলাম। জেরির মোটর বাইকের শব্দ।···বারান্দায় উঠল। বন্ধ ঘরের তালা খুলল। আমিও উঠে এই ঘরের দরজা খুলে বেরুবো ? ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো ?···ঠোঁটে হাসি চোখে হাসি সত্ত্বেও দু'দুবার যা দেখেছি···সেই ছুরির ফলার মতো আবারও কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখব ?

মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইলাম।

পরের তিনটে দিন ঠিক একইভাবে কাটল। রাতে কখন আসে টের পাই। একটা হিম স্রোত মাথা থেকে পা বেয়ে নামতে থাকে। মনে হয় কোনো হিংস্র খুনী সময়ের প্রতীক্ষায় থাবা চাটছে।···সকালে চায়ের টেবিলে দেখা হয়। ওই মুখ ওই দেহ ফালা ফালা করে দেখে নিতে ইচ্ছে করে। সুন্দর মুখে অতিরিক্ত নেশার ছাপ শুধু চোখে পড়ে। নেশা বেড়েই চলেছে বোঝা যায়। কিন্তু সেজন্যে আর যেন আমার আপত্তি নেই, বিরক্তি নেই। সেদিন ঢুলুঢুলু চাউনি আমার মুখের ওপর স্থির একটু। গলার স্বর টানা-টানা, নরম।—তোমার কি হয়েছে ?

ভিতরে ভিতরে আমি সচকিত। বাইরে ঠাণ্ডা।—তোমার মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে ?

···ঠোঁটে হাসি। চোখেও। কিন্তু আর কিছু না। চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বার

দুই তিন মাথা নাড়ল। তেমনি হেসে হেসে টেনে টেনে বলল, মনে হচ্ছে।...মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো কিছু একটা সুযোগ খুঁজছ।

সত্যি কি ? চিঠির খবর নিশ্চয় রাখে না। কিন্তু ওর মতলব যদি কিছু থাকে, ভিতরে ভিতরে তার জন্য আমিও যে তৈরি সেটা বুঝতে পারছে ? চেষ্টা করে হাসলাম আমিও।—এ-রকম মনে হচ্ছে কেন, নিজের ছায়া দেখছ না তো ?

হাসছি বটে, কিন্তু সব ক'টা স্নায়ু সজাগ তীক্ষ্ণ আমার।...না, নেশার ছাপ ফুঁড়ে কিছুই দেখতে পেলাম না।

...একেবারে ভিন্ন মানুষের ব্যতিক্রম দেখলাম সেই রাতে। রুক্ষ মেজাজে বাংলোয় ফিরেছি। রাগ বৃন্দার ওপর। কিছুটা মায়ের ওপরেও। ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম, বৃন্দার খুব একটা কাজে মন নেই। হিসেবে ভুল করে। খদ্দেরের ক্যাশমেমো লিখতেও ভুল করে। সন্দেহ হচ্ছে রাতে ও নেশা-টেশা করে। ওই সকালে মনবাহাদুর আমাকে চুপিচুপি জানিয়েছে, বৃন্দাবাবু রাত দশটার পর বেরিয়ে তিনটের সময় ফিরেছে। আরো একদিন নাকি তাকে বেশি রাতে এসে বাইরে থেকে অফিস ঘরের তালা খুলতে দেখেছে। কখন বেরিয়েছিল টের পায়নি বলেই সে-কথা ছোট মেমসাহেবকে বলেনি। গত রাতে মনবাহাদুর বেরুবার সময়ও টের পেয়েছে, ফেরার সময়ও। শুনেই আমার মাথায় আগুন জ্বলল। বৃন্দার উসকো খুসকো মূর্তি দেখে রাগে ফেটেই পড়লাম। সব থেকে বিশ্বস্ত মানুষ যদি এই করে তাহলে কোন দিকে তাকাবো। ওকে ডেকে তুলো-ধুনো করতে চাইলাম। কাজের গাফিলতির কথা বললাম। আর কোনোদিন এতটুকু বেচাল দেখলে ওকে দূর-দূর করে তাড়াবো বলে শাসালাম। আমি এত কঠিন হতে পারি ও ভাবেনি বোধহয়। মা এ-সব কিছুই জানে না। জানলে ওকে তক্ষুনি তাড়াতে চাইত। লাঞ্চের পর ফিরে দেখি বৃন্দা নেই। ভাবলাম ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে গেছে। খানিক বাদে মা নিজে থেকেই বলল, বৃন্দা আট-দশ দিনের ছুটির জন্য ধরে পড়েছিল, তার কলকাতায় না গেলেই নয়, তার বিশেষ দরকার—

আমি হাঁ খানিকক্ষণ। ও এতবড় শয়তান ভাবিনি।—তুমি ছুটি দিয়ে দিলে ? আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলে না ?

—কি করব, আজকের গাড়িতেই রওনা হবে বলল।...চাকরির জন্য কটা ছেলেই তো ঘোরাঘুরি করছে, দেখেশুনে একজনকে রাখতে হবে....এমনিতেই আর একজন ছাড়া চলছিল না—।

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই আমি পিছনের খুপরিতে গিয়ে সিন্দুক খুললাম। কারণ আমার মনে অন্য ডাক দিয়েছে। সিন্দুক খুলেই মনে হল টাকা কম আছে। সকালে আরো বেশি টাকা দেখে গেছলাম।

—মা !

মা উঠে এলো।

—বৃন্দা কখন গেছে ? তাকে আজ ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিলে ?



—আজ আর কখন পাঠালাম, দেড়টার মধ্যেই তো ও টাকা নিয়ে কলকাতা রওনা হয়ে গেল।

—টাকা নিয়ে ?

—হ্যাঁ, সাত হাজার টাকা আগাম চেয়েছিল, আমি বকা-ঝকা করে চার হাজার টাকা দিয়ে বিদেয় করেছি।

—বেশ করেছ ! চমৎকার কাজ করেছ ! এই চার হাজার টাকাই জলে গেল—বুঝলে ? আর সে কোনদিন এখানে ফিরে আসছে না—বুঝলে ?

মা হতভম্ব খানিকক্ষণ।—কি যে বলিস তার ঠিক নেই, তুই ওকে এত ভালবাসিস আর ও ছোঁড়াটাও তোর এত ভক্ত—চার হাজার টাকা নিয়ে সে সরে পড়বে ? আমার সঙ্গে কথা হয়েছে, প্রত্যেক মাসের মাইনে থেকে চারশ করে কাটব...

মায়ের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। সেই পাথর খুঁজে না পাওয়ার পর থেকে আর ওই বে-নামী চিঠি পাওয়ার পর থেকে তারও কাজে-কর্মে মন নেই। নইলে কোনো কর্মচারী ছুটি চাইলে বা কেউ আগাম টাকা চাইলে তারই মেজাজ সব থেকে বেশি তিরিক্ষি হয়। আর এখন কিনা আমার জন্যে অপেক্ষা না করেই বৃন্দাকে ছুটি দিয়ে দিল, সেই সঙ্গে চার হাজার টাকা পর্যন্ত আগাম দিল !

রাত ন'টার পরে বাড়ি ফিরেও বৃন্দার শয়তানির কথাই ভাবছিলাম। সাড়ে ন'টায় খেতে বসেছি। হঠাৎ সচকিত। জেরির মোটর বাইকের ভট্‌ভট্ শব্দ। এ ক'দিন রাত দুটো আড়াইটের আগে ও শব্দ কানে আসেনি। আমি উদগ্রীব, উৎকর্ণ। স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে উঠছে টের পাচ্ছি।

জেরি হাসিমুখে খাবার ঘরে চলে এলো। দুষ্টু মিষ্টি কাঁচা হাসি। একবেলার মধ্যে আগের মতো অদ্ভুত ভদ্র। চেয়ার টেনে বসে হাঁক দিল, অ্যানজেলা— !

হন্তদন্ত হয়ে এসে অ্যানজেলা তার খাবার সাজিয়ে দিল। দিয়েই চটপট সরে পড়ল।

সেই সকাল থেকে ভিতরটা তিক্ত হয়ে ছিল। একটু আগে পর্যন্ত মাথার মধ্যে দোকান ঘুরছিল আর বৃন্দা ঘুরছিল। এই মুহূর্তে আমার সমস্ত সত্তা সজাগ। স্নায়ু সজাগ। সেই সঙ্গে খুব সহজ থাকার চেষ্টা।

আমি খাচ্ছি। ওকে দেখছি।

জেরি খাচ্ছে। আমাকে দেখছে। হাসছে। ঠোঁটের হাসি আর চোখের হাসি মিলেমিশে একাকার। বাসনা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে।...পাঁচ বছর আগে প্রথম লাইসেন্স পেয়ে ফেরার সময় গাড়িতে যেমন দেখেছিলাম। গোরুমহিষাণির সেই ডাক বাংলোতে যেমন দেখেছিলাম। বিয়ের রাতে যেমন দেখেছিলাম।

—কি মতলব ? জুয়ার আড্ডা আর নেশার আড্ডা ছেড়ে এ সময়ে যে ?

—মতলব ভালো। তাই আজ জুয়া নেশা দুই-ই বাতিল। সকালে তোমার মুখখানা দেখে যাবার পর থেকে সারাক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে ডাকছ।

অ্যানজেলা আমাকে বলে রেখেছিল জেরি সাহেব সেই সকালে বেরিয়ে দুপুরে খেতে

আসেনি। এই ফিরল। কিন্তু দেখেই বুঝতে পারি সমস্ত দিনে কোনো নেশার জিনিস ছোঁয়নি। এমন তাজা ওকে শিগগীর দেখিনি।...এই রাতে আমি মৃত্যুর গভীরে হারিয়ে যাব না জীবনের জোয়ারে ভেসে যাব ? চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়লাম।—আজ আমি তোমাকে একবারও ডাকিনি।

জবাব দিল না। হাসছে। হাসছে আর খাচ্ছে। খাচ্ছে আর হাসছে।

আমার আগে হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জেরিও খাওয়া ফেলে জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি সোজা শোবার ঘরে। পিছনে জেরি।...গত দু'বছরের মধ্যে অন্তত ও নিজের ইচ্ছেয় একটা রাত-ও এ-ঘরে ঢোকেনি। আমার ইচ্ছেয় এসেছে। আজ ব্যতিক্রম। এই রাতটা ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম কতটা ভয়ংকর আমাকে দেখতে হবে। আমাকে বুঝতে হবে। এই বাংলোর এই ঘরে বসে ও কিছু করে বসবে এত বোকা নয়। কিন্তু এই রাতটা এত বড় ব্যতিক্রম...হয়তো কিছু দেখে নিতে বা বুঝে নিতে পারব। দুর্জয় সাহসে ভর করে স্থির চোখে তাকালাম। বেশ জোরের সঙ্গে বললাম, এ-ঘরে কেন, আজ আমি তোমাকে ডাকিনি বললাম যে ?

যা আশা করেছিলাম তাই করল। দরজা বন্ধ করে করে ছিটকিনি তুলে দিল। নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরাট।—ডেকেছ। কত ডেকেছ নিজেও জানো না—নইলে এ-রকম হল কেন ?

—কি হল ?

ঠোঁট দিয়ে দাঁত দিয়ে নাক দিয়ে সমস্ত মুখ দিয়ে হাসি গলে গলে পড়ছে।—ভোগী আত্মারা সেই সকাল থেকে আমার ওপর ভর করে আছে। আমাকে কো[illegible] নেশার দিকে যেতে দেয়নি, জুয়ার দিকে যেতে দেয়নি। তোমার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তোমার কাছে ঠেলে পাঠিয়েছে।

বুকে টেনে নিল। অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল। যতটা যুঝলে ওর বাসনায় আগুন ধরে ততোটাই যুঝতে চেষ্টা করলাম। ও আমার গায়ের জামাটা টেনে ছিঁড়ল।...গোড়ার একটা বছর অনেক জামা ছিঁড়েছে।

জেরি রুবিন জাদু জানে কিনা জানি না। ভোগের আত্মারা সত্যি ওর ওপর ভর করে কিনা জানি না।...শয্যার এই অতি চেনা মানুষ অজস্র বার নতুন হয়ে এসেছে। ভোগের নতুন নতুন ঝংকার তুলেছে। আজকের এই জেরিও সম্পূর্ণ নতুন। প্রায় অসহ্য রকমের নতুন।

...জাদু জানে জেরি রুবিন ? ভোগী আত্মারা আসে তার কাছে ?

পৃথিবী কতক্ষণ বা ক'ঘণ্টা নিশ্চল থেমে ছিল জানি না। এখান থেকে বিস্মৃতির অতল ছুঁয়ে আবার এখানেই ফিরলাম। ঘরের জোরালো আলো তেমনি জ্বলছে। জেরি আমার বাহুর ওপর নিস্পন্দের মতো শুয়ে। জেগে আছে টের পাচ্ছি। তার একটা হাত আমার বুকের ওপর একেবারে স্থির হয়ে পড়ে নেই।...এটাই সময়। এমন প্রশান্তির থেকে আচমকা টেনে তুলতে পারলে হয়তো কিছু দেখতে পাব, কিছু বুঝতেও পারব।



খুব নরম গলায় ডাকলাম, জেরি... !

—হুঁ ? ও তক্ষুনি মাথাটা আমার বুকের ওপর রেখে শুলো। চোখে চোখ। সেই চোখে বিজয়ীর আত্মতুষ্টির হাসি।

আমার এক হাতের পাঁচটা আঙুল ওর ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে চালিয়ে আদর করলাম একটু।—জেরি...তোমার জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে।

—কেন ? দু'চোখ উৎসুক একটু।

ওর ঠোঁট দুটো আমার চিবুক ছুঁয়ে আছে। আবার চোখে চোখ মেলালাম।—দু'দিন ধরে আমার সঙ্গে মায়ের একটা উইল করা নিয়ে কথা হচ্ছে...আমি রাজি হয়েছি।

ঠিকই দেখছি। এবারে বেশ সচকিত। দুই কনুইয়ে ভর করে মাথা তুলল। হাতদুটো আমার বুকের ওপরে।—উইল ! কি উইল ?

—শরীর ভালো যাচ্ছে না মা তাই একটা উইল করে একেবারে রেজিস্ট্রি করে রাখতে চায়।...তার মৃত্যুর পরে এই ব্যবসার সব কিছু একলা আমি পাব...

—সে তো উইল না করলেও শুধু তুমিই পাবে।

—সে কথা না, উইলে লেখা থাকবে আমার মৃত্যুর পর এই ব্যবসার শেষ কপর্দক পর্যন্ত এখানকার চার্চে যাবে।...এত বছর ধরে দেখছি, আমিই তোমাকে বিশ্বাস করি না, মা বিশ্বাস করবে কি করে ?

না, ভুল দেখছি না। ও চেয়ে আছে। ঠোঁটে হাসি, চোখে হাসি। তার তলায় ক্রূর ছুরির ফলা একটা। এই মুহূর্তে মনে হল আমার বুকের ওপর দুটো হাত নয়, দুটো কাঁকড়া বিছে।

—তাই আমার জন্য তোমার দুঃখ হচ্ছে ? অথচ তুমি রাজি হয়েছ ?

হাত নয়, প্রাণপণ চেষ্টায় বুকের ওপর ওই কাঁকড়া বিছে দুটোকে সহ্য করছি। ওই চোখে ঘাতকের চোখ দেখছি। পলকা ধমকের সুরে বললাম, রাজি না হয়ে করব কি, নিজের চরিত্র কি নিজে জানো না ?

—তাহলে তোমার দুঃখ হচ্ছে কেন ?

ভ্রূকুটি করলাম।—কেন দুঃখ হচ্ছে তুমি বুঝছ না ? শোনো, মা দুই একমাসের মধ্যে কিছু করবে না। তার মধ্যে তুমি চরিত্রটা একটু শোধরাতে পারবে—জুয়ার আড্ডা, নেশার আড্ডা ছাড়তে পারবে ?

অকূলপাথারে কূল পেল যেন।—নিশ্চয় পারব, চাইলে একদিনে পারব। কিন্তু তোমার মা দুই এক মাসের মধ্যে কিছু করবে না জানলে কি করে ?

যা মাথায় এলো তাই বলে দিলাম।—আমার কলকাতার জ্যাঠা মানে বাবার বড় ভাই মস্ত আটর্নী, মা ফোন করে জেনেছে সে এখন ফেরেনে, মাস দেড়-দুই বাদে ফিরবে।

—সে ফেরার আগে তোমার মা কিছু করছে না ?

—না।



www.boiRboi.blogspot.com

বুকের ওপর কাঁকড়া বিছে দুটো একটু সময়ের জন্য আড়ষ্ট হয়ে ছিল। ও দুটো আবার নড়ে-চড়ে উঠল। ঠোঁটের হাসি গাল বেয়ে চোখের দিকে ছড়াতে লাগল। তার ফাঁকে ছুরির ফলাটা আর গোপন নেই একটুও। আনন্দে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। মনে হল কাঁকড়া বিছে দুটো হুল বসাবার মতো নরম জায়গা খুঁজছে।

—কিচ্ছু ভেব না, দেড় দু'মাস বিরাট সময়, তার মধ্যে পৃথিবী উল্টে-পাল্টে যেতে পারে—আর একটা মানুষের চরিত্র পাল্টে যেতে পারে না। কথা দিচ্ছি তার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

···যা দেখার দেখা হয়ে গেছে।···যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। এই লোক যত চালাকই হোক, ভুল করেই বসল। একবারও বলল না, আমার থেকে বয়সে সে তিন-চার বছরের বড়, আমার মৃত্যুর আগে তার নিজের মৃত্যুও হতে পারে—তাই আমার পরে মায়ের উইল অনুযায়ী সব-কিছু চার্চের হাতে গেলেই বা অত ভাবনার কি আছে। উল্টে সে ধরেই নিয়েছে তার মৃত্যুর আগে আমার মৃত্যু অবধারিত, সেই জন্যেই উইলের কথা শুনে সচকিত হয়ে উঠেছিল—এখন দেড় দু-মাস সময় পেয়ে সে নিশ্চিন্ত। বলছে, দেড় দু'মাস বিরাট সময়, তার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

···লিলি রুবিন, তুমি খুব স্থির হও, খুব স্থির থাকো। ঘাতকের বাহুলগ্ন হয়ে তুমি কেঁপে কেঁপে উঠো না। ওকে তুমি কিচ্ছু জানতে দিও না, কিচ্ছু বুঝতে দিও না। তুমি যখন সব জেনেছ সব বুঝেছ—এই ঘাতক তোমাকে আর তোমার মা-কে হাতের মুঠোয় পাবে না, পেতে পারে না। যা ভাবার পরে ভেব, এই রাতটা শুধু তুমি স্থির থাকো।

জেরি রুবিনের আবার এক দফা আদরে সোহাগে এই রাত ভোর হয়েছে। ভোরের পাখি ডেকেছে।

পরের দুটো দিন আমি খুব স্থির, খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু ভিতরে সুস্থির থাকব কি করে? মা-কে বললে সে ব্লাড প্রেসার চড়িয়ে হার্টফেল করবে। একমাত্র মানুষ ডাক্তার অরুণলাল। কিন্তু সে চাক বা না চাক তার ওপর দখল নিয়ে বসে আছে আর একজনের বিবাহিতা স্ত্রী।···মালা গুপ্তা। কোনো দুর্বল মুহূর্তে সে যে তার কাছে কিছু ফাঁস করে দেবে না এমন নিশ্চয়তা কোথায়? কেবল একটিমাত্র লোককে বিশ্বাস করা যেত, যে জেরি রুবিনের মতলব বুঝে বে-নামী চিঠি দিয়ে আমাদের সাবধান করেছে। আমাদের মা-মেয়েকে সে নিশ্চয় খুব ভালো চেনে। ঘাটশীলা আর রাখা-মোসাবনীর প্রত্যেকটি চেনা বাঙালির মুখ চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছি—কিন্তু কে ওই চিঠি পাঠাতে পারে কোনো হদিস পাইনি।

···দু'দিনের মধ্যে আগের দিন জেরি সকালে বেরিয়ে রাতে আর ফেরেইনি। তার পরদিন রাতে ফিরেছে। সকালের চায়ের টেবিলে সেই আগের মূর্তি। রাতে নেশায় চুর হয়ে ফিরলে সকালে যেমন দেখায়। চোখাচোখি হতে হেসে-হেসে টেনে-টেনে বলল, কি দেখছ···হাতে তো এখনো ঢের সময়···ছাড়বই যখন দিন-কতক চুটিয়ে নেশা করে নিই, তারপর কত ভালো ছেলে হয়ে যাব তুমি ভাবতেও পারো না।



আমি কি হাসতে চেষ্টা করেছি? জানি না।

চায়ের কাপে বার দুই তিন চুমুক দিয়ে জেরি আবার বলল, ডার্লিং, তুমি আমাকে কত যে ভালোবাসো আমি সেই রাতে বুঝেছি, তাই বলছি আমার ভালো হওয়া অনেকটা তোমার ওপর নির্ভর করছে···আমি একটা প্ল্যানও করে ফেলেছি, এখন তুমি রাজি হলেই হয়।

এই প্ল্যান কি প্ল্যান আমার থেকে ভালো কে আর জানে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উৎসুক।—কি রকম?

হাসছে। ঢুলু ঢুলু চোখে প্রেমের তরঙ্গ।—বিয়ের পর থেকে এ-পর্যন্ত দু'দশ দিনের জন্য আমরা হনিমুনে পর্যন্ত বেরুইনি। চরিত্র বদলাতে হলে এখানকার এই আবহাওয়া থেকে পনের বিশটা দিনের জন্য অন্তত কোথাও চলে যাওয়া দরকার—শুধু তুমি আর আমি যাব, সঙ্গে কোনরকম নেশার জিনিস থাকবে না, এক প্যাকেট সিগারেট পর্যন্ত না। রাজি···?

আমি দারুণ উৎফুল্ল।—নিশ্চয় রাজি। কতদিন মনে হয়েছে তোমাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু নেশা মাথায় উঠলে তুমি আর মানুষ থাকো নাকি?···তাহলে চলো সামনের জানুয়ারিতেই বেরিয়ে পড়া যাক—ব্যবসার সব কিছু ঠিকঠাক করে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়া যাবে। কিন্তু অনেক আগে থেকে টিকিট ফিকিট কেটে রিজারভেশনের ব্যবস্থা করতে হয়, দাঁড়াও, ক্যালেণ্ডারটা নিয়ে আসি—

উৎসাহের চোটে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে এলাম। শোবার ঘর থেকে ক্যালেণ্ডারটা নিলাম। তার মধ্যে বেরুনোর দিন ঠিক করেই ফেলেছি। ক্যালেণ্ডার হাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, আজ ডিসেম্বরের পয়লা, জানুয়ারির পয়লা বেরিয়ে পড়ব—নিউ ইয়ারস্ ডে দু'জনের ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কুপেতে কাটবে। কি বলো?

জেরি হাসছে। মাথা নাড়ছে।—ও কে···।

—তাহলে আজই আমি কাউকে পাঠিয়ে টিকিট বুক করে ফেলি—যাঃ! খুব টিকিট কাটছি—যাব কোথায়?

রাতের মাত্রা-ছাড়ানো নেশার ধকলে মাথা চট করে খোলে না বোধহয়। একটু ভাবতে চেষ্টা করে বলল, তুমিই ঠিক করো।

ইচ্ছে করেই সময় নিলাম একটু।—ঠিক আছে, মধ্যপ্রদেশটা ঘুরি চলো—সেখানে পাহাড় আর জঙ্গলের ছড়াছড়ি—ভাগ্যে থাকলে দু'চারটে ডাকাতের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে—দারুণ হবে না?

এমন জায়গা পছন্দ না হয়ে পারে!—দারুণ···দা-রু-ণ হবে, ইউ আর এ ডার্লিং!

একটা মাসের জন্য নিশ্চিন্ত। এর মধ্যে আমার বা মায়ের পরমায়ু ধরে কেউ টান দেবে না। ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, ডাক্তার অরুণলাল বে-নামী চিঠির ব্যাপারটা জানে যখন তাকেই নিরিবিলিতে ডেকে খোলাখুলি সব বলব। তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা-হয় ঠিক করব।···এত দিনে ওই বিষণ্ণ মানুষটাকে এটুকু অন্তত বুঝেছি মালা গুপ্তা তার কাছে

অবাঞ্ছিত বোঝার মতো হয়ে উঠেছে। নইলে বে-নামী চিঠি পাওয়ার খবর এতদিনে তার কানে উঠত আর ক্লাবের সকলে জানত। তবু আঁতে ঘা দিয়েই সব-কিছু গোপন রাখার পা[illegible] আদায় করতে হবে। কেন যেন মনে হল তা পারবও।

অনেকদিন বাদে এই রাতে বিছানায় গা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো একটানা টেলিফোনের শব্দে।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম শীতের সকাল এখনো আবছা অন্ধকারে। এত সকালে আবার কার ফোন!

উঠে ধরলাম। সাড়া দিতে ও-ধারে ডাক্তার অরুণলালের গলা। তার ভারী গলার প্রত্যেকটা হিন্দী শব্দ আমার কানের পর্দা বুঝি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মগজে বসে যেতে লাগল।—আমি অরুণলাল, বাধ্য হয়ে এ-সময় আপনাকে ডেকে তুলতে হল।...এইমাত্র খবর পেলাম জেরি রুবিন সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট করেছে, ফুল স্পীডে মোটর বাইক চালিয়ে রাস্তার পাশে কোনো গাছের সঙ্গে ধাক্কা মেরেছে...বেঁচে নেই শুনছি। সাঁওতাল পল্লীর দিকে বাঁধানো রাস্তার একজায়গার হদিশ দিয়ে বলল, আমরা এক্ষুনি সেখানে চলে যাচ্ছি, আপনিও চলে আসুন।

ফোন ছেড়ে দিল। আমি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে। স্বপ্ন দেখছি না ঠিক শুনছি?...না এই তো হাতে টেলিফোন। এই তো জোরে শব্দ করে নামিয়ে রাখলাম!

সম্বিত ফিরতে পরনের পোশাক বদলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ি বার করে ছুটলাম। শীতের সকালে তখনো রাতের ঘোর।

...দূর থেকে যাকে দেখে মনের এই অবস্থাতেও অবাক আমি সে মালা গুপ্তা। রাস্তার এক পাশে তারই গাড়ি। মনে পড়ল, ফোনে ডাক্তার বলেছিল, আমরা এক্ষুনি সেখানে চলে যাচ্ছি।...মালা গুপ্তা রাতে তাহলে ডাক্তারের বাংলোতেই ছিল।...যা শুনছি তা সত্যি হলে আমার সমস্যার কথা আর ডাক্তারকে বলার দরকার হবে না।

এত বড় অ্যাকসিডেন্ট শোনার পরেও এমন বীভৎস মৃত্যু দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

...প্রায় বারো-চোদ্দজন লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে আমিও একজন। অরুণলাল রক্তাক্ত দেহটার একটা হাত তুলেই ফেলে দিল। পালস্ দেখারও দরকার নেই। সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

জেরি কাত হয়ে ঘাড় মাথা গুঁজে মাটিতে শুয়ে। কপাল মুখ ফেটে চৌচির। মুখের খাবলা খাবলা মাংস ঝুলে আছে। সমস্ত মুখ আর গায়ের জামায় চাপ চাপ শুকনো রক্ত। ভাঙা তোবড়ানো মোটর বাইক প্রায় দু'খানা হয়ে চার পাঁচ হাত দূরে পড়ে আছে। রাস্তার ধারের অত মোটা গাছের গুঁড়ির অনেকটা উঠে গেছে। ওই সাইকেল আর গাছটা দেখলেই বোঝা যায় কত স্পিডের মাথায় এই অ্যাকসিডেন্ট।

আমরা নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। ডাক্তার ভুরু কুঁচকে ওই দেহের দিকেই চেয়ে আছে। পায়ে পায়ে কাত-হওয়া দেহের পিছন দিকে চলে গেল। মাথার কাছটা ঝুঁকে



দেখল। কিছু না বুঝে পায়ে পায়ে আমি আর মালা গুপ্তাও সেদিকে। আমি আবার শিউরে উঠলাম। বীভৎস...বীভৎস! মাথার পিছন দিকটাও ফেটে দু' ফাঁক হয়ে আছে। ডাক্তার বিড়বিড় করে বলে উঠল, গাছের সঙ্গে মুখোমুখি কলিশন...কিন্তু পিছন দিকটা এ-ভাবে ফাটল কি করে?... আশ্চর্য...এ-রকম হয় কি করে!

আমি আর মালা গুপ্তা হাঁ করে তার দিকে তাকালাম। নিজের অবস্থা জানি না, মালা গুপ্তা হঠাৎ হিস্টিরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে লাগল, দাঁতে-দাঁত লেগে যাচ্ছে। ডাক্তার ধরে না ফেললে পড়েই যেত। আদিবাসী লোকগুলো এবারে আমাদের দেখছে। একরকম জড়িয়ে ধরেই অরুণলাল মালা গুপ্তাকে টেনে এনে আমার গাড়ির পিছনের সীটে শুইয়ে দিল। নিজের অগোচরে আমিও এসেছি। অরুণলাল আমাকে বলল, চালাতে পারবেন তো?

আমি হয়তো মাথা নেড়েছি।

—মিসেস গুপ্তাকে তার বাংলোয় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে হবে...আমি যত তাড়াতাড়ি পারি এদিকের ব্যবস্থা করে ওঁর গাড়ি নিয়ে আসছি—আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই—চলে যান।

মালা গুপ্তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে কখন কিভাবে নিজের বাংলোয় ফিরেছি আমার হুঁশ ছিল না।

জেরির মৃত্যুর পর এক-এক করে আটটা দিন গেল।

মৃত্যুর দু'দিন পরে ঘাটশীলা থেকে হাসপাতালের রিপোর্ট আর পুলিশের ছাড়পত্র পেয়ে ঘাটশীলাতে জেরির দেহ কবরে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার অরুণলালের প্রাথমিক রিপোর্টের সঙ্গে হাসপাতালের রিপোরর্টের তারতম্য কিছু হয়নি। অরুণলাল লিখেছিল, যতদূর মনে হয়, অতিরিক্ত নেশা করে বে... মোটরবাইক চালানোর সময়ে এই অ্যাকসিডেন্ট।

হাসপাতালের পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও একই সিদ্ধান্ত। পাকস্থলীতে কেবল রকমারি নেশার দ্রব্যই পেয়েছে তারা। এত নেশার পর কোনো মানুষের স্নায়ু বা মস্তিষ্ক স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

জেরির দেহ পাবার আগে অরুণলালকে উতলা দেখেছিলাম। এক ফাঁকে আমাকে বলেও রেখেছিল, জেরির মাথার পিছনের ক্ষত খুব স্বাভাবিক লাগছে না...পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে আবার ঝামেলা হয় কিনা দেখুন।

আমার মাথার যা অবস্থা তখন দুয়ে দুয়ে চার যোগ নামানোরও ক্ষমতা নেই। ডাক্তারের কথা দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। ভাবতে চেষ্টা করেও কিছু ভাবতে পারিনি।

জেরিকে কবরস্থ করার সময়েও অরুণলাল আমার পাশে ছিল। কিন্তু তার পর থেকে তার আর পাত্তা নেই। বাড়িতে ফোন করলে রিং হয়ে যায়। চেম্বারে ফোন করলে জবাব পাই, সে নেই। কখন ফিরবে বা কোথায় গেছে তার কম্পাউণ্ডার বলতে পারে

না। ওদিকে ডাক্তারের জন্য মায়ের ঘন ঘন তাগিদ। তার নাকি শরীর অসুস্থ, ডাক্তারকে খুব দরকার। কিন্তু মায়ের মুখ আমার খুব ভালো চেনা। বাইরে অতিরিক্ত গম্ভীর। কিন্তু তার ভেতর থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেছে বোঝা যায়। এত নিশ্চিন্ততার দরুনও ব্লাড প্রেসার বাড়ে কিনা জানা নেই।

…আমার অবস্থা ? জেরি আর নেই। আর কোনো দুঃস্বপ্নও নেই। আমিও নিশ্চিন্ত বইকি। চার দিন বাদেই আবার কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছি। ঘাটশীলা রাখা-মোসাবানীর পরিচিতজনেরা মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়েছে। একদিন মিনিট পনেরর জন্য ক্লাবেও হাজির হয়েছিলাম। আ-হা উঁ-হুঁর সহানুভূতি সেখানেও পেয়েছি। কিন্তু সক্কলের মুখে একই অনুক্ত কথা লেখা—মেয়েটা বাঁচলো।

তাদের চোখে মুখে অভিনন্দনের বদলে শোক জানানোর বিড়ম্বনা।

আমার কেবলই মনে হয়েছে, আমি খুব নিশ্চিন্ত হয়েছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কতটা হারিয়েছি তার হিসেব এখনো বাকি।

গতকাল দোকানে এসে অরুণলালকে তার চেম্বারে ফোন করেছি। এই দিন কম্পাউণ্ডার জানালো জরুরি দরকারে জামসেদপুর গেছে, রাতে ফেরার কথা। মা-কে শুধু জানালাম, সে নেই এখানে। রাতে ফেরার কথা শুনলে রাত দুপুর পর্যন্ত ফোনে তাকে ধরতে চেষ্টা করবে।

পরদিন সকালে মা-কে দোকানে রেখে তাকে কিছু না বলে আমি হেঁটেই ডাক্তারের চেম্বারের দিকে চললাম। পাঁচ ছ'মিনিটের হাঁটা পথ। আমার তাগিদ আর মায়ের তাগিদ এক নয়। জেরি মাটি নেবার পর থেকে কেবলই মনে হয়েছে আমার এখনো কিছু জানতে বুঝতে বাকি। যতবার মনে হয়েছে ততবার ওই ডাক্তারের মুখ সামনে এগিয়ে এসেছে।…জেরির মাথার পিছন দিক পরীক্ষা করে সে বলে উঠেছিল, গাছের সঙ্গে মুখোমুখি কলিশন, কিন্তু পিছন দিকটা এভাবে ফাটল কি করে…কি আশ্চর্য, এ-রকম হয় কি করে !…আর হাসপাতালের পোস্ট মরটেম রিপোর্ট নিয়ে কিছু ঝামেলার আশংকাও করেছিল। কিন্তু কি হতে পারে ? অত বড় অ্যাকসিডেণ্টে মৃত্যু অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু ডাক্তারের মুখে ওই কথা কেন ? পোস্ট মরটেম রিপোর্ট নিয়ে সে উতলাই বা হয়েছিল কেন ? আরো অবাক লাগছে জেরির শেষ কাজ শেষ হবার পরে এক এক করে ছ'টা দিন কেটে গেল, তারপর থেকে এই লোকেরও আর দেখা নেই। বাড়িতেও নেই, চেম্বারেও আসেনি।

তার কম্পাউণ্ডার আমাকে ভালোই চেনে। সে বলল, খানিক আগে ডাক্তার সাহেব তার বাংলো থেকে ফোনে জানিয়েছে, শরীর খারাপ, আজ চেম্বারে আসবে না, কোনো রোগীর বাড়িতেও যাবে না।

রাস্তায় নেমে তক্ষুনি রিকশা নিলাম একটা। সাইকেল রিকশায় ডাক্তারের বাংলোয় যেতে দশ বারো মিনিটের বেশি লাগবে না।

মায়ের কারণে গত ক'বছরে চার পাঁচবার এই বাংলোয় এসেছি। রিকশা বিদায় করে



নিঃশব্দে উঠে এলাম। তার ঘরের সামনে পুরু পর্দা ঝুলছে। সাধারণত কেউ এলে তার বেবি আগে ছুটে আসে, ঘেউ-ঘেউ রব তুলে অভ্যর্থনা জানায় বা আপত্তি জানায়। তারও সাড়াশব্দ নেই। ওই ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে একটা আচমকা ঘা খেয়েই যেন পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

—ইউ আর এ সান অফ এ বীচ ! ইউ স্কাউনড্রেল ! ইউ সান অফ এ বীচ ! আমি তোমাকে জেল খাটাব—জেরির ডেডবডি কবর থেকে তুলিয়ে আবার আমি পোস্ট মরটেম করাব—আমি তোমাকে এমনি ছেড়ে দেব ভেবেছ ?

সামনেই বসার ঘর। সেই দরজার সামনে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘেউ-ঘেউ শব্দ তুলে বেবি দু'বার প্রতিবাদ জানালো মনে হল। তার প্রভুর গলাও কানে এলো।—বেবি ! স্টপ্। তারপর অনুনয়।—মালা, আমার কথা শোনো, প্লীজ—

সঙ্গে সঙ্গে রমণীর গলা থেকে আর এক প্রস্থ আগুনের ঝাপটা। ইউ সান অফ এ বীচ—তোমার কথা শুনব ? কার জন্যে তুমি তোমার রিপোর্টে তোমার সন্দেহের কথা লেখোনি, পুলিশের কাছেও মুখ খোলনি ? লিলি রুবিন তোমাকে ঘুষ দিয়েছে না তার বিছানায় শুতে দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করেছে ? ওরাই ষড়যন্ত্র করে জেরিকে খুন করেছে, আমার জানতে বাকি আছে ? আমি তোমাকে জেল খাটাব স্কাউনড্রেল—ওদেরও কোর্টে দাঁড় করাব—তোমার এখানকার প্র্যাকটিসও আমি ঘুচিয়ে ছাড়ব—এখানকার ঘাটশীলার মোসাবনীর যে-যেখানে আছে সক্কলে জানবে নিজের বউকে খুন করে এখা ন এসে তুমি মস্ত সাধু ডাক্তার হয়ে বসেছ—ইউ সান অফ এ বীচ—আমি সক্কলকে ডেকে ডেকে তোমার সব কথা জানিয়ে দেব—থু—থু—থুঃ !

পরদায় হ্যাঁচকা টান পড়ল। আগুনের গোলার মতো যে বেরিয়ে এলো একটু ঘাড় ফেরালেই বসার ঘরের দরজার সামনে আমাকে তার দেখার কথা। কোনদিকে না তাকিয়ে সে ছুটেই বেরিয়ে গেল। যে গেল সে মালা গুপ্তা কি কোনো উন্মাদিনী ঠাওর করা শক্ত।

আমি তারপরেও খানিকক্ষণ নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে পাশের ঘরের দিকে এগোলাম। আমার না জানলে চলবে না।

পর্দার সামনে আমার পা দুটো আবার থেমে গেল। এ আমি কি শুনছি ! ডাক্তারের গলাই বটে। বাংলায়, একেবারে বাঙালীর মতো পরিষ্কার বাংলায় তার কুকুরের সঙ্গে কথা কইছে।—হ্যাঁ রে বেবি, গাল দিতে হলে বার বার তোদের নাম নিয়ে ওরা গাল দেয় কেন—সান অফ এ বীচ বলে কেন ? ওর মতো পৃথিবীর সমস্ত গুলোকে জড়লেও তোর মতো এত সুন্দর এত ভদ্র একটা বেবি হবে ?

নিজের এই কান দুটোকে বিশ্বাস করব কিনা জানি না।

আমাকে দেখে ডাক্তার বেবিকে ছেড়ে তার শয্যায় সোজা হয়ে বসল। গায়ে গেঞ্জির ওপর একটা গরম চাদর জড়ানো। শুকনো মুখে ক্লান্তির ছাপ। আমার গলা দিয়েও বাংলা কথাই বেরিয়ে এলো। আপনি তুমির তফাতও ভুল হয়ে গেল।—বাংলায় কথা

বলছিলে তুমি কি বাঙালী ?

বিষণ্ণ দু'চোখ আমার মুখের ওপর স্থির একটু। তেমনি পরিষ্কার বাংলাতেই বলল, বোসো ...এই মাত্র মালা গুপ্তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছ ?

চেয়ারটা টেনে মুখোমুখি বসলাম।—বেরিয়ে যেতে দেখেছি, তার আগে সে যা বলে গেল তা-ও শুনেছি—আগে আমার কথার জবাব দাও-তুমি বাঙালী ? বিহারী নও ?

অসহায় মুখ, অসহায় দু'চোখ। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—হ্যাঁ, আমি বাঙালী, নাম অরুণলাল দত্ত...বিহারে জন্ম, বিহারে মানুষ, কলকাতা থেকে পাশ করলেও বিহারেই প্র্যাকটিস করতাম...ভালো প্র্যাকটিস ছিল, নিজের একটা গাড়িও হয়েছিল।

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন মাথায় ভিড় করে আসছে।—বাংলায় সেই বে-নামী চিঠি তাহলে তুমি লিখেছিলে ?

—হ্যাঁ।...জেরি রুবিনের মতলব আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার অবস্থার সুবিধে নিয়ে মালা গুপ্তার সাহায্যে সে আমাকেও হাত করার চেষ্টায় ছিল। বকলস হাত থেকে ছেড়ে কুকুরটাকে দরজার দিকে ঠেলে দিল, বাইরে যা বেবি...তুই হাঁ করে শুনছিস কি।

বেবি সত্যি বাইরে চলে গেল।

—মালা গুপ্তা তোমাকে এমন পাগলের মতো গালাগাল করে গেল কেন—রিপোর্টে তুমি কোন সন্দেহর কথা লেখোনি ? পুলিশের কাছেও কি বলোনি ?

—জেরির মাথার পিছন দিকটা দেখে তোমাদের সামনেই আমি বলেছিলাম, সামনা-সামনি অ্যাকসিডেন্ট হলে মাথার পিছন দিকটা ও-ভাবে ফাটে কি করে। মালা গুপ্তার তাইতেই সন্দেহ হয়েছিল অ্যাকসিডেন্টের আগে বা পরে কেউ ওর মাথায় মেরেছে...মালা গুপ্তার বিশ্বাস আগে মেরেছে...কিন্তু জেরি যে স্পিডে মোটর বাইক চালাচ্ছিল পিছন দিক থেকে ও-ভাবে মারা সম্ভব নয়, পরেই মেরেছে।

—কিন্তু কেউ মেরেছেই যে এ-কথা জোর করে বলছ কি করে ? এত বড় অ্যাকসিডেন্ট...ধরো ঠিক আগের মুহূর্তে ও যদি কোনো কারণে ঘুরে তাকিয়ে থাকে ?

—তাহলেও আগে সামনের চাকা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাবে, মোটর বাইকটার হাল দেখেই বোঝা গেছে ওটার সঙ্গে ডাইরেক্ট হিট হয়েছে—তাছাড়া কোনোভাবে মাথার সঙ্গে ডাইরেক্ট হিট হলে মাথা একেবারে গুঁড়িয়ে যেত—ও-রকম ফাটত না।...গাছের মোটা ডাল দিয়ে বা চেলা কাঠ দিয়ে দু'তিন বার মাথায় মারা হয়েছে...ফাটা জায়গায় কাঠের টুকরোও লেগে ছিল...বডি সরাবার আগে আমি সে-জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, পরে এখানে এসে খোঁজখবর করে মালা গুপ্তা তা-ও জেনেছে।

—কিন্তু তুমি রিস্ক নিয়ে এ-কাজ করতে গেলে কেন ?

একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে জবাব দিল, আমি ধরে নিয়েছিলাম এ-কাজ যে-ই করুক সে তোমাদের শত্রু নয়, বন্ধু।...পরে জেনেছি আমি মিথ্যে ভাবিনি।

আমি চমকে উঠলাম।—তাহলে তুমি জানো রাত দুপুরে এ কাজ কে করেছে ? জানো ? অ্যাকসিডেন্টের আগে মেরেছে না পরে ?



—পরে।

—কে ? কে এ-কাজ করল ? আমরা তাকে চিনি নিশ্চয় ?

আবার চুপ কয়েক মুহূর্ত।—এ আলোচনা থাক লিলি...তুমি শুধু জেনে রাখো, যে-রকম অ্যাকসিডেন্ট...জেরি তাতে মরতই, তুমি নিজেই দেখেছ তার কপাল বা সামনের দিকটায় কিছু ছিল না—পোস্টমর্টেমে দেখা গেছে বুকের হাড়-পাঁজরও ভেঙেছে...হাসপাতালে নিয়ে যাবার ঢের আগেই সে মরত...বোকার মতো তাকে আর কিছু দিয়ে মারার দরকার ছিল না।

তবু ভয়ে আর সন্দেহে আমার শরীরের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে।—তবু বলো কে এ-কাজ করল—চুপ করে থেকো না বলো—আমার মা কাউকে দিয়ে এ-কাজ করিয়েছে...রিখু ?

—না।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। এবার আঁচ করতে পারছি কে হতে পারে।...যে-লোক মা-কে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিল, আর মাথার চুল ছিঁড়ে আগুনে ফেলে শত্রু ধ্বংস করার মন্ত্র আওড়েছিল। বললাম, রামদেও মাহাতো...তার লোক ?

—না।

এবারে আমি ফ্যালফ্যাল করে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে আছি।—তাহলে আর কে হতে পারে ?

—বৃন্দাবন।

—বৃন্দাবন ! আমার গলা দিয়ে প্রায় আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো। সে-তো টাকা নিয়ে আর ছুটি নিয়ে...

মুখের কথা শেষ করতে পারলাম না। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছি।

—হ্যাঁ, বৃন্দাবন তোমাকে কত ভালবাসত তুমি বা তোমার মায়ের কোনো ধারণা নেই...।

সাদা কথাগুলোও মাথায় ঢুকতে সময় লাগল। তারপরেই চমকে উঠলাম। ডাক্তার ভালবাসত বলছে কেন ? জিগ্যেস করলাম, বৃন্দাবন কোথায় এখন ?

—এ-ব্যাপারের পর ওর মাথা আর ঠিক ছিল না। মাথায় কেবল ওই বিভীষিকা ঘুরছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদেছে, আমার মাথাটা ঠিক করে দাও ডাক্তার...আমাকে সব ভুলিয়ে দাও !...আমি ওকে নিয়ে গিয়ে জামসেদপুরের হাসপাতালে রেখে এসেছিলাম, সেখানকার ডাক্তার আমার চেনা। তাকে শুধু বলেছিলাম, মাথার গোলমাল হবার ফলে অনেক কিছু করেছে ভাবছে, যা বলে শুনো, কিচ্ছু বিশ্বাস কোরো না।...কিছু বলেনি, কেবল গুম হয়ে ছিল। কাল খবর নিতে গিয়ে শুনি বৃন্দাবন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে। এখন কোথায় জানি না।

এরপর ডাক্তার আস্তে যা বলে গেল তার প্রতিটি কথা আমার বুকের মধ্যিখানে গিয়ে লাগছে।...সেই বে-নামী চিঠি বৃন্দাবনের হাতে পড়বে ডাক্তার ভাবেনি। ওই চিঠি পড়ে

দেবার পর সে-ও আমাদেরই মতো নাড়াচাড়া খেয়েছে। মা জানত বৃন্দাবন আমার কত অনুগত। দিশেহারা হয়ে মা তার সঙ্গেই এ নিয়ে আলোচনা করত। তার ভয় দেখেই বৃন্দা বিশ্বাস করেছিল আমার জীবন বিপন্ন। বিপদ আসন্ন। সে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তার জীবন থাকতে আমার এতটুকু ক্ষতি হতে দেবে না। সে জেরি রুবিনের সব থেকে বড় দুর্বলতার খবর রাখত। টাকা। টাকা নিয়ে এগিয়ে এলে শত্রুও তার বন্ধু হয়ে যায়। বৃন্দা ফাঁক পেলেই তার কাছে যেত, নিজের জমানো টাকা থেকে তার নেশার টাকা আর জুয়ার টাকা জোগাতো। জেরি ভাবত এই ছেলেটা তার বিমোহনের জালে পড়েছে। রাতে দোকান থেকে পালিয়েও বৃন্দা জেরির আড্ডায় গেছে, টাকা দিয়েছে। শেষে বৃন্দার মনে হয়েছে আমার বিপদের সময় এগিয়ে আসছে। তাই সে-ও পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। ছায়ার মতো তার সঙ্গে থাকার জন্য মায়ের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিয়েছে, আর চারহাজার টাকাও চেয়েছে। নিজেদের এত বড় বিপদে মা ওকে ছুটি বা টাকা দিতে একটুও আপত্তি করেনি।

...চার হাজার নয়, তার সঙ্গে নিজের জমানো শেষ ছ'হাজার টাকা জুড়ে মোট দশহাজার টাকা বৃন্দা জেরির হাতে তুলে দিয়েছে। আর জানিয়েছে মিস লিলি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নগদ দশহাজার টাকা পেয়েও জেরি রুবন তাকে প্রাণের বন্ধু ভাববে না কেন—আর নিজের সংকল্পের কথা শুনিয়ে তাকে সুদিনের আশ্বাসই বা দেবে না কেন। অ্যাকসিডেন্টের রাতে দেওকী নারাঙের আড্ডায় বসে জেরি রুবিন দেদার নেশা করেছে আর তার পাক্কা প্ল্যান জানিয়েছে। ...এক মাসের মধ্যে লিলিকে নিয়ে সে মধ্যপ্রদেশে বেড়াতে যাচ্ছে...সেখানে গিয়ে সে এমনভাবে কাজ সারবে যে কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। ...লিলি রুবিন পাহাড় থেকেও পড়ে মরতে পারে, অথবা রাতে গলা টিপে মেরে তাকে জঙ্গলের বাঘ দিয়েও খাওয়ানো যেতে পারে—একভাবে না একভাবে সে মরবেই। আর এদিকে মেম সাহেবের বাবস্থা দেওকী নারাঙ আর বৃন্দাবনকে সেরে রাখতে হবে। এটা তাদের কাছে জল-ভাত ব্যাপার হওয়া উচিত।

...মনের আনন্দে আর স্ফূর্তিতে জেরি সেই মাঝ রাত পর্যন্ত এত মদ গিলেছে আর সেই সঙ্গে দেওকী নারাঙের দেওয়া এত বাজে নেশার জিনিস খেয়েছে যে দু'পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতেও পারছিল না। সেই অবস্থায় মোটর বাইকে উঠেছে আর চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেছে।...নেশা যত চড়ে তার মোটর বাইকের স্পিডও ততো বাড়ে।

...বৃন্দা ওই রাস্তা ধরেই টর্চ হাতে তার সাইকেলে চেপে আসছিল। কি করে লিলি আর মা-কে রক্ষা করবে ভেবে ভেবে ক'দিন ধরে তার মাথায়ও আগুন জ্বলছিল। এই এক মাসের মধ্যে সে জেরি রুবিনকে খুন করবে ঠিকই করে ফেলেছিল। তারপর ফাঁসি যেতে হয় যাবে। হঠাৎ রাস্তার আবছা অন্ধকারেও কি চোখে পড়ল তার। সাইকেল থেকে নামল। টর্চের আলোয় দেখল। জেরির মোটরবাইক ভেঙে দুমড়ে পড়ে আছে। আর সেই গাছটার এদিকে একটা ভাঙাচোরা দেহ রক্তে ভাসছে—তখনো তার দেহে



প্রাণ আছে বোঝা যায়, কারণ থেকে থেকে ওই নিথর দেহ এক-একবার কেঁপে কেঁপে উঠছে।...জেরি।...জেরি রুবিন।

সেই মুহূর্তে বৃন্দা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। সেই আবছা অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে রাস্তার এদিক ওদিক তাকালো, যা-হোক একটা কিছু দরকার তার। রাস্তার ধারে খুব মোটা ডাণ্ডার মতো একটা ডাল চোখে পড়ল। দুটো আঘাতেই ওই নিস্পন্দ দেহের এক-একবার কেঁপে কেঁপে ওঠা বন্ধ করে দিল। হাতের ডাণ্ডা দূরে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাইকেল নিয়ে চলে গেল।...তারপর ডাক্তারের কাছে পাগলের মতো ছুটে এসেছে তিন দিন তিন রাত বাদে। হাঁতে ধরে ডাক্তারকে শেষ কথা বলেছিল, সে খুনী এ যেন মিস লিলি না জানে। ডাক্তার তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে সে জেরি রুবিনকে খুন করেনি—ওই অ্যাকসিডেন্টে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু তার মাথায় কিছুতে সেটা ঢোকানো যায়নি।

ঘরের বাতাস ভারী লাগছে। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে বুকে লাগছে। অনেকক্ষণ বাদে সমস্ত অবসাদ আর অনুভূতি ঝেড়ে ফেলেই আত্মস্থ হতে চেষ্টা করলাম। ডাক্তার চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে।

জিগোস করলাম, জেরির মৃত্যুতে মালা গুপ্তা হঠাৎ তোমার ওপর এমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল কেন...আমার বিয়ের আগে পর্যন্ত সে-তো ওকে পছন্দই করত না।

—এই ভুলের রাস্তায়ই মালা গুপ্তা তোমাদের খুব ভালো করে চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল। তোমার বিয়ের আগে থেকেই জেরি তার প্রাণ, জেরি তার চোখের মণি। এ-ভাবে এক বিবাহিত মেয়েকে বশ করতে দেখে আমারই সন্দেহ হত জেরি জাদু জানে কিনা। ওর মৃত্যুতে তার উন্মাদ-দশা তো নিজের চোখেই দেখেছ।...তোমাদের বিয়ের পর মালা গুপ্তার আরো সুবিধে হয়েছিল, কারণ জেরিকে আর কোউ সন্দেহ করবে না, করেনি।...মাঝখান থেকে আমার দুর্ণাম রটেছিল। আমার বাংলোর এই ঘরটাই ওদের লীলার জায়গা হয়ে উঠেছিল। প্রসাদ গুপ্তা না থাকলে রাতে ওরা দু'জন এখানে আসত। থাকলেও আসত, তবে রাত কাটাত না। অসুখের নাম করে বিশ্বস্ত ডাক্তারের কাছে এলে কোন স্বামী অবিশ্বাস করে? জেরি মারা যাবার পর আমি এই ঘর নিজের করে পেয়েছি, নইলে খালি থাকলেও ঘুনায় ঢুকতাম না, আমাকে ওই বসার ঘরে পড়ে থাকতে হত।

অবিশ্বাস করি না।...জেরির জন্য মালা গুপ্তা পাগল হতে পারে। আরো কত মেয়ে পাগল হয়ে আছে কে জানে।...মেয়েদের পাগল করার জাদু জেরি রুবিন জানে আমি বিশ্বাস করি। জিগোস করলাম, কিন্তু এমন কুৎসিত ব্যাপারও তুমি বরদাস্ত করতে কেন, তোমার ওপর মালা গুপ্তা এমন অদ্ভুত জোর খাটাতে পারত কি করে?

...শুনলাম কি করে পারত। বুকের তলার কোনো ক্ষত নিঙড়ে কথাগুলো কানে বেজে চলল।—পাঁচ জনের মতো বড় আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছিলাম, বড় ঘরের মেয়ে এনেছিলাম। সে মালা গুপ্তার প্রাণের বন্ধু ছিল।...বন্ধুর চরিত্র বন্ধুর মতোই হবে সে

আর আশ্চর্য কি। স্ত্রী'র চরিত্র বুঝতে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি। অশান্তি আর খিটিমিটি লেগেই ছিল। ঝগড়া হলেই রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যেত। বড় লোক বাপ-ভাই আমাকে শাসাতো। আমিও জবাব দিতে ছাড়তাম না।...স্ত্রী যার প্রতি আসক্ত ছিল এতদিন, তার কাছ থেকেই চরম ঘা খেল একদিন, অপমানিত হল। আত্মহত্যা করে সে তার যন্ত্রণা জুড়লো। তার বাবা মা ভাই এটাকে হত্যা প্রমাণ করতে চাইল। আত্মহত্যা হলেও সেটা আমার অত্যাচার আর গঞ্জনার ফল বলে প্রমাণ করতে চাইল। অনেকদিন টানা-হেঁচড়ার পর মুক্তি পেলাম বটে, কিন্তু আমার ডাক্তারির পসার গেল। শ্বশুর বাড়ির লোক উঠে পড়ে লাগল। হত্যা যদি না-ও করে থাকি, নৃশংস স্বামীর গঞ্জনায় যার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়—এমন ডাক্তারকে মানুষ ডাকবে কোন্ ভরসায়? ...লোকের হাসি বিদ্রূপ কটূক্তি আর শাসানি সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এলাম।...সেখানে সকলে আমাকে দত্ত সাহেব বলে জানত, এখানে সকলে আমাকে ডাক্তার অরুণলাল বলে জানলো। এখানে মালা গুপ্তা আমাকে সাহায্য করল, বন্ধুর সব-কথা জানত বলে তখন অন্তত সে আমাকে নির্দোষ ভাবত।...কিন্তু এ-ভাবে ব্ল্যাকমেল করার জন্য তারও যে আমাকে বিশেষ দরকার এ ভাবতেও পারিনি।

## ॥ ৮ ॥

কাহিনী এখানেই শেষ হতে পারত।...কিন্তু তাহলে জেরি রুবিনের মৃত্যু সম্পূর্ণ হত না।...তাহলে আমার এই জবানবন্দীও অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

...ছ'মাসের মধ্যে ডাক্তার অরুণলালকে আমি বিয়ে করেছি। মায়ের মনে আর বাঙালী বিদ্বেষের ছিটেফোঁটাও নেই। বৃন্দাবনকে পেলে মা এখন মাথায় করে রাখে। বিয়ের আগে আর পরেও আমি আর অরুণলাল তাকে অনেক খুঁজেছি। কিন্তু এতবড় দুনিয়ার ছেলেটা হারিয়েই গেল।

দুঃখ হয় প্রসাদ গুপ্তাকে দেখলে। মালা গুপ্তা এত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে সে তাকে বাপের বাড়ি রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। প্রসাদ গুপ্তা ফাঁক পেলেই তাকে দেখতে ছোটে। কিন্তু এত ভালো আর এমন আমুদে স্ত্রী কেন যে তাকে বরদাস্ত করতে পারে না ভেবে পায় না। তাকে দেখলেই ক্ষেপে যায় নাকি। বেচারা প্রসাদ গুপ্তা মায়ের কাছে এসে মুখখানা বেজার করে বসে থাকে।

...আমার একটা বড় সাধ পূর্ণ হয়েছে। মনের মতো বাঙালী স্বামী পেয়েছি। কিন্তু...।

...এই কিন্তুটাই সর্বক্ষণ আমার বুকের তলায় একটা পুরনো মরচে-ধরা পেরেকের মতো খচ-খচ করে বিঁধছে।...অরুণলাল সত্যি ভদ্র, বিনয়ী। তার অনেক গুণ। তার অনেক সহ্য। বাইরের লোকের কাছে তার সহজ গম্ভীর আচরণ। অ্যানজেলা তাকে ভয়



করে না, কিন্তু শ্রদ্ধা করে। রিখু উঠতে বসতে তাকে সেলাম ঠোকে। কিন্তু আমার সঙ্গেই শুধু অরুণলাল পরামর্শ করে কি করে অ্যানজেলার সঙ্গে রিখুর বিয়েটা দেওয়া যায়। তার মধ্যে রিখুর ওপর অ্যানজেলার এত বিরাগ কেবল অনুরাগের লক্ষণ।

আমি হেসে তাকে জড়িয়ে ধরি। পাঁচটা দশটা চুমু খাই।...তারপরেই সেই কিন্তু...।

...আমি কি মেয়েটা অসতী? অসচ্চরিত্র? স্থূলহীন বাসনা সর্বস্ব একটা মেয়ে? এমন মনে হলে শান্তি কোথায়? নিজেকে ক্ষমা করার যুক্তি কোথায়?

অরুণলাল কত বুদ্ধি ধরে সেটা আমার জানতে বুঝতে বাকি নেই।...সে কি বুঝতে পারে একমাত্র কোন্ সময়ে আমি অসুখী অতৃপ্ত, একমাত্র কোন সময়ে হীনস্থূল বিষাক্ত দোসরের অভাবে আমার অন্তরাত্মায় হাহাকার ওঠে। জেরি রুবিন কি সত্যিই জাদু জানে? তার আত্মা কি এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে?

মায়ের বদ্ধ ধারণা, উপলক্ষ্য হিসেবে যে যা-ই করুক, আসলে ভাগ্যের কলকাঠি ঘুরিয়েছে রামদেও মাহাতো। সে বলেই দিয়েছিল, আমাদের ক্ষতির চেষ্টা যে করবে সে-ই ধ্বংস হবে। সে তার জন্য নরকের ফাটক জাহান্নমের ফাটক খুলে দেবে বলে গর্জে উঠেছিল। রামদেও মাহাতোর সঙ্গে মা নতুন করে আবার যোগাযোগ রেখে চলেছে দেখে আমার বিরক্তি। আমার বাবার কথা আমার ছেলেবেলার কথা অরুণলাল খুঁটিয়ে শুনেছে। তার মতে মানুষের অর্ধেক রোগের সঙ্গে মনের যোগ। মন সারে না বলে অনেক রোগও সারে না। এই মনের সঠিক হদিস পেতে হলে তার সম্পর্কে আদ্যন্ত খবর রাখতে হয়। যে যত পারে চিকিৎসক হিসেবেও সে ততো সার্থক। তাই সকলের সব কথাই সে গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনে। আমার বা মায়ের ব্যাপারে তার আরো বেশি আগ্রহ স্বাভাবিক। মায়ের সম্পর্কে অরুণলাল বলে, তাঁর সব থেকে বেদনার সময় তোমার দাদুর বাড়ির শিক্ষিত লোকদেরও অলৌকিক শক্তির ওপর অন্ধ নির্ভরতা দেখেছে। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। যুক্তি তর্কের পথ ধরে আসে না। বিপাকে পড়লে আর জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তার থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে না পেলে শুধু এ-দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষেরা নয়, সব দেশেরই অনেক মানুষ অলৌকিক বা দৈবের পিছনে ছোটে। অন্ধ বিশ্বাসে আশ্চর্য কাজ হয় এমন নজিরও অনেক আছে। মানুষ জানে কতটুকু? পৃথিবীতে হামেশা অনেক কিছু ঘটছে সহজ বুদ্ধিতে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ভূড় প্রেত ডাকিনী যোগিনী বা অলৌকিক ক্ষমতার কারবারীদের ওই-সব বিচার-বুদ্ধির বাইরের ঘটনাগুলিই বড় পুঁজি। এমন কি অনেকেরই নিজেদের এই ক্ষমতার ওপর অন্ধ বিশ্বাস।...তোমার মা-ও পরিবারের আর পাঁচজনের মতো আর কোনো পথ না পেয়ে এই ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করেছিল। তোমার বাবা বাঁচল না। তাঁর বিশ্বাসও চলে গেল এটা ভাবা ভুল। নিজের অজান্তে তার মনে বরং উল্টো ছাপ পড়ে গেল—সে ধরে নিল যোগ্য গুণীর সন্ধান পেল না বলেই তার স্বামী বাঁচল না। এটা তারও অবচেতন মনের কথা, যুক্তির কথা নয়। যুক্তি বিশ্বাস টলাতে পারে—, বিশ্বাস প্রবণতার মূলে পৌঁছয় না। তাই তোমার মা যেমন আছে থাকতে দাও, সব

থেকে ভালো কিওর নেচার'স কিওর।

অরুণলালের কথা সব-সময়েই কান পেতে শোনার মতো। স্বচ্ছ, স্পষ্ট।

শুধু মা কেন, অ্যানজেলাও এক আধসময় ওই রামদেও মাহাতোর ডেরায় হানা দেয় বুঝতে পারি। আগের থেকে এখন তার দ্বিগুণ বুকের পাটা। জেরি নেই। আর ওর ভয়-ডরও নেই। উত্তেজনা চাপতে না পেরে একদিন নিজেই নিজের গোপন অ্যাডভেঞ্চার ফাঁস করল।... রামদেও মাহাতোর ডেরায় গেছিল। সে নাকি বুক ফুলিয়ে সকলকে বলছে, জেরি সাহেবের আত্মা এখন তার হাতের মুঠোয়। তার আত্মা এনে একদিন সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আগে রামদেও মাহাতোর এক সাহেব ভক্তকে বশ করে নিয়েছে। জেরির সাগরেদরা এখন তো প্রায় সকলেই তার ভক্ত হয়ে উঠেছে। বশ করার পর ওই ভক্তর ওপর জেরির আত্মা ভর করেছিল। তার গলার স্বর আর হিন্দী কথাও নাকি জেরির মতো হয়ে গেছিল। তেমনি করেই অল্প অল্প হাসছিল আর নরম গলায় টেনে টেনে কথা বলছিল। প্রথমে এসে রামদেও মাহাতোকে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল করেছে। তারপর মুক্তির জন্য আর তাকে বেহ্‌শতে পাঠানোর জন্য সে নাকি রামদেও মাহাতোর হাতে পায়ে ধরেছে। রামদেও মাহাতো বলেছে, তার বহুত পাপ মজুত, সে-সব খারিজ হতে সময় লাগবে। বেহ্‌শতে যেতে এখনো অনেক দেরি।

এক বর্ণও বিশ্বাস হয়নি। নেশার ঘোরে মিডিয়াম হয়ে কোনো ভক্ত রামদেও মাহাতো যা বলাতে চেয়েছে তাই বলেছে। তাছাড়া এর মধ্যে হিপনোটিজমের ব্যাপারও কিছু থাকতে পারে। অরুণলালই একদিন গল্প করছিল, বশীকরণ বলতে হিপনোটিক বিদ্যা এরা অনেকে ভালোই জানে, দুর্বল চরিত্রের লোককে সহজে হিপনোটাইজ করতেও পারে। তাছাড়া দিশি শেকড়বাকড় থেকে এরা কিছু কিছু ড্রাগও তৈরি করতে পারে।...বিশ্বাস আদৌ করিনি বটে, কিন্তু জেরির আত্মা আনা হয়েছে আর তার মতো অল্প-অল্প হাসি আর নরম গলার টানা-টানা কথা সকলে দেখেছে আর শুনেছে শোনামাত্র আমার গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। অ্যানজেলার চোখ এড়ানোর জন্য আমি তাড়াতাড়ি সরেই আসছিলাম। কিন্তু তার আগেই মনে হয়েছে ওর পেটে আরো কিছু কথা আছে যা মুখে আনতে পারছে না। অ্যানজেলাকে তো নতুন দেখছি না। পেটের কথা মুখ দিয়ে বার না করা পর্যন্ত ওর হাঁসফাঁস দশা।

রাগত মুখ করে বললাম, তুমি এখন মায়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছ বুঝি? খবরদার এ-সব বাজে গল্প মায়ের কাছে করবে না।...রামদেও মাহাতো আর কি বলল?

ও মিনমিন করে জবাব দিল, কিছু না ছোট মেমসাহেব...তোমার কথা জিগ্যেস করছিল।

—কি জিগ্যেস করছিল?

—এই জিগ্যেস করছিল...ছোটি মেমসাব্‌কি কেয়া হাল...আমি বললাম, বহুত্ আচ্ছা, তাইতেই...

পরেরটুকু শেষ না করে ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকালো। বললাম, তোমার অত



ঢোক গেলার কি হয়েছে, তাইতেই কি?

পরেরটুকু শুনে আমিই হকচকিয়ে গেলাম।...ছোট মেমসাহেব খুব ভালো আছে বলতে রামদেও মাহাতো নাকি গম্ভীর হয়ে গিয়ে কি ভেবেছে, তারপর মাথা নেড়ে বলেছে, ছোট মেমসাহেব খুব ভালো থাকে কি করে—ইয়ে নহী হো সাকতা—জেরি সাহাবকা আত্মা ইয়ে কহা কি লিলি মেমসাহাবকি হালৎ আচ্ছা নহী—রামদেও মাহাতোর কাছে জেরির আত্মা 'ঝুট বাত' বলতে পারে না—রামদেও মাহাতো তাকে আমাদের মা-মেয়ে দু'জনের কথাই জিগ্যেস করছিল, সে বলেছে, 'বড়ি মেমসাব' ভালো আছে ছোটি মেমসাব ভালো নেই। ও-কথা শুনে অ্যানজেলা তাজ্জব বনে ফিরে এসেছে—তার ধারণা ছোট মেমসাহেবও খুব ভালো আছে।

আমি পালিয়েই এলাম। আমার দিকে চেয়ে অ্যানজেলা বুঝতে চেষ্টা করছিল গুণিন অমন কথা বলল কেন। আমি যত না অবাক তার থেকে অস্বস্তি বেশি।...সব থেকে গোপন আর দুর্বল জায়গায় নাড়াচাড়া পড়েছে। রামদেও মাহাতোর কথা যুক্তি দিয়ে নস্যাত করতে চেয়েছি।...জেরির বন্ধু মিডিয়াম যখন, মায়ের সঙ্গে জামাইয়ের সম্পর্ক কি-রকম ছিল তার না জানার কথা নয়। জেরির অবর্তমানে মায়ের গায়ে হাড়-জুড়নো বাতাস লাগবে জানা কথাই। আর জেরির আত্মা ভর করেছে যখন, সে কি করে বলে তার মৃত্যুর পরেও তার বউ ভালো আছে, সুখে আছে। এমন কি জোরটা কোথায় এমন গপ্পও জেরির মতো মানুষ তার ইয়ার বন্ধুদের কাছে করে থাকতে পারে, তবু মনের অনুভূতি যুক্তির পথে চলে না। তাই অস্বস্তি।

...চেনা জানা সকলের মনোভাব আমি বুঝতে পারি। মা ভাবে অনেক দুঃখের পর আমার সুখের দিন এসেছে। চেনা জানার মধ্যে পছন্দ আমাকে সকলেই করে, আগে তারা ভাবত, মেয়েটা সব পেল, কেবল এক অমানুষের হাতে পড়ে তার ঘরের জীবন নষ্ট। ক্লাবের এক অন্তরঙ্গ বয়স্কা মহিলা বলেই ফেলেছিল (যত অপ্রিয় কথা ঠিক এই সময়েই ভিড় করে আসে কেন!), গাড়ি বাড়ি... টাকা পয়সার ছড়াছড়ি...ঘরে এখন পর্যন্ত একটা বাচ্চা-কাচ্চার দেখা নেই কেন? তাদের কৌতূহল, আমার ঘরের ওই অমানুষ সব সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছে কিনা। আজ অরুণলালের দৌলতে তাদের কাছে আমার ঢের বেশি খাতির কদর। ভদ্র বিনয়ী আর ভালো বিশ্বস্ত ডাক্তারের বউয়ের সঙ্গে কে না একটু বেশি ভাবসাব রাখতে চায়। তারা ভাবে, দুঃখ যেমন সয়েছি তেমনি সুখের দিনও দেখছি এখন।

কিন্তু এ আমার কি হল? আমার সমস্ত দিনের কাজ-কর্ম চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে-মানুষটাকে একেবারে ছেঁটেই দিয়েছিলাম, বেঁচে থাকলে যে-লোক খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে আর মা-কে খুন করতই—চরিত্র যার এত জঘন্য, মালা গুপ্তার মতো আরো কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে ঠিক নেই—তারই জন্য অন্তরাত্মার এই সংগোপন হাহাকার কেন? সে এ-ভাবে আমার মন জুড়ে বসছে কি করে? সে আমার কাছ থেকেই আমাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। অহরহ তার টানা-টানা ফিস ফিস গলার স্বর কানে বাজে, আমি

নেই—আমি নেই আমি নেই আমি নেই !

...এ-ও কি কোনো জাদুর ব্যাপার ? এ কি কোনো রোগ আমার ? না কি কোনো বিকৃতি ? বিকৃতি ছাড়া আর কিছু না—কিচ্ছু না।

এখন আমার সব থেকে বেশি ভয় অরুণলালকে। তার কাছে যেতেই সব থেকে বেশি সংকোচ। সে শুধু বুদ্ধিমান নয়, বিচক্ষণ ডাক্তারও। সে কি কিছু অনুভব করে ? আমার ভিতরের বিকৃতি টের পায় ? অরুণলালকে আমি ভালবাসি। এই ভালবাসার স্বাদ আমার জানা ছিল না। তাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে, খুব কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কি হয় ?...ওই বিকৃতি আমাকে তখন সব থেকে বেশি পেয়ে বসে। তখন অসহ্য মনে হয়। দু'হাতে ওক ঠেলে সরাতে ইচ্ছে করে।...অরুণলাল কি তা বুঝতে পারে ?

...সেদিন চমকেই উঠেছিলাম। আমার অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলি সব সময়েই ব্যর্থ। মনের তলায় একটা বিমুখ অনুভূতি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে দেখি মাথায় কাছে সবুজ টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে।...অরুণলাল বিছানায় উঠে বসে চুপচাপ আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। চোরের মন নিয়ে ওকে দু'হাতে জাপটে ধরেছি।—বসে আছ যে ? ঘুমোওনি ?

অরুণলাল আলতো করে আমার কপালে চুমু খেল। বলল, ঘুম আসছিল না...তোমাকে দেখছিলাম।

আমার দম বন্ধ প্রায়।—কি দেখছিলে ?

দেখছিলাম তুমি কত সুন্দর।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। তার পরেই গ্লানিতে মন ছেয়ে গেছে। মনে মনে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছি। ও যদি জানতো ভেতরটা আমার কত কুৎসিত।

ঘেন্না ঘেন্না ঘেন্না। নিজেকে কেউ ঘৃণা করতে থাকলে তার আর সান্ত্বনার কি থাকে ? সম্বল কি থাকে ?

কাজে মন দিতে পারি না। অকারণে মায়ের সঙ্গে আর কর্মচারীদের সঙ্গে খিটখিট করি। আমার রোগ বা বিকৃতি যা-ই হোক; বেড়েই চলেছে টের পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থেকেই থাকে—তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। তবু মৃত জেরি রুবিনকে দিনে অনেকবার করে ভস্ম করি। বলি, দূর হও, নিপাত যাও, নিপাত যাও ! ও চিরকালের শয়তান, আমাকে আরো বেশি—করে আঁকড়ে ধরে। এখন সব থেকে বেশি এড়াতে চাই অরুণলালকে। একটা সুবিধে হয়েছে, সমস্ত দিন আমি থাকি ব্যবসা নিয়ে ও থাকে ওর রোগী নিয়ে। আমার অনুমতি নিয়েই ইদানীং রাতেও পড়াশুনায় মন দিয়েছে। জেরির ওই কোণের ঘরেই তার বই-পত্র সাজিয়ে নিয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর ঘন্টা দুই পড়াশুনা করে। মনে মনে আমি হাঁপ ফেলে বেঁচেছি। কিন্তু তার ফল শুধু নিজের ওপর ঘেন্না। ও শুতে আসার আগে ক্বচিৎ কখনো সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ি। বেশির ভাগ



রাত ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি। তখনো নিজের ওপর শুধু ঘেন্নাই সম্বল।

শরীর দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে বুঝতে পারি। আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারি না। দু'চোখ গর্তে মনে হয়। নাকের পাশের হাড় দুটো উঁচিয়ে উঠছে মনে হয়। মুখের রং বদলাচ্ছে। উজ্জ্বলতা কমছে। গায়ের চামড়া মুখের চামড়া নিজের কাছেই খসখসে লাগে। মা জিগ্যেস করে তোকে এমন দেখছি কেন ? কি হয়েছে ?

এই সামান্য কথাতেই আমার যাচ্ছেতাই রাগ হয়ে যায়। ঝাঁঝিয়ে উঠি, ক'দিন ক'বার করে বলব আমার কিচ্চিচ্ছু হয়নি ? কি রকম দেখছ ? দেখে মরতে বসেছি মনে হয় তোমার ?

মা এখন আর কিছু জিগ্যেস করে না। হঠাৎ হঠাৎ খেয়াল করি চুপচাপ আমার দিকে চেয়ে আছে। তাতেও বিরক্তি। দোকানের কর্মচারীরাও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে খেয়াল করি। আমি দোকানে এলে তারা তটস্থ হয়ে ওঠে। অথচ আগে মা-কে তারা আমার থেকে ঢের বেশি ভয় করতো। এখন আমাকে ভয় করে। নিজের ওপরেই রাগ আর আক্রোশ। কেন এ-রকম হল ? ক্লাবে যাওয়া ছেড়েছি। সেখানেও প্রায় সকলেরই এক কথা।—কি হয়েছে ? ঘরে অমন একখানা ডাক্তার মজুত অথচ তোমার চোখ মুখ এমন কালছে মেরে যাচ্ছে কেন ?

এরা সকলে মিলে কি পাগল করে দেবে আমাকে ?

একদিন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল অরুণলালের সামনেও। দোষের মধ্যে সকলের যে কথা ওর মুখেও সেই একই কথা। রাতে বাংলোয় ফিরে ক্লান্ত হয়ে বারান্দার সোফায় বসেছিলাম। আগে ওই কোণের ঘরের দিকে বিতৃষ্ণায় তাকাতাম না। তখন ওটা ছিল জেরির ঘর। ও-ঘরে তার নেশার গবেষণা আর ভুড়ুর গবেষণা চলত। এখন ওটা অরুণলালের ঘর। থাকে-থাকে ডাক্তারি বই আর জার্নাল সাজানো। ও-ঘরে এখন রোগ বা রোগী নিয়ে গবেষণা চলে। ইদানীং তার পড়াশুনার ঝোঁক বাড়ছে লক্ষ্য করেছি। সকালে চেম্বার থাকে, সময় হয় না। দুপুরে যখন বিশ্রাম করে তখন আমি দোকানে। ইচ্ছে করেই লাঞ্চের সময় পার করে খেতে আসি। অরুণলালকে বলে রেখেছি, আমি কবে কখন ফিরি না ফিরি ঠিক নেই—সে যেন তার সময়েখেয়ে নেয়। কোনদিন বা লাঞ্চ পড়ে থাকে, আমি আসিই না, রেস্তরাঁয় খেয়ে নিই। বিকেল থেকে রাত সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অরুণলাল তার অ্যাপয়নটমেনট মতো বাড়ি-বাড়ি গিয়ে রোগী দেখে। তার পসার বাড়ছে। ঘাটশীলা আর রাখা-মোসবাণী থেকেও হামেশা ডাক পড়ে। গেল মাসে ছোট্ট একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি কিনেছে। মা টাকা দিতে চেয়েছিল। নেয়নি। হৃষ্ট চোখে মা আমার দিকে তাকিয়েছে। অর্থাৎ, দ্যাখ—তফাত দ্যাখ।...রাতে ফিরে ওই কোণের ঘরে ঢোকে। এক মনে পড়াশুনা চলে। রাতে ডিনারের পরেও আবার ঘন্টা দুই ওই ঘরে কাটে।

...এখনো ওই কোণের ঘরের দিকে তাকালে আমার আবার আর এক ধরনের চাপা বিরক্তি।

আমি এসেছি টের পেয়েই অরুণলাল সেদিন ওই ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। চুপচাপ চেয়ে দেখল একটু।—ক'দিন ধরে তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব ভাবছি, ঠিক ঠিক জবাব দেবে ?

অকারণেই ভেতরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল টের পাচ্ছি। মুখে হাসি টেনে বললাম, কি রকম কথা যার জন্যে ভনিতা দরকার ?

—তোমার কি হয়েছে ?

ঠিক এই প্রশ্নই আশা করছিলাম। কিন্তু শোনামাত্র এই লোকের ওপরেই আমার ফেটে পড়তে ইচ্ছে করল। আবার এ-ও জানি এতটুকু রাগ দেখালে বা একটা বেফাস কথা বলে ফেললে পরে লজ্জায় নিজেরই মাথা কাটা যাবে। আমিও মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইলাম একটু, হালকা সুরে ফিরে জিগ্যেস করলাম, তোমার আজ রোগীর অভাব হয়েছে ?

হাসল।—না, ক'দিন ধরেই তোমাকে জিগ্যেস করব ভাবছিলাম। আজ তোমার মা-ও বললেন...

আর ঠিক তক্ষুনি ধৈর্য খুইয়ে বসলাম। চেষ্টা করেও সহজতর সুর ধরে রাখতে পারলাম না।—আজ মা বলল বলে জিগ্যেস করলে, ক'দিন ধরে জিগ্যেস করবে ভেবেও করোনি কেন—ফি পাওয়ার আশা নেই বলে ?

অবাক একটু। তারপর হেসেই জবাব দিল তা না, ভেবেছিলাম ডাক্তার হিসেবে আমার ওপর তোমার মায়ের মতো বিশ্বাস থাকলে তুমি নিজেই বলবে।

—তাহলে কি বুঝলে—বিশ্বাস নেই ? নিজের গলা নিজের কাছেই খরখরে লাগল।

—বুঝলাম হয় বিশ্বাস নেই, নয়তো তোমার কিছুই হয়নি।

হাসতে চেষ্টা করছি বলে আরো প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে।—তাহলে কিছু হয়নি ধরে নিয়েই নিশ্চিন্ত হয়গে যাও।

তবু দু'চোখ সোজা আমার মুখের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। বলল, আর এ-ও বুঝলাম তুমি সত্যি কথা বললে না।

ঘরে চলে গেল। আমি নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে লাগলাম।

পরদিন সকালে সবে চায়ের পাট শেষ হয়েছে। অ্যানজেলা এসে খবর দিল, মা ডাকছে।

আমি অবাক একটু। কারণ এখন দরকার পড়লে মা আর আমাকে ডেকে পাঠায় না। নিজেই চলে আসে। এই জামাইকে নিয়ে আর তার কোনরকম ভয় ভাবনা দ্বিধা সংকোচ নেই। সকালে অনেকদিন এসে আমাদের সঙ্গেই চা খায়। ফুরসত পেলে রাতে জামাইয়ের কোণের ঘরে গল্প করতে ঢোকে। নিজে এসে একদিন পর একদিন ব্লাডপ্রেসার চেক করিয়ে যায়। আমার ধারণা, বললে মা তার বাংলো ভাড়া দিয়ে এই বাংলোয় এসে তার পুরনো ঘর দখল করবে। জামাইয়ের গর্বে সর্বদা বুক ভরাট তার। কারো অসুখ করলে এমন কি করার সম্ভাবনা দেখলেও স্লিপ লিখে তাকে জামাইয়ের



চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়। আর হঠাৎ প্রেসার টেসার বেশি বেড়ে গিয়ে থাকলে বা শরীর খারাপ হলেও তো আমার বদলে জামাইকেই ডেকে পাঠানোর কথা।

গিয়ে দেখি মা তার ইজিচেয়ারে শুয়ে পা দোলাচ্ছে।। আমাকে দেখেই বলল, যে মেজাজ হয়েছে আজকাল তোর, ভাবলাম লালের সামনেই বকা-ঝকা করে উঠলে আমার খুব মান বাড়বে, তার থেকে এখানেই ডাকি, মায়ের মন বুঝবি কি করে...যা বলি মাথা ঠাণ্ডা করে শোন—

তক্ষুনি বুঝেছি মা এমন কিছু বলবে যাতে আমার মেজাজ খারাপ হবেই। চুপচাপ চেয়ে আছি।

—কাল এক ফাঁকে আমি রামদেও মাহাতোর ওখানে গেছলাম, লোকটা আর যা-ই করুক লোকের ক্ষতি করে না...তোর কথা অনেকবার করে জিগ্যেস করল আর আসার আগে বার বার করে তোকে একবার যেতে বলল, তাই বলছি গেলে ক্ষতি তো হবে না, একবার ঘুরে আয় না।

নিজের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে আছি, এরা কি আমাকে একেবারে পাগল করে দেবে ? আমার মুখ দেখেই মা প্রমাদ গণল বোধহয়। তাড়াতাড়ি বলল, না যাস না যাবি, এই সাতসকালে আর রাগারাগি করতে হবে না, বলতে বলেছে তাই বললাম—

—আমার সম্পর্কে তাকে তুমি কি বলেছ ?

মায়ের হাসিফাঁস মুখ।—কি আবার বলব, যদি জিগ্যেস করে, কেমন আছে—বলে দেব ভালো আছে ? কেমন আছিস নিজে জানিস না ? ...বিশ্বাস করিস বা না করিস যা না একবার...বিশ্বাস না করেও মিষ্টি খেলে মিষ্টি লাগবে, তেতো খেলে তেতো লাগবে, লোকটার গুণ যদি কিছু থাকে তোর আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি যায় আসে ! যাই, দেরি হয়ে গেল—

বলার যা বলে সমুখ থেকে পালিয়ে বাঁচল। রাগে নিজেকেই ভস্ম করতে করতে চলে এলাম। না দোষ কারো নয়। দোষ কেবল আমার বিকৃত চরিত্রের। ঘেন্নার আগুনে নিজেকেই আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে খাক করে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

দোকানে এসে চাবুকে চাবুকে নিজেকে সারাক্ষণ সজুত রাখলাম। ব্যবসা নিয়ে রোজই মায়ের সঙ্গে কিছু না কিছু আলোচনা হয়। আর তখনো আমার মেজাজ খুব ঠাণ্ডা থাকে না। আজ ঠাণ্ডা শুধু নয়, মায়ের হিসেব মেলানোর সময় হেসে ঠাট্টাও করলাম, খরচের কতগুণ লাভ হলে যে তুমি খুশি হও আমি আজও ভেবে পেলাম না—

মা এটুকুতেই খুশি।—খুব বুঝেছিস, লাভের হিসেব তো আমি নিজের জন্যেই কষি।

অনেক দিন বাদে সমস্ত বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কর্মচারীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করলাম, সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইলাম। লাঞ্চের সময় ধরে বাংলোয় ফিরলাম। অরুণলালের মুখোমুখি বসে লাঞ্চ সারলাম। সকাল থেকে কটা রোগীর মাথায় হাত বুলানো হল খবর নিলাম। অ্যানজেলাকে সামনে ডেকে কপট গাম্ভীর্যে বললাম, ডাক্তার

সাহেব বলছে তোমার রান্না আজকাল একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে—

অরুণলালের দিকে এক নজর তাকিয়েই অ্যানজেলা বুঝে নিল অভিযোগটা কার। অরুণলাল সকৌতুকে আমার দিকেই চেয়ে আছে। ত্রুটি স্বীকার করে অ্যানজেলা সবিনয়ে জানান দিল, কাল নতুন কিছু করতে চেষ্টা করবে।

লাঞ্চের পর সময় ধরে দোকানে এসেছি। কিন্তু ততক্ষণে সহজ হবার তাড়নায় নিজের সঙ্গে যুঝে যুঝে আমি বিধ্বস্ত। এখন দ্বিগুণ ক্লান্তি আর নিজের ওপর দ্বিগুণ আক্রোশ। আবার আমি আলো বাতাস শূন্য এক অন্ধকারের গহ্বরে সেঁধিয়ে যাচ্ছি। আর সেই যন্ত্রণা থেকে নিজেকে টেনে তোলার তাড়নায় কুৎসিত কালো একটা মুখ বার বার সামনে এগিয়ে আসছে। আর ততোবারই ওই মুখ আমি জ্যান্ত ভস্ম করে ফেলতে চেষ্টা করছি। পারছি না। ওই মুখ আমাকে ডাকছে। রামদেও মাহাতোর মুখ।

সুবর্ণরেখার শ্মশান চরের ধারে সে আমাকে ডাকছে। এমন হয় কি করে। আমার ভিতরের এই দশা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় দুপুর পর্যন্ত পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় যেতে রাজি ছিলাম, বাদে কেবল ওই একটি জায়গা। কিন্তু যত সময় বাড়ছে, একি অদ্ভুত আকর্ষণ! রামদেও মাহাতো জাদু জানে? জেরি রুবিন জাদু জানত? মরে গিয়েও আমার জীবনে জেরি রুবিন এমন যন্ত্রণার মতো বেঁচে আছে কি করে?

সন্ধ্যা হবার পর দোকানে আর বসে থাকাই সম্ভব হল না। তখনো আমার বিচার বুদ্ধি তারস্বরে বলছে, না না, ওখানে না! কিন্তু সত্তা বলছে, না কেন? যে-কেউ যে-কোনোভাবে এই হাহাকারের গহ্বর থেকে টেনে না তুললে তুমি বাঁচবে কি করে?

...সেদিকেই চললাম। সেখানেই এলাম।

রামদেও মাহাতো তার বুড়ো কালো মুখের খাঁজে খাঁজে যেন আরো কয়েকটা চোখ বসিয়ে আমাকে দেখে নিচ্ছে।

—আও ছোটি মেমসাব আও...বয়েঠ যাও।

বুদ্ধি বিদ্রোহ করছে এখনো, কিন্তু সত্তা হালছাড়া। সেই এক বারের মতো তার সামনে মাটিতে বসলাম। পাশের সেই অতিকায় নক্সাকাটা কুমরোর মূর্তি যেন আগুনের গোলা মতো চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে আর সবগুলো দাঁত বার করে হাসছে। কুমড়োটার ভিতরে এখন আরো জোরালো লাল আলো রাখা হয়েছে মনে হল।

আবার আমার দিকে খানিক অপলক চেয়ে থেকে রামদেও মাহাতো ফাঁসফেঁসে গলায় বলল, পানছবরষ আগে হামি তুমাকে বললম, ফিন কোই রোজ হামার কাছে তুমি কুছু মাঙতে আসবে—কুছু লিতে আসবে— ইয়াদ হ্যায়?

মনে পড়েছে।...জেরির সঙ্গে সেই একবার যখন এসেছিলাম তখন বলেছিল। জবাব না দিয়ে তার দিকে সোজা চেয়ে আছি।

—আভি বোলো...কেয়া হালত্ তুমার?

—খুব ভালো।

চোখের অবিশ্বাস মুখ বেয়ে নামতে লাগল। লম্বা ঘাড় ডাইনে বাঁয়ে ঘুরল বার



কয়েক।—তব্ আয়ি কিউ?

—তুমি আসতে বলেছিলে কেন?

এবারে সামনে পিছনে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বলেছে বটে। লালচে দু'চোখ ঘোলাটে হয়ে আমার মুখের ওপর এঁটে বসছে।—তব্ ঝুটা মাত্ বোলো—তুমকো কেয়া হুয়া?

ঝাঁঝালো জবাব দিলাম, আমি জানি না।

—সরমকি কোই বাত্ নহী, তুম হে জরুর মালুম হ্যায়।... ডাগ্দার সাহাব বহুত সজ্জন আদমি হ্যায়—সহি?

—হ্যাঁ খুব ভালো লোক।

—ফির তুমহারি হালত্ অ্যায়সি কিউ? ...কেয়া, তুম জেরি সাহাবকা আত্মাসে মিলনে চাহতি হো?

এই পরিবেশে এ-কথা শুনে বিশশতকে এক লেখা-পড়া জানা মেয়েও চমকে উঠল। ফলে স্পষ্ট বিরক্তিতে বলে উঠলাম আমি ও-সবে বিশ্বাস করি না!

—মাত্ কর না...মগর চাহতি হো?

এবারে ঝোঁকের বশেই মাথা নাড়লাম। চাই।

—উ তো হাম সমজ লিয়া—উনকো আনেহি পড়েগা। দু চোখ বুজে ফেলল। আর মিনিটখানেকের মধ্যে পাথর-মূর্তি হয়ে গেল।...মিনিট চার পাঁচ হবে বোধহয়। মনে হল অপেক্ষা করে করে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চমকে উঠলাম। লোকটার ফ্যাসফেসে গলা গমগম করে উঠল।

—উনকো আনে হি পড়েগা! হাম্ সব কুছ সমজ লিয়া। ঘোলাটে দু'চোখ টান করে আমার দিকে ঝুঁকল।—যো কুছ কারনা হাম করে গা— সিরিফ তুম এক কাম্ করো—জেরি সাহাবকো তুম দিল্মে ইয়াদ করো— উনকো ডাকো—অ্যায়সে সোচো কি উয়ো তুমহারি পাস্ আ গয়া—বহুত্ লগনসে সোচো—পান-সাত রোজ অ্যায়সা হি সোচো— ব্যস দেখো কেয়া হোতা।

...বাড়ি ফেরার পরেও লোকটার কথাগুলো আমার মাথায় শব্দ হয়ে বেজে চলল। যা করবার ও করবে। আমাকে শুধু জেরির কথা নিবিষ্ট মনে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে যেন ও আমার কাছে এসেই গেছে। কথাগুলো কিছুতে মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। ওই রামদেও মাহাতো শেষে কি আমার ওপরেও তার ইচ্ছের জোর খাটালো—বিমোহনের ব্যাপারে ঘটালো কিছু?

...আশ্চর্য, অরুণলালকেও আজ একটু অন্যরকম লাগছে। মুখে খুশির ছোঁয়া। খেতে বসে বার বার আমাকে লক্ষ্য করেছে। ওই চোখের প্রত্যাশা মেয়েরা অন্তত চেনে। হতে পারে, দু'পুরে লাঞ্চের সময় আমাকে একটু অন্যরকম দেখে ও ভিতরে ভিতরে এত খুশি।

এই রাতে অরুণলাল আর নিজের পড়ার ঘরে গেল না। আমার চোখে আমন্ত্রণ ছিল কিনা জানি না।...কেবল জেরির কথা মনে পড়ছিল, সে বলত, তার দেহে ভোগের

আত্মারা আসে।...রামদেও মাহাতো কি বলল, এই লোকের দেহে জেরির আত্মা আসবে ?

...ঘরের আলো নেভানো। দু হাতে অরুণলালকে আঁকড়ে ধরে আছি। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে কারণ সত্যিই আমি কিছু ব্যতিক্রম অনুভব করেছি। ...রামদেও মাহাতো বলেছে, আমাকে কিছু করতে হবে না, যা করার সেই করবে— এমনকি বিশ্বাস করারও দরকার নেই— শুধু ভাবতে হবে জেরি এসেছে, জেরির ভোগী আত্মা এসেছে। প্রাণপণে আমি তাই ভেবে চলেছি, মনে মনে ডেকে চলেছি, জেরি এসো, জেরি এসো এসো এসো— আমার এত বড় সর্বনাশ তুমি করেছ— এখন তুমি এসে আমাকে বাঁচাও।

...এ-ও কি সম্ভব ? এই একটা রাত জেরির কোনো রাতের মতো নয় বটে, কিন্তু তবু যেন একটু ভিন্ন।...সেই আগের মতো পৃথিবী একেবারে থেমে যায়নি, বিস্মৃতির অতলে টেনে নিয়ে গিয়ে এই লোক এখান থেকে আবার আমাকে এখানেই ফিরিয়ে নিয়ে আসেনি।...জেরির আত্মা এই লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। শুধু ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসেছে বোধহয়,। এটুকুর মধ্যেই আমি ওর আসার প্রতিশ্রুতি দেখেছি মনে হল।...আশ্চর্য। এ আমি কোন যুগে বাস করছি !

প্রতিশ্রুতি মিথ্যে নয়। মস্তিষ্কে যদি আমার গোলযোগ না দেখা গিয়ে থাকে, তাহলে জোর করে বলতে পারি, এই অরুণলালের মধ্যে জেরি আসছে—প্রত্যেক রাতের থেকে প্রত্যেক রাত বেশি আসছে। আমারও ডাকের মনোযোগ বাড়ছে অনুভবের মনোযোগ বাড়ছে।...এই জেরি অভদ্র অভব্য উচ্ছৃঙ্খল নয় আগের মতো। অরুণালালের আধার বলেই হয়তো সভ্যভব্য মার্জিত রুচি। এ আনন্দের কোনো বর্ণনা সম্ভব কি... ?

সকালে আমি তীক্ষ্ণ চোখে অরুণলালকে লক্ষ্য করি। আমাকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা খসে পড়তে দেখছি। সে-ও যেন এক নতুন জীবনের ছোঁয়া পেয়েছে। খুশি মুখ। পরিতুষ্ট মুখ।

একটা মাস না ঘুরতে আমার এই পরিবর্তন সকলেরই চোখে পড়ছে বুঝতে পারি। আয়নার সামনে দাঁড়ালে এখন দু'চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। অন্যের চোখের আয়নায়ও নিজেকে দেখতে পাই। মা মিট-মিট করে তাকায় আমার দিকে, ঠোঁট টিপে হাসে। কর্মচারীদের চোখে মুখে এখন স্বস্তির ভাব। খাওয়া বাড়ছে, নতুন উদ্যমে সব কাজ দেখে যাচ্ছি। ক্লাবে গেলে অন্তরঙ্গজনেরা ঠাট্টা করে, কি-গো মুখের যেন রঙ বদলে গেছে, আর চেহারায়ও নতুন জলুস দেখছি—বিয়ে-করা না থাকলে ভাবতাম, নির্ঘাৎ মনের মতো প্রণয়ী জুটেছে।

আমি খুশিতে ডগমগ। মজায়ও। কি-রকম প্রণয়ী এ যদি শোনে তো পাগল ছাড়া আর কি বলবে ? দিনে যে অরুণলাল, রাতের শয্যায় সে-ই আমার কাছে জেরি রুবিন, এ কি কারো বিশ্বাসযোগ্য কথা ! বিশ্বাস করুক না করুক, কিছু যায় আসে না। দুই



অরুণলালই যে এখন কত প্রিয় সে আর আমি ছাড়া কে জানে ? দিনের জেরি রুবিন আমার চোখে জুয়ারি নেশাখোর কদর্য কুৎসিত ছিল। দিনের অরুণলাল তার উল্টো। সৌম্য প্রশান্ত বুদ্ধিদীপ্ত বন্ধুর মতো। ...রাতের জেরি রুবিনকেও আমার নিষ্ঠুর জানোয়ার মনে হত, তার রীতি আমার ভদ্র শিক্ষিত মন বরদাস্ত করতে চাইত না, রুচিতে ঘা পড়ত। তবু এই জীবনে সে অমোঘ অনিবার্য একজন হয়ে উঠেছিল। জেরি রুবিনের ভোগী আত্মা অরুণলালের মধ্যে এসে তার আচরণ বদলেছে। তার শয্যার আচরণ এখন আর স্থূল কুৎসিত অপমানকর মনে হয় না। এই দেহের ওপর অরুণলালের ভিতর দিয়ে তার দশ আঙুলের আলাপ এখন আর কদাচারী মনে হয় না—কিন্তু আগের মতোই এই শরীরের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই আগুন সর্বাঙ্গে ছড়ায়, মাথায় ওঠে। সমস্ত স্নায়ু আর শিরা-উপশিরায় আগের মতোই তুমুল সাড়া জাগায়। জেরি রুবিন বলত, লেটস গো টু হেল... লেটস গো টু হেভেন। এখন অরুণলালের ভেতর দিয়ে জেরি রুবিনের ভোগী আত্মা যেখানে আমাকে নিয়ে যায় তার সবটাই স্বর্গ।

আমি বিজ্ঞান জানি না, জানতে চাই না। আমি আর যুক্তি মানি না, মানতে চাইও না। আমার প্রতি দিনের জীবনে অরুণলাল যতখানি সত্য, সেই অরুণলালের ভিতর দিয়ে রাতের জেরি রুবিন ঠিক ততোখানিই সত্য।

আমি সুখী। আমার মতো সুখী আর কি কেউ আছে ?

অদৃশ্য বসে কে হাসছে যদি জানতাম...।

পরের মাসে কিছু ব্যতিক্রম অনুভব করলাম। তার পরের মাসটাও ব্যতিক্রমের মধ্যে কাটল। কিন্তু তারপরেও ক'টা মাসের মধ্যে আমার সুখ আমার আনন্দের ওপর এতটুকু ছায়া পড়ল না। আমার দিনের আনন্দ ব্যবসা নিয়ে যত না—অরুণলালকে নিয়ে তার থেকে ঢের বেশি। আমার রাতের আনন্দ অরুণলালকে নিয়ে যত না, জেরি রুবিনকে নিয়ে তার থেকে ঢের বেশি। ...সন্তান আসছে জেনেও ছ'মাস পর্যন্ত আমি যেন কোনো বাস্তবের ওপর দিয়ে পা ফেলে চলিনি। এর নামও কি জাদু ? সম্মোহন ? রামদেও মাহাতো তার অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে আমার সমস্ত বাস্তব জ্ঞান আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ?

তাই যদি হবে, তাহলে আচমকা একদিন ওই জাদুর খেলা শেষ হয়ে গেল কেন ? সম্মোহন কেটে গেল কেন। এমন বাস্তব চিন্তা বজ্রাঘাতের মতো মগজে এসে পড়ল কেন ?

... আমার ভিতর আর একজনের অস্তিত্ব ঘোষণা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পৃথিবীর আলো বাতাস দেখার জন্য তার নিঃশব্দ প্রস্তুতির নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যেই এই চেতনার কশাঘাত।

যে আসছে সে কে ? সে কার সন্তান ?

অরুণলালের ? না জেরির ?

জেরির ? অরুণলালের ? অরুণলালের ? জেরি রুবিনের ?

এমন চিন্তা বাস্তব না অবাস্তব ? অবাস্তব অবাস্তব—নিশ্চয় অবাস্তব। এমন চিন্তা ভূ-ভারতে কেউ করেছে ? ... কিন্তু জেরি রুবিন কি তাহলে অবাস্তব ? তার ভোগী আত্মার স্পর্শ যে রাতের পর রাত পেয়েছি—সে কি অবাস্তব ? যে আত্মার লীলা থেকে জঠরে সন্তানের এই অস্তিত্ব ঘোষণা, সে-তো জেরির আত্মা ! ...রামদেও মাহাতো জানে। আমি আরো ঢের বেশি জানি।

জেরি রুবিনের সন্তান। জেরির ছাড়া আর কার ?

ভয়ে ত্রাসে কাঠ আমি। ...জেরির সন্তান জেরির মতো ছাড়া আর কার মতো হবে ? কার মতো হতে পারে ? জেরি আসছে। জেরির থেকে আরো আরো ভয়ংকর, আরো ভীষণ, আরো অর্থলোলুপ, আরো নারী-মাংসলোলুপ এমনও হতে পারে। জীবিত জেরির মধ্যে কোন্ প্রেত ভর করেনি ? ভোগের কোন্ দরজা তার অজানা ? জুয়ার প্রেত নেশার প্রেত, প্রবঞ্চনার প্রেত, বাসনার নিকৃষ্টতম প্রেত, ঘাতকের প্রেত—কে ছিল না তার মধ্যে ?

প্রেতের অভিসারে জন্ম যার, সে তার থেকে ভীষণ ভয়ংকর হিংস্র ছাড়া আর কি হতে পারে ?

আমার চারদিকে শুধু অন্ধকার এখন। ভিতরেও অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমি মাথা খুঁড়ে মরছি। বোবা আর্তনাদে আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলছি। খাওয়া গেল, ঘুম গেল, কাজ-কর্মও একেবারে গেল। আমার সর্ব অঙ্গে প্রেতের স্পর্শ। জঠরেও প্রেত বহন করছি।

আমি মৃত্যুর দিকে ধেয়ে চলেছি। কিন্তু মৃত্যু আগে আসবে কি ওই প্রেত আগে ভূমিষ্ঠ হবে ? ভাবনায় মা দিশেহারা। অরুণলাল স্তব্ধ। ও বার বার জিগ্যেস করছে, তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো। দিনের পর দিন তুমি ভেবে চলেছ। কেন তুমি এমন করছ ? তোমার মায়ের দিকে তাকাও। আমার দিকে তাকাও। তোমার কর্মচারীদের দিকে তাকাও। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না ? শুনতে পাচ্ছ না ?

না, কোনো কথা বুঝতে পারছি না, কারো কথা শুনতে পাচ্ছি না। শুধু প্রেতের পায়ের শব্দ শুনে যাচ্ছি।

আমি কোথাও যাব না, ঘর ছেড়ে নড়ব না। অরুণলাল একবার জামসেদপুর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এলো, আর একবার কলকাতা থেকে। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকলাম। দু'জনেই ফিরে গেল। ওদের আমি কি বলব, কি বোঝাবো ? কিছু বললে তারা পাগলের চিকিৎসা করবে। কিছু না বললেও তাই করবে।

নিরুপায় মা রামদেও মাহাতোর ডেরায় ছোটাছুটি করছে। আমাকে একবার তার ওখানে যাবার জন্য কাকুতি মিনতি করছে। আমি না গেলে তাকেও এখানে ধরে আনতে পারে বলছে।



না ! না না না !

আমার সে মূর্তি দেখে মা সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

টিকলি, ঘাটশীলা, রাখা-মোসাবানীর পরিচিতজনেরা সকলে জেনেছে আমি দারুণ অসুস্থ। যারা ভালোবাসে তারা দেখতে আসছে, কিন্তু বাড়িতে বাইরের কেউ এলেই আমার ঘরের দরজা বন্ধ।

... আমার সংকল্প, জঠরে যে ভয়ংকর প্রেতের সন্তান বহন করছি, রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে তাকে আমি পৃথিবীর আলোবাতাসে আসতে দেব না। দিনের পর দিন প্রায় না খেয়ে কাটাচ্ছি। মাথা তুলতে পারি না, ভালো করে বসতেও পারি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রাণের রস টানছে, তার পদক্ষেপের ঘোষণা দিনে দিনে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

... শেষ পর্যন্ত কি করতে হবে আমি জানি। তার আগে বুঝতে হবে অরুণলাল কিছু করতে পারে কি না। রাতের অরুণলাল নয়, দিনের অরুণলাল। ডাক্তার অরুণলাল।

তারও প্র্যাকটিস নষ্ট করছি জানি। মুখ চুন করে সে ওই কোণের ঘরে বসে থাকে। রাতেও ইদানীং সাহস করে ঘরে আসে না। আমি একলা থাকতে চাই বলার পর থেকে না ডাকলে আসে না। সকালে মুখ কালো করে সামনের বারান্দায় পায়চারি করে, আর মাঝে মাঝে এক-একবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে।

... সেই সন্ধ্যায় তাকে ঘরে ডাকলাম।

দরজা দুটো বন্ধ করে দাও।

দিল।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললাম, বোসো। ... আমাকে তুমি ভালোবাসো ?

ওর মুখের দিকে তাকালেই কষ্টই হয় আমার। ও অসহায় ভাবে চেয়ে রইলো আমার দিকে। সেটা এতদিন বাদে মুখে বলতে হবে ?

—বলতে হবে না। আমাকে তুমি বাঁচাতে চাও ?

—সকলে চায়, আমি সব থেকে বেশি চাই, কিন্তু দয়া করে শুধু বলো তুমি বাঁচতে চাও না কেন ?

—আমিও বাঁচতে চাই। কিন্তু শুধু এক শর্তে ... যে আসছে সে আসবে না। আমার কথা বুঝতে পারছ ?

বুঝতে সময় লাগল।—যে আসছে ...মানে, ছেলেপুলে চাও না ?

—যে আসছে তাকে চাই না। তোমাদের ডাক্তারিতে কোনো ব্যবস্থা আছে ?

—আগে বললে খুব সহজ ব্যবস্থাই ছিল, সাত মাস পার হয়ে গেল, তুমি এতদিনে বললে ? এখন সেটা কি করে সম্ভব ?

আমি স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে আছি।—সম্ভব নয় তাহলে ! ...চেষ্টা করতে গিয়ে যে আসছে তাকে আর আমাকেই যদি মরতে হয় আমি তাতেও রাজি আছি ভেবে দেখো ?

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে আনল।
—দ্যাখো,তোমার স্বামী হলেও আমি ডাক্তার..মরা এত সহজ নয়, আমি তোমাকে মরতে দেব না ...তার আগে ব্যাপারটা আমাকে ভালো করে বুঝতে দাও—সন্তান কেন চাও না ?

আমাকে মরতে দেবে না শুনে একটু যেন শান্তির ছোঁয়া পেলাম।—সন্তান চাই না বলিনি, যে আসছে তাকে চাই না।

—এ-তো আরো আশ্চর্য কথা ... কেন চাও না ?

—যে আসছে সে তোমার সন্তান নয়।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে জানি। আমাকে নিরুপায় হয়েই বলতে হয়েছে। আমি তো বাঁচা-মরার একটা সুতোয় ঝুলছি, আর আমার লজ্জা ভয় সংকোচের কি আছে !

অরুণলালের মুখ মুহূর্তে ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, আমার সন্তান নয় .. কার সন্তান ?

—জেরির। জেরি রুবিনের।

এবারেও চোখ-মুখের যা প্রতিক্রিয়া,আমাকেপাগল ছাড়া আর কিছু ভাবছে না বুঝতে পারি। কিন্তু ও দরদী ডাক্তার, আমি তার স্ত্রী, তাই হেসে উঠল না—আকাশ থেকেও পড়ল না। মুখের দিকে স্থির চেয়ে আছে। আস্তে আস্তে বলল, জেরি রুবিনের সন্তান ... কিন্তু সে-তো আমাদের বিয়ের চার মাস আগে মারা গেছে ?

—হ্যাঁ ! তুমি ডাক্তার ... বিশ্বাস করবে না জানি ... কেউ বিশ্বাস করবে না, তাই বলিনি।

—ও ...। একাগ্র চোখে দেখছে। কিন্তু জেরি রুবিন তোমার কাছে এলো কি করে ?

—তোমার ভেতর দিয়ে। তোমার মধ্যে আমি তাকে ডাকতাম। ...রামদেও মাহাতো জানে, আর আমি জানি। ... তোমার ভিতরে সে আসত আমি টের পেতাম।

—রামদেও মাহাতো ... সেই ভুডু প্র্যাকটিস করে যে লোকটা ?

—হ্যাঁ। আমার ভিতরটা উগ্র হয়ে উঠছে। তুমি বিশ্বাস করছ না বুঝতে পারছি আমাকে পাগল বা যা খুশি ভাবো শুধু বলো নিষ্কৃতির কোনো পথ আছে কি নেই ?

জবাবে চেয়ার ছেড়ে সাগ্রহে অরুণলাল আমার বিছানায় উঠে এলো। —একশবার আছে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি, পাগলও ভাবছি না— তুমি শুধু তোমার মনে যা আছে আমাকে বলো, সব কথা খুলে বলো ! দয়া করে আমাকে তোমার যন্ত্রণার ব্যাপারটা একটু জানতে বুঝতে দাও !

আগ্রহে উদ্দীপনায় ওর একটা হাত আমার কাঁধের ওপর উঠে এসেছে। শুধু কথায় নয় এই স্পর্শ থেকেও যেন জীবনের আশ্বাস পেলাম। বাঁচার তাড়নায় যতটা সম্ভব অকপটেই বললাম সব।

উন্মুখ আগ্রহে অরুণলাল শুনল। তারপর মুখের দিকে চেয়ে অল্প অল্প হাসতে



লাগল। এই হাসিটুকুও জীবনের আশ্বাসের মতো মনে হল আমার। কারণ এই চাউনিতে আর এই হাসিতে অবিশ্বাসের ছিটে ফোঁটাও নেই। খুব দরদের সঙ্গে জিগ্যেস করল, আমার ভিতরে জেরি রুবিনকে কবে থেকে পেয়েছ তুমি।

দিন তারিখ সুদ্ধু মনে ছিল। বললাম।

মুখের দিকে চেয়ে অরুণলাল হাসছে তেমনি। আরো কাছে এসে আমাকে দু'হাতে আগলে নিয়ে আদর করল খানিক। আমি সচকিত। ... না জেরিকে তো ডাকিনি, কিন্তু এখনো কি সে আমার ওপর দখল নিয়ে আছে ! তা না হলে এই আদরও অনেকটা ওর আদরের মতো লাগছে কেন ...।

অরুণলাল বলল, আমার লিলি, আমার লিলি, লিলি লিলি... এতদিন ধরে তুমি এত কষ্ট পেয়েছ, এত কষ্ট পাচ্ছ ...আমাকে একটুও বুঝতে দাওনি কেন ? ... তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করলাম না দেখছ তো ? কিন্তু এবারে তুমি ঠিক এমনি মন দিয়ে আমার কথা শোনো। তারপরেও তুমি যদি চাও আমি সব ব্যবস্থা করব— তুমি কিছু ভেবোনো

—কিন্তু যদি ... ধরো যদি আমি প্রমাণ করতে পারি, যে আসছে সে আমার সন্তান ... তোমার আমার আনন্দের সন্তান ... তাহলে ? তাহলেও কি তোমার কাছে সে অবাঞ্ছিত হবে— তাহলেও তুমি তাকে চাইবে না ?

যতো মোলায়েম করেই বলুক, আমার ভিতরের অবিশ্বাস নড়ে চড়ে সজাগ হয়ে উঠছে। ... ও আমাকে ভোলাতে চাইছে, সরাসরি পাগল বলছে না, কিন্তু পাগলের চিকিৎসার দিকে এগনোর মতলব। ঠাণ্ডা গলায় বললাম, আমার বিশ্বাস হবে না।

—হবে হবে হবে ! আমার ছোট্ট লিলি, আমি নিশ্চিত জানি হবে। না যদি হয় আমি তোমার ওপর একটুও জোর করব না— তুমি যা চাও তাই হবে— শুধু খুব মন দিয়ে আমার কথা শোনো !

এই আকৃতিও শান্তির স্পর্শের মতো। বলো।

খাট থেকে লাফিয়ে নামল। আমার হাত ধরল। এ ঘরে হবে না, সব প্রমাণ ওই কোণের ঘরে। আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে এসো— আর তোমার কোনো ভয় নেই।

কিছু না বুঝেই নেমে এলাম। কোথা থেকে ভেতরে আবার একটু জোর পাচ্ছি তা-ও জানি না।

অরুণলাল হাত ধরে আমাকে কোণের ঘরে নিয়ে এলো। টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। দেয়ালের তাক থেকে কাগজের মলাট দেওয়া মোটা মোটা দুটো বই টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর ওই টেবিলের উপরেই আধা-আধি বসে লাগোয়া দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটা নামিয়ে অনেকগুলো পিছনের পাতা উল্টে একটা পাতায় এসে থামলো। ওটা আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরে বলল, এই তারিখের চার দিকে গোল লাল দাগটা দেখো !

দেখে সত্যিই অবাক আমি। ওর ভিতরে জেরির আত্মা আসার যে দিন তারিখের কথা একটু আগে ওকে বলেছি, ঠিক সেই তারিখের চার দিকেও গোল লাল দাগ

একটা। কি আশ্চর্য, অরুণলালও কি তাহলে ওর ভিতরে জেরির ভোগী আত্মা আসা টের পেত! আমি বিমূঢ়ের মতো চেয়ে আছি।

—শোনো ওই দিনে আমারও কিছু ভাবনা-চিন্তা সফল হয়েছে আর হতে যাচ্ছে বুঝে তারিখটার ওপর লাল দাগ দিয়ে রেখেছিলাম। আমি খুব মেথডিকাল লোক বলেই দাগ দিয়েছি। ... বিয়ের পনের বিশ দিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি তোমার দোসর হয়ে উঠতে পারিনি... পারছি না। আমি ডাক্তার ... তোমার রি-অ্যাকশন ঠিকই বুঝতাম, কিন্তু নিজের গলদ কোথায় ধরতে পারতাম না। এ-জন্যে বেশ কিছুদিন আমার মন মেজাজ কত যে খারাপ হয়েছিল তুমি ভাবতে পারবে না। ... সেই সময় বারবার আমার জেরি রুবিনের কথা মনে হয়েছে। তোমার মতো মেয়ের তাকে সহ্য করার কথা নয়, কিন্তু তুমি সহ্য করতে। আমি ভাবতাম, কেন করতে? তোমার মা বারবার বলা সত্ত্বেও জেরিকে ডিভোর্সের কথায় তুমি কান দাওনি ... কেন দাওনি? তারপরেই মনে হয়েছে, জেরি রুবিনের জন্য মালা গুপ্তার মতো এক শিক্ষিতা মেয়ে উন্মাদ পাগল হয় কেন? ... এরপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ঘাটশীলার দু'জন অফিসারের মেয়ে জেরি রুবিনকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল, জেরি রুবিন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। ... আরো জেনেছি দু'তিন জন আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে সংশ্রব ছিল যার জন্য ওদের পুরুষেরা জেরি রুবিনের ওপর ক্ষেপে উঠেছিল। ওই আদিবাসীদের একজনের বউ আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পেয়েছে। সে-সময় রামদেও মাহাতো আগলে না রাখলে জেরি রুবিনের বিপদ হত। ... এ-সব থেকে আমি ঠিক বুঝেছিলাম, জেরি রুবিনের এমন কিছু আকর্ষণ আছে যা সাধারণ পাঁচটা পুরুষের নেই।

আমি হাঁ করে অরুণলালের দিকে চেয়ে আছি। কিন্তু তন্ময় হয়ে শুনছিও। সূর্য ওঠার খানিক আগে থেকেই যেমন রাতের অন্ধকার ফিকে হতে থাকে, তেমনি একটা অনুভূতির স্পর্শে ভিতরটা হালকা হতে শুরু করেছে। সমস্ত স্নায়ু জড়ো করে অধীর আগ্রহে শুনে যাচ্ছি।

অরুণলাল তারপর সেই মোটা বই দুটো একে একে আমার সামনে খুলে ধরল। একটার নাম দেখলাম, 'বাৎস্যায়ণ' অন্যটা 'রিলেশন বিটুইন ম্যান অ্যাণ্ড উওম্যান'। অরুণলাল বলে গেল, এই দুটো বই খুব মন দিয়ে পড়ে-পড়ে আমি আমার ভাবনার হদিস পেলাম, তোমার আর তোমার মতো বহু মেয়ের অপরিতৃপ্তির হদিস পেলাম—তা দূর করার পথও এই দুটো বই থেকেই পেলাম। ... বিশ্বাস না হলে এ-বই দুটো তুমিও পড়ে দেখতে পারো— এর মধ্যে তুমি নিজেকে পাবে, আমাকেও পাবে। কোনো আত্মা আসেনি, কারো আত্মা আসেনি—আসতে পারে না— আমিই নতুন নতুন মানুষ হয়ে তোমার কাছে এসেছি—তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে আসছে সে তোমার আমার ভালোবাসার সন্তান—তোমার আমার আনন্দের সন্তান।

... বুকের ভিতর থেকে একটা অভিশাপের পাহাড় বাষ্প হয়ে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ... জ্ঞান বুদ্ধি খুইয়ে কতদিন আমি এমন আচ্ছন্নতার গহ্বরে ঢুকে বসেছিলাম। অরুণলাল



দুটো দিন ছায়ার মতো সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। আমার অবিশ্বাসের শেষ বিন্দু পর্যন্ত মুছে গেছে। মুক্তির স্বাদ যে এমন এ কি আগে কখনো জেনেছি। অন্ধকার থেকে আমি নিশ্চিত আলোর পথে পা ফেলেছি।

জেরি রুবিনের মৃত্যু সম্পূর্ণ! আমারও জবানবন্দী শেষ।

...এখন শুধু প্রতীক্ষা, কবে আমার আর অরুণলালের ভালোবাসার সন্তান আনন্দের সন্তান এই পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখবে। আমি তার পায়ের শব্দ কান পেতে শুনি। যত শুনি, এই সত্তা ততো কানায় কানায় ভরে ওঠে। যে আসছে তার জন্য এই পৃথিবীতে আমাকে একটু সুস্থ জায়গা করে দিতে হবে। কোনো অস্বাস্থ্যকর লোভের আত্মা, স্থূল বাসনার আত্মা, কপটতা প্রবঞ্চতার আত্মা, স্নায়ু ধ্বংসি জুয়া- নেশার আত্মা, হিংস্র ঘাতকের আত্মা তাকে স্পর্শ করবে না। তার ধারে কাছে ঘেঁষবে না। উষার কোলে শুকতারার মতো মায়ের কোলে শিশু হাসবে। হেসে খেলে সেই আনন্দের সন্তান বড় হবে।

...কার মতো হবে? সে যেন তার বাবার মতো হয়।

...না শুধু বাবার মতো নয়। যে আসছে সে যেন আমার বৃন্দার মতোও হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

# সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই  অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900